ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ

কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক

শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, এম. এ., ডি. ফিল.

প্রণীত

মডার্ণ বুক এজেন্সী

১০, কলেজ স্কোয়ার

কলিকাতা—১২

মুখবন্ধ

অষ্টাদশ শতকের বাংলাদেশে যুগসন্ধির অন্ধকার ঘনীভূত। সেই অন্ধকারে দু'টি মাত্র দীপশিখা, একজন ভারতচন্দ্র, আর একজন রামপ্রসাদ। এই দুই দীপশিখার আলোকে সমসাময়িক বাঙালী সেই অন্ধকারে পথের নিশানা খুঁজেছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রায় সাত বছর আগে আমার কাছে এসেছিলেন বাংলা সাহিত্যের কোনো একটা দিক নিয়ে কিছু কাজ করবার ইচ্ছা মনে নিয়ে। তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ নিয়ে কাজ করুন, এই দুই দীপশিখার আকৃতি-প্রকৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা করুন। তারপর সুদীর্ঘ চার-পাঁচ বছর অবিচল নিষ্ঠায়, নিরলস সাধনায় এই কাজে তিনি নিজকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। সেই নিষ্ঠা ও সাধনার ফল এই গ্রন্থ।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আমরা এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি, তর্ক করেছি, তত্ত্ব ও তথ্য অনুসন্ধান করেছি। নানাভাবে এই গ্রন্থের সঙ্গে এবং গভীর প্রীতি ও বন্ধুত্বে আমি শিবপ্রসাদ বাবুর সঙ্গে জড়িত। কাজেই এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কোনো মতামত প্রকাশ আমার অধিকারের বাইরে। শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন, এই গ্রন্থ রচনায় শিবপ্রসাদ বাবু যে সত্য ও কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, সাহিত্যালোচনায় যে রীতি ও আদর্শের পরিচয় দিয়েছেন তা' আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। আশা করি, বাঙালী পাঠকের শ্রদ্ধাও তিনি আকর্ষণ করবেন।

শ্রীসুকুমার সেন

নিবেদন

অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যমণি হইয়া বিরাজ করিতেছেন, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, বিশেষভাবে ভারতচন্দ্র। শিক্ষিত বিদগ্ধ রসিক বাঙালী চিত্তে ভারতচন্দ্রের আসন সুবিস্তৃত, তাঁহার রচনা আজও আদৃত এবং কবি ঈশ্বরগুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া তীক্ষ্ণধী সমালোচক প্রমথ চৌধুরী পর্য্যন্ত সেই রচনা বহু আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অন্যদিকে রামপ্রসাদ মধ্যবিত্ত, স্বল্পবিত্ত ও বিত্তহীন বাংলার কৃষিনির্ভর, গ্রাম্য, লোকায়ত সমাজে আজও তাঁহার আপন বিশিষ্ট গৌরবে অধিষ্ঠিত, তাঁহার গান ও সুর লক্ষ লক্ষ বাঙালীর কণ্ঠে ধ্বনিত এবং সেই গান ও সুরের আকর্ষণে রবীন্দ্রনাথও ধরা না পড়িয়া পারেন নাই। রামপ্রসাদও বহু আলোচিত ও ব্যাখ্যাত এবং বহু অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত তাঁহার জীবন ও কাব্যের রূপ ও প্রকৃতি লইয়া নানা আলোচনা গবেষণা করিয়াছেন।

তবু ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদকে আশ্রয় করিয়া কিছু নূতন অনুসন্ধান, পুনরালোচনা ও নূতনতর ব্যাখ্যার কেন প্রয়োজন অনুভব করিলাম, তাহার কারণ সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি।

অনেক সুপরিজ্ঞাত তথ্যও সর্ব্বদা আমাদের সচেতন চিত্তে জাগরূক থাকে না। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ যে সমসাময়িক এবং উভয়েই যে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছেন, উভয়ের সুবিস্তৃত রচনাই যে একই দেশ ও কালখণ্ডের মানস-চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ, একথা অনেক সময় আমরা ভুলিয়া যাই। এ তথ্য বহুল-স্বীকৃত যে, দুইজনের সাহিত্য-ধর্ম্ম, জীবন ও প্রকৃতি একেবারেই ভিন্ন প্রকারের, আঙ্গিক, জীবনদর্শন ইত্যাদি সমস্তই দুই ভিন্ন গোত্রের ; অথচ এই বিভিন্নতা কেন, কি এই বিভিন্নতার স্বরূপ ও প্রকৃতি, কি ইহাদের সাহিত্যিক ও সামাজিক তাৎপর্য্য, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের চলমান ধারায় কোথায় ইহাদের স্থান, সাম্প্রতিক ও ভবিষ্যৎ বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে কোথায় ইহাদের যোগাযোগ, এই সব বিষয় লইয়া আলোচনা বিশেষ কিছু এযাবৎ হয় নাই—সাহিত্যবোদ্ধা, রসিক এবং সাধারণ পাঠক, কেহই এসম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতনও বোধ হয় নহেন।

প্রধানতঃ, এই কারণেই ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদকে লইয়া একটু নূতন আলোচনা অবতারণার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছি।

দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র সমাজের অতীত চলমান প্রবাহের সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ কতটুকু এবং কি উপায়ে এই সম্বন্ধের স্বরূপ ও প্রকৃতি উদ্‌ঘাটিত হয়, সাহিত্য ও সমাজের স্বরূপ পরস্পরের উপর প্রতিফলিত হয়, তাহা লইয়া বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট আলোচনা গবেষণা হয় নাই, কিছু কিছু সূত্রপাত দেখা দিয়াছে মাত্র। বাংলাদেশে অষ্টাদশ শতক, বিশেষভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব্বে যে যুগ-সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছিল, তাহার ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র যে দীপ জ্বালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সমসাময়িক দেশ ও কালের প্রেক্ষাপটে সেই দীপ এবং দীপসৃষ্ট আলোকের রূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার ও বুঝিবার একটি সুগভীর কামনা বাঙালী চিত্তে থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আংশিকতঃ, আমার এই প্রয়াসের পশ্চাতে সেই কামনাও সক্রিয় ছিল।

এই দুই কারণই আমার এই বিনীত প্রচেষ্টার মূলে। এই দুই উদ্দেশ্য লইয়াই আমি এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কতটুকু সার্থক হইয়াছি বা হই নাই, তাহার বিচার আমার অধিকারে নয়।

এই দুই উদ্দেশ্য লইয়া যে আলোচনা তাহা কখনই ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের সুবিস্তৃত সৃষ্টির সামগ্রিক আলোচনা হইতে পারে না। সে প্রয়াসও আমি করি নাই; বরং আমার সমস্ত প্রয়াসই উপরোক্ত দুই উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইঁহাদের সম্বন্ধে নানা আলোচনা পূর্ব্বসূরীরা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কর্ষিত ক্ষেত্রের উৎপাদিত শস্যের সুযোগ ও সুবিধা আমি লইয়াছি এবং যথাস্থানে স্বীকারও করিয়াছি; কিন্তু তাঁহাদের ক্ষেত্রে আমি নূতন করিয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত হলচালনা করি নাই। যে সব স্থলে তথ্য সম্বন্ধে আমার মনে সংশয় জাগিয়াছে, অথবা তথ্য সম্বন্ধে নূতন সন্ধান পাইয়াছি, তাহার আলোচনা ও বিশ্লেষণ কর্ত্তব্য জ্ঞানেই আমাকে করিতে হইয়াছে। কিন্তু যাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে আগেই, তাহার পুনরালোচনার অবতারণা আমি করি নাই; ঋণ স্বীকার করিয়া গ্রহণ করিয়াছি মাত্র। এবং সে ক্ষেত্রেও আমার উপরোক্ত দুই উদ্দেশ্যের যাহা কিছু সহায়ক, তাহাই শুধু গ্রহণ করিয়াছি।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদের বাংলাদেশে যে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আকাশ বিস্তৃত, তাহারই প্রেক্ষাপটে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সংক্রান্ত আমার এই আলোচনা ; কাজেই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সেই কালের আকাশের পরিচয়দান অনিবার্য্য হইয়াছে। তাহার পর, পর পর অধ্যায়ে ধীরে ধীরে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের জীবন, শিক্ষা, দীক্ষা, মানসপ্রকৃতি, সাহিত্যধর্ম্ম প্রভৃতির বিচার ও বিশ্লেষণ লইয়া বিভিন্ন অধ্যায়ের রচনা। সর্ব্বশেষ অধ্যায়ে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের রচনার সামাজিক ও সাহিত্যিক তাৎপর্য্য এবং সমসাময়িক চলমান ও পরবর্ত্তী কালপ্রবাহের সঙ্গে তাহার যোগাযোগ সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

গ্রন্থটির তিনটি পরিশিষ্টের প্রতি আমি আমার পাঠকবর্গের দৃষ্টি সবিনয়ে আকর্ষণ করি। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহাদের রচনায় গৃহীত, মুদ্রিত বা প্রচলিত পাঠ আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতে হইয়াছে। তাহা করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের আনুকূল্যে আমি এমন দুইটি অপ্রকাশিত ও অব্যবহৃত-পূর্ব্ব পাণ্ডুলিপির সহায়তা লাভ করিয়াছি, যাহাতে আমার পক্ষে কোন কোন রচনার পাঠান্তর প্রদর্শনের সুযোগ-লাভ সম্ভব হইয়াছে। তথ্যের দিক হইতে আমার প্রথম দুইটি পরিশিষ্টের কিছু মৌলিকতার দাবী আছে, সবিনয়ে আমি তাহা নিবেদন করি। অন্য আর একটি পরিশিষ্টে কবির নাম রামপ্রসাদ, দ্বিজ রামপ্রসাদ এবং কবিওয়ালা রামপ্রসাদ লইয়া আমি যে আলোচনার অবতারণা করিয়াছি, এবং যে উপায়ে ও যুক্তিতে কবির নামের রচিত পদগুলি প্রতিষ্ঠিত ও পৃথক শাক্তপদাবলীর রচয়িতা হিসাবে দ্বিজ রামপ্রসাদের ব্যক্তিত্বকে স্বীকৃতিদান করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহাও সর্ব্বাংশে মৌলিক না হইলেও তাহার মধ্যে যে নূতন আলোকপাতের প্রচেষ্টা আছে, সবিনয়ে আমি তাহা নিবেদন করি।

ঋণ-স্বীকৃতি ছাড়াও যে সব গ্রন্থ ও বিচ্ছিন্ন রচনাবলী হইতে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটি তালিকা গ্রন্থশেষে নিবদ্ধ করিলাম। আলোচনা গবেষণার ক্ষেত্রে পূর্ব্বসূরীদের ঋণ অকপটে স্বীকার না করিয়া কিছুতেই অগ্রসর হওয়া যায় না। সানন্দে ও সাগ্রহে আমি সেই ঋণ স্বীকার করিতেছি। ইতি—

নিবেদক—

শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

গ্রন্থ-পরিচিতি

(১)

(ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ বাঙ্গালার জীবনচর্যার দুই বিপরীত কোটির প্রতিনিধিরূপে অষ্টাদশ শতকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই দুই বিপরীত কোটির আবার ভাব-সাধনার একটি সাধারণ বিন্দুতে সংলগ্ন থাকার কোন বাধা ছিল না।) দ্বাদশ শতকে জয়দেব-কবিতে বিলাসকলাকৌতূহল ও ভক্তিবিহ্বল আত্মনিবেদন রাধাকৃষ্ণের লীলামাধুর্যরসের মধ্যে মিশিয়া এক হইয়াছিল। বৈষ্ণবধর্মের মধুর রসে প্রাকৃত শৃঙ্গাররসের দিব্য পরিণতি; লৌকিক প্রেমকে উপাদানরূপে ব্যবহার করিয়া ভগবৎ-সাধনার ভক্তিপ্লুত, আত্মবিলোপী আবেগটি স্ফুরিত হইয়াছে। সুতরাং বৈষ্ণবধর্মে এই উভয় উপাদানের একটি সহজ সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে পৌঁছিয়া শাক্ত-উপাসনার মাতৃপূজার সঙ্গে কেমন করিয়া এই আবিল সৌন্দর্যমুগ্ধতার ধারাটি আসিয়া মিশিয়া গেল! যেখানে ভগবান ও ভক্তের সম্পর্ক মাতা-পুত্রের বিশুদ্ধ স্নেহ-ভক্তি-বাৎসল্যের মাধুর্যে পরিপ্লুত, সেখানে আদিরসের উদ্বেলতা ও ভোগবিলাসের দুর্দম কামনা নিতান্ত বিসদৃশ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু মনে হয় যেন বৈষ্ণব সাধনার অনুকরণে শক্তিপূজার মধ্যেও এই প্রাকৃত দেহলালসা আবির্ভূত হইয়াছে। বোধ হয় পাঠকের রুচি এইরূপ সম্ভোগকাহিনী প্রত্যাশা করিত বলিয়াই শাক্ত কবি মাতৃপূজার পটভূমিকায় এইরূপ বিষয় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তবে বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রেমই কেন্দ্রস্থ রস, দিব্যানুভূতিস্ফুরণের প্রধান উপায় ও উপাদান। শাক্ত কবির বিদ্যাসুন্দর কাহিনীতে ইহা আরোপিত, ভিন্ন উৎস হইতে সংগৃহীত ও মাতৃমহিমা-ঘোষণার একটা পরোক্ষ উপলক্ষ্য। এই প্রেমচর্চা সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ নয়, এমন কি সাধনার সহিত ইহা প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিঃসম্পর্ক। ইহা কেবল ভক্তের প্রতি মাতৃরূপিণী দৈবশক্তির অহেতুক কৃপার নিদর্শন ও তাঁহার সর্বশক্তিমত্তার পরিচয়ক্ষেত্র। ভক্ত যে মাতৃ-আশীর্ব্বাদে বলীয়ান হইয়া যে-কোন দুঃসাহসিক অভিযানে ব্রতী হইতে পারে ও মাতার প্রতি অসীম নির্ভরশীলতায় যে-কোন লৌকিক আচার ও সুরুচিসঙ্গত আচরণকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে বিদ্যাসুন্দর কাব্যের তাহাই প্রতিপাদ্য বিষয়।

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ পরস্পরের মধ্যে গভীর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এক বিষয়ে যুগের বিকৃত রুচির অনুবর্তন করিয়াছিলেন—তাঁহারা উভয়েই যুগপ্রচলিত বিদ্যাসুন্দর আখ্যায়িকা লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। 'বিদ্যাসুন্দর' ভারতচন্দ্রের কবি-প্রকৃতি ও রাজসভাবর্ধিত ব্যক্তিগত রুচির যথার্থ প্রতিবিম্ব—তাঁহার কামকলাবিলাসের প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা, তাঁহার ব্যঙ্গশ্লেষ-কটাক্ষের নিপুণ প্রয়োগ, শব্দ ও ছন্দে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ও শিল্পকুশলতা, তাঁহার সুচতুর, সপ্রতিভ হাস্যরস-রসিকতা, এবং এই লঘুতরল প্রকৃতির সহিত ভক্তির আবেগহীন, মননশক্তিসমৃদ্ধ, অথচ আন্তরিক অনুভবের সংমিশ্রণ সমস্তই তাঁহার অমর কাব্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' তাঁহার কবিপ্রকৃতির একটা বিস্ময়কর ব্যতিক্রম—তাঁহার ভাবতন্ময়, সাধনাক্রমের নিগূঢ়তায় ব্যঞ্জনাপূর্ণ, আবেগঘন পদাবলীর সঙ্গে ইহার কোন মিল নাই। এই পদাবলী রচনার পর যদি তিনি বিদ্যাসুন্দর-রচনায় ব্রতী হন, তবে পৌর্বাপর্যবিচারে ইহা যেন আরও বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। সুধাপানে যিনি স্বর্গীয় আনন্দরসের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহার এই পার্থিব মাদকরস-আস্বাদনে প্রবৃত্তি আরও অস্বাভাবিকরূপে প্রতিভাত হয়। রামপ্রসাদের অধ্যাত্মসাধনার মধ্যে হয়ত একটি লৌকিক দিক ছিল, আজু গোঁসাইএর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গশর এই দুর্বলতাকে লক্ষ্য করিয়াই নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। বিদ্যাসুন্দর এই লৌকিক দিকেরই কাব্য-পরিচয়। হয়ত আশ্রয়দাতা ও পৃষ্ঠপোষক মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়াই রামপ্রসাদ তাঁহার এই প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকিবেন। কবির লড়াই দেখিতে অভ্যস্ত মহারাজা ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদকে একই বিষয়ে কাব্য রচনায় প্রণোদিত করিয়া উভয়ের শক্তি-প্রতিদ্বন্দ্বিতার মল্লযুদ্ধ উপভোগ করিতে চাহিয়াছিলেন। যে কোন কারণেই হউক, সুদূর পল্লীর নির্জ্জনতায় ধ্যানসাধনায় নিমগ্ন প্রসাদ-কবি রাজসভার বিদগ্ধরুচি, নিজ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে অতিমাত্রায় আত্মসচেতন ভারতের সহিত রাজদরবারের কৃত্রিমতাতুষ্ট, আবিলরসপিপাসু, মসীযুদ্ধের সুলভ উত্তেজনার জন্য উন্মুখ প্রতিবেশে শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাথের গল্পের শেখর ও পুণ্ডরীকের কাব্যযুদ্ধের একটা পালা কৃষ্ণনগরের রাজসভাতলে অভিনীত হইয়াছিল। এখানে অবশ্য যবনিকার অন্তরালবর্তিনী তরুণী রাজকন্যার কঙ্কণ-নিক্কণের পরিবর্তে পারিষদবর্গের চাপা ও উচ্চ হাসি শোনা যাইত ও করুণ বিয়োগান্ত পরিণতির পরিবর্তে রুচিপরিতৃপ্তির স্থূল আত্মপ্রসাদ চিত্তকে অধিকার করিত।

(২)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতকের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই শতকে বাংলার রাজনৈতিক গগনে ব্রিটিশসূর্যের অভ্যুত্থান হয় ও উহার সংস্কৃতির বিবর্তনে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগের পূর্বেই অষ্টাদশ শতকের প্রথম হইতেই একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভাবপরিবর্তনের পূর্বাভাস দৃষ্ট হয়। মনে হয় যেন দেশের ও জাতির বিধাতা-পুরুষ দেশকে পূর্ব হইতেই আসন্ন রূপান্তরের জন্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রভাতের পূর্বে যেমন আলো-অন্ধকারে জড়িত, তন্দ্রাঘোরের মধ্যে অর্ধজাগরণের ইঙ্গিতবাহী উষার উদয়, তেমনি সাহিত্যের নবজাগরণের পূর্বে তাহার একটি অস্ফুট, অর্ধসচেতন ভাবান্তর দেখা দিয়া থাকে। অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ উভয়েই কোন-না-কোন দিক দিয়া আধুনিকতার অগ্রদূতরূপে গণ্য হইতে পারেন। ভারতচন্দ্র বিশেষ করিয়া এক অভিনব বাস্তববোধের, এক নূতন সমাজ-সচেতনতা ও তীক্ষ্ণ, মোহমুক্ত স্বচ্ছদৃষ্টির, জীবন-পর্যালোচনার এক স্বতন্ত্র স্বকীয়তার জন্য আধুনিকতাধর্মী। ভারতচন্দ্রের পূর্বে বিদ্যাপতি ও মুকুন্দরামের মধ্যেও এই আধুনিক বাস্তবতার সুর শোনা যায়, কিন্তু উভয়েই এক ভাবমুগ্ধ কাব্যপ্রথানুবর্তনের পরোক্ষতায় এই প্রবণতাটির পূর্ণ অনুশীলন করিতে পারেন নাই। বিদ্যাপতির যুগে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের প্রথম আরম্ভ; মুকুন্দরামের যুগে মঙ্গলকাব্যের পূর্ণপরিণতি। তাঁহাদের পর্যবেক্ষণশক্তি প্রশংসনীয় হইলেও ইহা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত প্রথাবদ্ধতার বিপরীত স্রোতের বিরুদ্ধে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। বিদ্যাপতি চোখে যাহা লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা অতীন্দ্রিয় রূপ-আরাধনার অর্ঘ্যরূপে নিয়োজিত করিয়াছেন; তাঁহার বয়ঃসন্ধিস্থলে উপনীতা গ্রাম্য কিশোরীর মধুর, আত্মসচেতন প্রগল্‌ভতা, আসন্ন যৌবনের অপরিস্ফুট লাবণ্য-হিল্লোল অধ্যাত্ম-অনুভূতির নিবিড় ভাবরোমাঞ্চে রূপান্তরিত হয়, রূপ-সমুদ্রের কল্লোলিত চঞ্চলতার উপর অরূপলোকের রহস্যঘন গোধূলি-স্তব্ধতা নামিয়া আসে। মুকুন্দরামের ভক্তি অবশ্য ঠিক আধ্যাত্মিক ভাবসাধনার পর্য্যায়ে উঠে নাই—ইহাতে দৈবশক্তির অলৌকিক লীলার সম্মুখীন প্রাকৃত মানবের আদিম সরল বিস্ময়ই ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহাতে সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-প্রতিষ্ঠার বিনিময়েই আত্মনিবেদনের প্রেরণা জাগিয়াছে। তাঁহার চণ্ডী লৌকিক জীবনের দেবী; সুতরাং সমাজ-জীবনের সরস উজ্জ্বল চিত্র তাঁহার দেবমহিমা-

ভক্তির মোড়কে এই কামকলার কাব্যবটিকা পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। বিশেষত তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে অসাধ্য-সাধনের সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে যখন দেশবাসীর বদ্ধমূল বিশ্বাস জন্মিল, তখনই কালীমন্ত্রের বলে সুড়ঙ্গ-খনন ও মশানে আসন্ন মৃত্যু হইতে উদ্ধার কবি-কল্পনাকে উদ্দীপিত করিল। প্রাচীনতর মঙ্গল-কাব্যেও এইরূপ দৈবশক্তির অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনের উদাহরণ আছে, কিন্তু উহার প্রতিবেশ সম্পূর্ণ বিভিন্ন—সমুদ্রে ঝড়-তুফান ও নৌকাডুবি, তরঙ্গ-লহরীর উত্তাল উত্থান-পতনের মধ্যে কমলে-কামিনীর মরীচিকার আবির্ভাব ও বিদেশীয় রাজসভায় অভাবিত বিপদ হইতে মুক্তি ঘটনার দিক দিয়া প্রায় অভিন্ন, কিন্তু অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের দিক দিয়া সম্পূর্ণ পৃথক্। শ্রীমন্ত ও ধনপতির বিপদ দেব-রোষসঞ্জাত ও স্তবস্তুতির দ্বারা দেবের প্রসাদলাভে উহার নিবারণ। সুন্দরের বিপদ স্বয়ংসৃষ্ট, রূপমোহের অসংযত আতিশয্য হইতে উদ্ভূত; কালীমন্ত্র-সিদ্ধিতে তাহার যে কেবল বিপদ কাটিয়াছে তাহা নহে, তাহার নৈতিক অপরাধেরও স্খালন হইয়াছে। সুতরাং ঘটনাগত কিছুটা সাম্য থাকিলেও এই বিদ্যাসুন্দর কাব্যগুলি নীতিসমস্যা ও অসামাজিক ও অশালীন আচরণের জন্যও দেবতার সমর্থন ও প্রশ্রয় লাভের দিক দিয়া পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যসমূহ হইতে পৃথক এক নূতন সমাজ-চেতনার সাক্ষ্য বহন করে।

সে যাহাই হউক, ভারতচন্দ্র যে এই জাতীয় কাব্যরচয়িতাদের মধ্যে অবিসংবাদিতরূপে শ্রেষ্ঠ তাহা সর্বজন-স্বীকৃত। মনে হয় যে, তাঁহার নৈসর্গিক কবিপ্রতিভা ও জীবন-অভিজ্ঞতা হইতে অর্জিত রুচি তাঁহাকে এই ধরণের কাব্য লিখিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল। এই অশ্লীল দেহসম্ভোগের চিত্রকে যতদূর কাব্যগুণোপেত করা যায়, ইহার স্থূল ও রুচি-বিগর্হিত বস্তু ও ঘটনাগত উপাদানসমূহকে যতদূর বস্তুর অতীত একটি ভাবরসে পরিণত করা সম্ভব, ভারতচন্দ্র সেই দুরূহ কার্যে চরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। শুধু বর্ণনার কৌশল বা শব্দ ও ছন্দের পারিপাট্যই তাঁহার অভাবনীয় সাফল্যের কারণ নহে। ইংরাজীতে যাহাকে gusto বলে, সেই জীবনরস-উচ্ছলতার সবটুকু উপভোগ-শক্তি দিয়া তিনি এই কলুষিত, অথচ মোহকারী সৌন্দর্যের চরম স্বাদুতা আস্বাদন করিয়াছেন। এই উচ্ছৃঙ্খল যৌবনমাদকতার রূপসজ্জাময় প্রতিবেশ-রচনায়, সংলাপে, গানে, সহায়ক পাত্র-পাত্রীর নিপুণ সমাবেশে, বর্ণনা-বিবৃতিতে উপচাইয়া পড়া রস-সঞ্চারে তিনি সমগ্র কাব্যটিকে একটি কামকলাবিলাসের

পীঠস্থানের মর্যাদা দিয়াছেন। তাছাড়া কবির নিজের হাবভাব-কটাক্ষে, তির্যক ইঙ্গিত ও সঙ্কেতে, ঈষৎ শ্লেষাত্মক মন্তব্যে, সমাজ-জীবনের গ্লানিকর, ছেঁড়া, তালি-দেওয়া নীচের দিকের উদ্‌ঘাটনে বাস্তবলবণ-সংযোগে কৃত্রিম আদর্শবাদক্লিষ্ট রুচির বিস্বাদ দূরীকরণে এমন একটা সোৎসাহ সমর্থন ও বর্ণিত বিষয়ের সহিত একাত্মতার নিদর্শন পাওয়া যায় যে, ইহাতে যে মধ্যযুগীয় ভাব-কুম্ভকর্ণের ষড়শতাব্দব্যাপী নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, কবিচিত্তে যে নূতন ক্ষুধা, রসনা-পরিতৃপ্তির নূতন প্রেরণা অনুভূত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যেমন মুরশিদকুলি খাঁর রাজস্ব-ব্যবস্থায়, আলিবর্দির মহারাষ্ট্র-আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য উৎকোচদান-নীতির অবলম্বনে, সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে কূট-রাজনৈতিক চক্রান্তের প্রবর্তনে, ইংরেজ কোম্পানীর সহিত বৈষয়িক সম্পর্ক স্থাপনে বাংলার রাজনৈতিক নাটকের দৃশ্যপরিবর্তন সূচিত হইয়াছে, তেমনি ভারতচন্দ্রের কাব্যেও বাঙ্গালী কবিচিত্ত দীর্ঘকাল প্রথানুগত্যের পর এক নবচেতনার প্রথম উন্মেষের পরিচয় দিয়াছে।

(৪)

রামপ্রসাদের কবিতায় আধুনিকতার চিহ্ন খুব সুস্পষ্ট না হইলেও গভীরভাবে অনুধাবন করিলে লক্ষ্যগোচর হয়। তিনি সাধকরূপে প্রাচীন তন্ত্রসাধনা-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু কবিরূপে তাঁহার প্রকাশরীতি ও অনুভূতির স্বকীয়তা আধুনিকত্বের পরিচয় বহন করে। তাঁহার পদাবলীতে রূপবর্ণনা ও সাধনাক্রম-নির্দেশ প্রাচীন সংস্কৃতির প্রভাবের ফল। কিন্তু মাতৃরূপিণী বিশ্বশক্তির সহিত পরিচয় স্থাপনের প্রচেষ্টার মধ্যে তাঁহার যে মানবিক আবেগ-আকৃতি ও দুরূহতত্ত্বে অনুপ্রবেশশীলতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা আধুনিক। এই আবেগ-আকৃতি রামপ্রসাদের পদে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণ নহে, ইহা তাঁহার নিজস্ব অধ্যাত্মদৃষ্টি-সঞ্জাত। বৈষ্ণব পদাবলীতে যে হৃদয়াবেগের অসংবরণীয়তা ও মর্মস্পর্শী গভীরতা দেখা যায় তাহা উহার অঙ্গীভূত প্রেমসাধনা ও মধুররস-মন্থনের অনিবার্য পরিণতি। তাছাড়া বৈষ্ণবকাব্যে তত্ত্ব-আবেগকে বাঁধিয়া রাখিবার বেষ্টনীরেখা উহারই ঘনীভূত কঠিন রূপ। সুতরাং বৈষ্ণব দর্শন ও পদাবলীর ভাবমাধুর্য-রসের প্রকারভেদ—কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্যচরিতামৃত' বৈষ্ণবরস-প্লাবনের পলি-পড়া কোমল ভূখণ্ড। কিন্তু তন্ত্রসাধনায় সুকোমল হৃদয়বৃত্তির বিশেষ কোন স্থান নাই—বরং সাধারণ প্রবৃত্তির উৎসাদনের উপরই ইহা

প্রতিষ্ঠিত। নারী লইয়া সাধনা, মদ্যমাংসের উপচার, নরবলি, কৌমার্যহরণ প্রভৃতি নৃশংসাচার, শ্মশানের ভয়াবহ পরিবেশে পূজানুষ্ঠান—এ সমস্তই সহজ জীবনযাত্রা ও ভক্তিনিবেদন-প্রণালীর বীভৎস ব্যতিক্রম। এই কঠোর তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে দয়ামায়াপ্রীতি-মানঅভিমান-আত্মনিবেদন প্রভৃতি সুকুমার হৃদয়াবেগের উৎসারণেই রামপ্রসাদের মৌলিকতা। বীভৎসের মধ্যে মধুরের আবিষ্কার, প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসলীলায় উন্মত্তা কালীমূর্তির নৃশংসতার অন্তরালে স্নেহমমতাময়ী মাতার স্পর্শ, জীবনের সমস্ত জটিলতার পিছনে এক মায়াময়ীর রহস্যজাল-বিস্তারের অনুভূতি, ইহার সমস্ত বিভ্রান্তি-বঞ্চনার মধ্যে পরম সান্ত্বনার নিশ্চিত আশ্বাস—এই মৌলিকতার স্বাক্ষর বহন করে। তা ছাড়া রামপ্রসাদ দেবী ও মানবের সম্পর্ক-রহস্যকে এক সম্পূর্ণভাবে পারিবারিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বিন্যস্ত করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে অধ্যাত্মরহস্যকে পরিবারকেন্দ্রিকরূপে দেখাইবার চেষ্টা আছে, কিন্তু বৈষ্ণবের রসলীলার প্রকৃত পটভূমিকা অপ্রাকৃত বৃন্দাবন, যেখানে পরিবারজীবনের ছায়ারূপ আছে, কিন্তু কায়ারূপ নাই। শ্রীরাধার স্বামী আছে, শাশুড়ী-ননদী আছে, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবনের সখাগোষ্ঠী ও স্নেহময় অবলম্বন পিতামাতা আছেন, কিন্তু ইঁহারা যেন ঐশী লীলার এক একটি ক্ষণিক বুদ্‌বুদ মাত্র—দুরত্যয়া দৈবী মায়ার ছলনাময়ী সৃষ্টি। লীলার চরম মুহূর্তে এই কল্পিত সমাজটি, মধ্যাহ্নসূর্য-প্রক্ষিপ্ত সঙ্কুচিত ছায়ার ন্যায়, কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে; প্রাণবেগচঞ্চল রক্তমাংসের মানুষগুলি অবয়বহীন হইয়া মনের সুদূর প্রান্তে একটি বেদনাময় স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। এই বিরাট, বিশ্বব্যাপী শূন্যতার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নির্লিপ্ত নিষ্ঠুর রহস্যমধুর হাসি দিয়া ঢাকা, নিগূঢ় নিয়তি-লীলার প্রকটন, আর শ্রীরাধার নিখিলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধ্বনিত অপ্রশমিত বিরহ-বেদনা যুগল শাশ্বত সত্যের ন্যায় চিরন্তন মহিমায় বিরাজিত।

রামপ্রসাদের সংসার-চিত্রের মধ্যে এরূপ অবাস্তবতা ও দৃষ্টিবিভ্রমের মরীচিকা নাই। সংসারের খেরুয়া খাতাকে তিনি ভক্তির স্বর্ণসূত্রে শতপাকে জড়াইয়াছেন। তিনি হিসাবের বইএ কালীনাম লেখেন; জগদীশ্বরী কন্যারূপে তাঁহার বাড়ীর বেড়া বাঁধিতে সাহায্য করেন। আদালতের পেয়াদা যখন তাঁহার উপর ডিক্রিজারী করিতে আসে তখন তাহার তকমার উপরে কালীনামের শীলমোহর অঙ্কিত থাকে। সংসারের শত তুচ্ছ অভাব-অভিযোগ, পীড়ন-অপমানের

রন্ধ্রপথ দিয়া তিনি কালীর কল্যাণ হস্তের স্পর্শ অনুভব করেন। জীবনের খেলাধূলা, ক্রীড়া-কৌতুক সবই তাঁহার কাছে অধ্যাত্মলোকের দ্বার উন্মুক্ত করে। পাশাখেলায় এক অদৃশ্য হস্ত তাঁহার দান উল্‌টাইয়া দেয় ও পাকা ঘুঁটিকে কাঁচা করে ও কাঁচাকে পাকাইয়া দেয়। মন-ঘুড়ি কালীপদ আকাশের ঊর্ধ্বলোকে উড়িতে উড়িতে হঠাৎ কু-বাতাসের ঝাপটায় পৃথিবীর কাছাকাছি নামিয়া আসে ও আবিল বায়ুস্তরে মাথা লুটাইয়া পড়ে। প্রত্যেকটি ব্যবসায় ও বৃত্তি অপার্থিব জীবন-সাধনার প্রতীকরূপে তাঁহার নিকট প্রতিভাত হয়। কৃষিকর্মরত কৃষককে দেখিয়া অকস্মাৎ তাঁহার মনে জাগে যে, স্বর্ণপ্রসূ মানবজমীন অকর্ষিত রহিয়া গেল এবং চাষের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার রূপকে সাধনার সমস্ত ক্রমগুলি তাঁহার মনে পুনরাবৃত্ত হয়। চোখে-ঠুলি-আঁটা কলুর বলদ তাঁহাকে অনিবার্যভাবে মোহান্ধ, প্রবৃত্তি-তাড়িত মানবজীবনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। জেলের জাল ফেলায় মৎস্যকুলের আকুলতা মহাকালের পাশবদ্ধ হইবার জন্য অসহায়ভাবে প্রতীক্ষমান মানবের করুণ চিত্রটি তাঁহার মনে ফুটাইয়া তোলে। সুতরাং রামপ্রসাদের ভক্তি-সাধনার পদগুলিতে বাংলা গ্রামীণ চিত্রের সমগ্রতা প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ইহা কিন্তু সত্যকার গ্রামজীবন, ইহার মধ্যে কোন ভাবাদর্শগত রূপান্তর বা কল্পনা-বিলাস নাই। এই গ্রাম্যজীবন অধ্যাত্মসাধনার প্রতীক, কিন্তু ইহা স্বধর্ম হারায় নাই, ইহার অঙ্গবিন্যাসে রক্তমাংস উবিয়া যায় নাই। ইন্ধনগুলিতে হোমশিখা জলিয়াছে, কিন্তু বস্তুজগতের এই উপাদানগুলি উহাদের ইন্ধনধর্মিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এইখানেই রামপ্রসাদের সত্যিকার আধুনিকতা—আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে তিনি সনাতন সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছেন। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ উভয়েই নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী গতানুগতিকতার অর্ধচেতন অনুবর্তনের মধ্যে পূর্ণসচেতন মননশক্তির ও মৌলিক অনুভূতির পরিচয় দিয়াছেন।

(৫)

সুখের বিষয় যে, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের শুধু রচনাগত কাব্যোৎকর্ষ নয়, ঐতিহাসিক তাৎপর্যও স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ডাঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য এই বিষয়ে যে মৌলিক গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখিয়া ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন, তাহা এক্ষণে গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইল। ইহাতে তিনি প্রথমত কবিদ্বয়ের যুগের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়া তাহার পর

তাঁহাদের জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে বিশদ ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া বিদ্যাসুন্দর কাব্যে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে তিনি উভয়ের কবিপ্রকৃতির ও রুচির পার্থক্য ও সাময়িক মিল সম্বন্ধে অনেক যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পরিশিষ্টে গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থমধ্যে ভারতচন্দ্রের সত্যপীরের পাঁচালি ও রামপ্রসাদের কালীকীর্তনের দুইখানি অজ্ঞাতপূর্ব পাণ্ডুলিপি সন্নিবিষ্ট করিয়া গ্রন্থ দুইটি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি করিয়াছেন ও কোথাও কোথাও উন্নততর পাঠান্তর স্থিরীকরণে সাহায্য করিয়াছেন। সবশেষে রামপ্রসাদ নামে একাধিক পদ-রচয়িতার রচনা কিরূপ বিচারের মানদণ্ডে পৃথক করা সমীচীন, সে সম্বন্ধে পূর্ব-পূর্ব সঙ্কলনকারীর মতবাদ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন ও নিজ অভিমতের ভিত্তিতে সমস্ত প্রসাদী পদাবলীকে তিনটি পৃথক শ্রেণীতে বিন্যস্ত করিয়া পাঠককেও স্বাধীন বিচারে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। মোটকথা তাঁহার আলোচ্য গ্রন্থখানি অদূর অতীতের দুই শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যের প্রতি আধুনিক সমালোচনা-রীতির সার্থক প্রয়োগে উহাদের নূতন মূল্য নির্ধারণ-প্রয়াসের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। আমি তাঁহার আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে কোন কোনটি সম্বন্ধে আমার নিজের কিছু কিছু মন্তব্য সংযোজনা করিয়া তাঁহার মূল্যবান গ্রন্থটিকে পাঠকসমাজে পরিচিত করিবার দায়িত্ব পালন করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথম প্রশ্ন হইল যে, বাঙ্গালায় অষ্টাদশ শতকের ইতিহাসে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল কি না যাহা ভারতচন্দ্রের ও রামপ্রসাদের কুরুচি ও প্রায়-অনাবৃত ইন্দ্রিয়লালসা-প্রবণতাকে উত্তেজিত করিয়াছিল ও প্রশ্রয় দিয়াছিল? বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসের প্রভাব কখনই খুব সুস্পষ্ট ছিল না—বাঙ্গালী কবি কোন দিনই ইতিহাসের বহির্ঘটনার দ্বারা তাদৃশ প্রভাবিত হন নাই। যুগে যুগে অন্তর-প্রেরণার বহিঃপ্রকাশস্বরূপ যে এক একটি কাব্যপ্রথা, মানুষের দেবতা সম্বন্ধে ধারণার এক একটি নূতন কল্পনা উদ্ভূত হইয়াছিল, কবিগোষ্ঠী সমসাময়িক ইতিহাস-সংঘটনকে অনেকটা উপেক্ষা করিয়া অবিচলিতচিত্তে তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিতা, মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন শাখা, সহজিয়া সাহিত্য, শাক্ত পদাবলী—এ সবই বাঙ্গালীর ধর্মচর্চা ও অধ্যাত্মসাধনার এক একটি অধ্যায়—হয়ত ইহাদের মধ্যে কোথাও কোথাও ইতিহাসের ক্ষীণ স্মৃতি খুঁজিয়া পাওয়া যায়, কিন্তু মোটের উপর ইহারা ইতিহাস-নিরপেক্ষ। ইতিহাসের পরিবর্তন-ধারা যখন

পরোক্ষভাবে সমাজ-চেতনায় ও দেব-পরিকল্পনায় অনুভূতির একটা নূতন সুর সংযোজনা করিয়াছে, যখন ইহার দীর্ঘকালব্যাপী নিঃশব্দ ক্ষরণ চিত্তফলকে গভীর দাগ কাটিয়া বসিয়াছে, তখনই ইহা সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়াছে। ইতিহাস, গুহাশ্রয়ী নির্ঝরধারার ন্যায়, বাহিরের ঘটনা হইতে যখন অন্তরের গভীরে আত্মসংহরণ করিয়াছে, তখন ইহার একটি অভাবনীয় রূপান্তর-সাধন ঘটিয়াছে—ইহার স্রোতোবেগ, ইহার কলধ্বনি, ইহার সংঘাত ও উত্তেজনা সবই আশ্চর্যরূপে স্তব্ধ হইয়া ইহা মানস-সংস্কারের শান্ত ছন্দের সহিত মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। অষ্টাদশ শতকে কি এই যুগযুগান্তরব্যাপী প্রক্রিয়ার কোন ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়? অবশ্য মনের ভাবনিষ্ঠা কমিলে বাহির সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়—অন্তরের উৎস শুকাইলে বাহিরের কোথায় কি রসের প্রস্রবণ আছে সে দিকে লক্ষ্য যায়। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকটা অন্তত এইরূপ একটি অন্তর-রিক্ততার যুগ—মানুষ তখন ঘরের সঞ্চয় হারাইয়া বাহিরের আহরণের দিকে খানিকটা মন দিয়াছে। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের অশ্লীলতা ও কুরুচি কি যুগ-প্রভাবের ফল? ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন হইতে সমস্ত পরবর্তী ঐতিহাসিক মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা ও ব্যক্তিগত প্রভাবকে এই কুরুচির উৎসরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান উদ্ভাবন করেন নাই। ভারতচন্দ্রও উহার সর্বপ্রথম প্রবর্তক নহেন। তা ছাড়া, বিদ্যাপতিও মিথিলা-রাজসভায় এই আদিরসের প্রস্রবণ বহাইয়া দিয়াছিলেন। অবশ্য সে যুগে প্রথম-অনুভূত ভক্তিরসের জোয়ারে এই আদিরস চাপা পড়িয়া গিয়াছিল—রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমলীলা বিদ্যাপতির নাগর-প্রণয়-কলার অশালীন ইঙ্গিত-বর্ণনার কলঙ্করেখাসমূহকে নিজ বিশুদ্ধতর ভাব-ব্যঞ্জনার স্নিগ্ধচন্দ্রিকায় আবৃত করিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের যুগে ভক্তির সেই সর্বশোধনকারী শক্তি অনেকটা ক্ষীণ হইয়া পড়ায়, প্রাকৃত লক্ষণগুলি আবার মাথা তুলিয়া উঠে। এ যেন দেহের প্রাণশক্তির সহিত রোগবীজাণুর চিরন্তন সংগ্রামের একটি সাংস্কৃতিক প্রতিরূপ। নবাবী যুগ বঙ্গদেশে কৃষ্ণচন্দ্রের সময় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং মুসলমানী আদর্শের বিলাস-ব্যসন-ব্যভিচার যে এই যুগের রুচিবিকারের কারণ তাহাও ঐতিহাসিক তথ্য-সমর্থিত নয়। রাজশক্তির স্বৈরাচার, জমিদারের উৎপীড়ন, সমাজ-শৃঙ্খলার শিথিলতা—এ সমস্ত দুর্বিপাকও বাঙ্গালার ইতিহাসে

নূতন আগন্তুক নহে, অতীতকাল হইতে পুনরাবৃত্ত অভিজ্ঞতা। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে এই অরাজকতার চিত্র পাই, কিন্তু উহা তাঁহার কাব্যে ও জীবনে নৈতিক শিথিলতা ও আদিরসাত্মক আবেশের প্রবর্তন করে নাই। অষ্টাদশ শতকের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এই টুকু স্বীকার করা যায় যে, ইহার প্রারম্ভ হইতে বাঙ্গালা দেশ কার্যত দিল্লী-সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হইয়া প্রাদেশিক শাসন-কর্তার উগ্রতর ও প্রত্যক্ষতর কুশাসনের পাপচক্রে বিঘূর্ণিত হইতে থাকে। মুরশিদকুলি খাঁ নিজের হাতে সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া যে শাসন ও রাজস্ব-ব্যবস্থার প্রচলন করিলেন, তাহা নৈকট্যের তীক্ষ্ণতায় ও প্রয়োগের বজ্র-কঠোরতায় ভূস্বামীবর্গের ও প্রজাসাধারণের অনেক বেশী অশান্তি ও দুর্গতির কারণ হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, বর্গীর আক্রমণ বাঙ্গালার মর্মস্থলে একটা তীব্র আতঙ্ক ও অস্বস্তির অনুভূতি জাগাইয়া শুধু যে উহার বৈষয়িক জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়াছিল তাহা নহে, উহার কল্পনাকে অভিভূত করিয়া উহার শিশুমনে পর্যন্ত একটা ভীতি-রহস্যের দোলা দিয়াছে—মায়ের ঘুমপাড়ানি গানের মধ্যে, মাতা ও শিশুর মধুর কল্পনাভরা সম্পর্কের মধ্যে একটি অশুভ, আতঙ্ক-কণ্টকিত দুঃস্বপ্নের ছায়াপাত করিয়াছে। যে আবিল প্রবাহ কর্দমাক্ত চূর্ণীর স্রোতের ন্যায় কৃষ্ণনগরের রাজপ্রাসাদের পার্শ্ব দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তাহা সুদূর অতীত হইতে আগত জলধারারই একটি অশোধিত, অসংস্কৃত রূপ। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই প্রবাহের খাত খনন করেন নাই। সুতরাং যুগের রুচি-নিয়ামকের গৌরব বা অগৌরব তাঁহার প্রাপ্য নহে। তাঁহার বিরুদ্ধে আমাদের একমাত্র অভিযোগ যে, তিনি এই মলিন প্রবাহে রামপ্রসাদকে অবগাহন করাইয়া তাঁহার কালী নামাবলীর উজ্জ্বলতা কথঞ্চিৎ ম্লান হইবার হেতু হইয়াছেন।

এখন রামপ্রসাদ-সমস্যা সম্বন্ধে দুইচারি কথা বলিয়া এই আলোচনার উপসংহার করিব। একাধিক রামপ্রসাদের অস্তিত্ব ঈশ্বরগুপ্তের সময় হইতেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ইহার সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিয়া লাভ নাই। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, পূর্ববঙ্গের চিনিশপুরের রামপ্রসাদ সত্য সত্যই কতগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন ও কোন আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যে হালিশহর ও চিনিশপুরের রামপ্রসাদের রচনাকে পৃথক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় কি না। যে সমস্ত পদে দ্বিজ ভণিতা আছে, সেগুলি, ভণিতার অকৃত্রিমতা মানিয়া লইলে, ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব পূর্ববঙ্গীয় রামপ্রসাদের বলিয়াই গ্রহণ করিতে

হয়। কেননা রামপ্রসাদ নিজেকে দ্বিজসংস্কৃতির অধিকারী বলিয়া মনে করুন আর নাই করুন, তিনি বহুপদে ও কালীকীর্তনে নিজেকে দাস উপাধিতে অভিহিত করিয়া আবার দ্বিজসংজ্ঞায় পরিচিত হইতে চাহিবেন ইহা অবিশ্বাস্য। দাস ও দ্বিজ এক মনোবৃত্তি হইতে প্রসূত হইতে পারে না। সুতরাং দ্বিজ ভণিতার পদগুলি না হয় রামপ্রসাদের রচনা হইতে বাদ দেওয়া গেল। পূর্ববঙ্গের ভাষা ও বাগ্‌ধারার প্রয়োগ যে সমস্ত পদে আছে সেগুলিও না হয় ভাগীরথীতীরবাসী রামপ্রসাদের রচনাসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত না হইল। পূর্ব-জীবনের যে সমস্ত উল্লেখ রামপ্রসাদের জীবন সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে সেগুলিতেও তাঁহার দাবী প্রত্যাহৃত হওয়াই সঙ্গত। কিন্তু আভ্যন্তরীণ কোন নির্ভর-যোগ্য প্রমাণের দ্বারা উভয়ের রচনা চিহ্নিত হইতে পারে কি না সন্দেহ। কেহ কেহ এখানকার রামপ্রসাদের শাস্ত্রজ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও সাধনপ্রণালীর সহিত পরিচয়ের অন্তরঙ্গতার উল্লেখ করিয়া ও ঐ সমস্ত গুণের আপেক্ষিক অসদ্ভাব পূর্ববঙ্গের রামপ্রসাদের মধ্যে আবিষ্কার করিয়া উভয়ের পার্থক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু আমি এরূপ কোন নিশ্চিত মানদণ্ডের পরিচয় পাই নাই। দ্বিজ-চিহ্নিত কোন পদে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য বা সাধনা-স্বাতন্ত্র্যের কোন ইঙ্গিত আবিষ্কার করা কঠিন। তাছাড়া চিনিশপুরের রামপ্রসাদের রচিত পদগুলি সংখ্যায় এত অল্প যে, সেগুলিকে কোন সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী কবির রচনার মর্যাদা দেওয়া যায় না। যাঁহার ভাব-উৎস রামপ্রসাদ হইতে পৃথক, অথচ রামপ্রসাদের মত গভীর ও জীবনের সর্ব-অনুভূতি-ব্যাপ্ত, তাঁহার রচিত কবিতা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইলে উহা কাব্যপ্রতিভার সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের সহিত সামঞ্জস্যহীন হইয়া পড়ে। অবশ্য এমনও হইতে পারে যে, পূর্ববঙ্গের রামপ্রসাদের অনেক পদ লুপ্ত হইয়াছে ; কিন্তু তিনি অপর রামপ্রসাদের সমকালীন হইলে ও প্রায় তুল্যরূপ জনপ্রিয় হইলে, লোকের মুখে মুখে তাঁহার অনেক পদ প্রচারিত থাকিত ও উহাদের ব্যাপক বিলুপ্তি সম্ভব হইত না। সুতরাং সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য হইয়া পড়ে যে, পূর্ববঙ্গের রামপ্রসাদ হয় স্বাধীনভাবে কিংবা শ্রেষ্ঠতর রামপ্রসাদের সচেতন অনুকরণে পূর্ববঙ্গের বাগ্‌-রীতিতে ও নিজ জীবন-অভিজ্ঞতার সার-নির্যাস সন্নিবিষ্ট করিয়া কয়েকটি ভাবঘন পদ রচনা করেন ও এগুলি রামপ্রসাদের রচনার সহিত এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, জনসাধারণের অনুভূতিতে ও সমালোচকের বিচারে উহারা প্রায়

অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য একাধিক রামপ্রসাদের অস্তিত্ব-স্বীকারও রামপ্রসাদের কবিগৌরবের মর্যাদা-হানি করে না। বৃহত্তর তারকার নিকট যদিই বা কোন ক্ষুদ্রতর তারকা মৃদু রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া থাকে, তথাপি দ্যুতির অখণ্ডতা ও স্নিগ্ধতা সমানই আছে। রামপ্রসাদ নামের পিছনে যে অধ্যাত্ম-তাৎপর্য নিহিত আছে, তাঁহার যে পুণ্যপ্রভাব বাঙ্গালীর অন্তরলোকে প্রবেশ করিয়া তাহার সংস্কৃতি ও ভক্তিবাদকে একটি সুসংহত ও পরিবর্তনের অতীত রূপ দিয়াছে, নাম-বিভাগের দ্বারা তাহাকে কোন মতেই খণ্ডিত করা যাইবে না। তাঁহার ব্যক্তিসত্তা যতই বিদারণ-রেখায় অঙ্কিত হউক না কেন ভাববিগ্রহরূপী রামপ্রসাদ এক ও অদ্বিতীয়।

১৫ই মার্চ, ১৯৫৬
৩১নং সাদার্ণ এভিনিউ
কলিকাতা—২৯

সূচীপত্র

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের পদাবলী

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ

প্রথম অধ্যায়

অষ্টাদশ শতকের বাংলা দেশ ও বাঙালী সমাজ

অষ্টাদশ শতকের বাংলা দেশে যুগসন্ধ্যার অন্ধকার ঘনায়মান। দেশের রাষ্ট্রীয় গগন রাষ্ট্রীয় বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্রের মেঘে আচ্ছন্ন। একদিকে, বিদেশী বণিকের বাণিজ্যসম্ভার জাহাজ বোঝাই হইয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন বন্দরে আসিয়া নামিতেছে, এবং দেশের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী দিয়া সেই বিচিত্র পণ্যসম্ভার দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই বাণিজ্যকে আশ্রয় করিয়া ইংরেজ বণিক বাংলা দেশে ও কলিকাতা, হুগলী, চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বসিয়াছে। অন্যদিকে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় আকাশে যে রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের ঘন মেঘ বিস্তৃত হইতেছিল, তাহার একাংশ তখন বাংলা দেশকেও ঢাকিয়াছিল। বাংলার রাজশক্তি তখন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, দরবারী চক্রান্ত, আত্মকলহ ও বিলাসপরায়ণতায় আচ্ছন্ন। রাষ্ট্রীয় শক্তি ক্রমশঃ শিথিল হইতে শিথিলতর হইতেছে। এই দুর্ব্বল, শিথিল ও ক্ষীয়মান রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে নবজাগরিত ইংরেজ বণিক-শক্তির সংঘর্ষ ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে।

এই দুর্ব্বল রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলের মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িল মারাঠা বর্গীর উপদ্রব। সুদীর্ঘ প্রায় দশ বৎসর কাল ধরিয়া এই বর্গীর হাঙ্গামা বাংলার বুকে কি পরিমাণ ক্ষত রচনা করিয়াছিল, তাহা ইতিহাসের বিষয়বস্তু হইয়া আছে। কিন্তু তদানীন্তন বাঙালী মানস এই উৎপাতকে কি দৃষ্টিতে দেখিয়াছিল, তাহার কিছু ইঙ্গিত ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামঙ্গলে এবং গঙ্গারাম তাঁহার মহারাষ্ট্রপুরাণে রাখিয়া গিয়াছেন। ভারতচন্দ্র বলিতেছেন, আলিবর্দ্দী এবং তাঁহার সৈন্যসামন্তরা পুরী ও ভুবনেশ্বরের মন্দির লুণ্ঠন করিয়া হিন্দুমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন, এবং হিন্দুরা মারাঠা বর্গীর আক্রমণের মধ্যে সেই আহত-মর্য্যাদার প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজিয়া পাইয়াছিল। ভারতচন্দ্রের উক্তি কতখানি বিশ্বাসযোগ্য, বলা কঠিন।

ব্রাহ্মণ ভারতচন্দ্র, ধর্ম্মনিষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার সভাকবি ছিলেন, এবং এই কৃষ্ণচন্দ্র একদা বার লক্ষ টাকা নজরানা দিতে না পারিয়া আপনগৃহে কিছুকাল নজরবন্দী অবস্থায় ছিলেন; কাজেই ভারতচন্দ্রের উক্তি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নাও হইতে পারে। কিন্তু গঙ্গারাম মহারাষ্ট্রপুরাণে যাহা বলিতেছেন, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। হিন্দু-সামন্ত-জমিদার-সম্প্রদায় বহুদিন হইতেই মুসলমান রাজশক্তির হস্তে নানাভাবে উৎপীড়িত, অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত হইতেছিলেন, এবং তাঁহারা প্রতিকারের সুযোগ অন্বেষণ করিবেন, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। গঙ্গারাম তাহাই বলিতেছেন। তাঁহার বিবরণে দেখিতেছি, দেশে তখন দুঃখ-দুর্গতির অন্ত নাই, ভয়ভীত এবং রাজকীয় অত্যাচারে উৎপীড়িত হিন্দু বাঙালী, মারাঠা নেতাদের কাছে নিজেদের দুঃখ ও আতঙ্ক নিবেদন করিয়াছিল, এবং সেই দুঃখ প্রতিকারের প্রার্থনা জানাইয়াছিল। বর্গীর আক্রমণের প্রথম পর্ব্বে সাধারণ গ্রাম-নির্ভর বাঙালী আশা ও আশ্বাস পাইয়াছিল, কিন্তু পরে বর্গীদের অত্যাচারে ও উৎপীড়নে সেই আশা ও আশ্বাস ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছিল এবং বাঙালীমন মুসলমান শাসনতন্ত্রের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিল, একথাও গঙ্গারাম বলিতেছেন। কাজেই গঙ্গারামের সাক্ষ্য যে একজন সাধারণ বাঙালীর সমসাময়িক সাক্ষ্য, একথা মানিয়া লইতে কোন বাধা নাই। পশ্চিম-বঙ্গে বর্গীরা কি পরিমাণ নিষ্ঠুর অত্যাচারে জনসাধারণকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল, কি অমানুষিক বর্ব্বরতার অনুষ্ঠান করিয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ গঙ্গারামের মহারাষ্ট্রপুরাণে, বর্দ্ধমানরাজসভাপণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের বিবরণে এবং সলিমুল্লা এবং গোলাম হুসেন সালিমের সমসাময়িক বিবরণেই জানা যায়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মন্তুদ হইয়া সমগ্র বাঙালী চিত্তের আর্ত্তনাদ প্রকাশ পাইয়াছে, গ্রাম্য একটি ছড়ার কয়েকটি লাইনে ;—

'ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো বর্গী এলো দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে॥'

সত্যই বাঙালী কৃষকের তখন রাজদরবারের খাজনা যোগাইবার সামর্থ্য দূরে থাক, দৈনন্দিন গ্রাসাচ্ছাদনের অবস্থাও ছিল না। দেশের লোকের দুরবস্থা নানাকারণে তখন চরমে উঠিয়াছিল। সপ্তদশ শতকের শেষ এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথমপাদ পর্য্যন্তও যে বাংলা দেশ কৃষি ও বাণিজ্য-লব্ধ অর্থে ঐশ্বর্য্যবান্ ছিল, দেখিতে দেখিতে সে ঐশ্বর্য্য কোথায় উবিয়া গেল, তাহার হিসাব করাও

কঠিন। বর্গীর হাঙ্গামায় পশ্চিমবঙ্গের কৃষি একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর পর্ত্তুগীজ এবং মগ-জলদস্যুদের উৎপাতে পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের কৃষি ও বাণিজ্যের অবস্থাও চরম দুর্গতিতে আসিয়া পৌছাইয়াছিল। রামপ্রসাদ বর্দ্ধমান নগরের বাজারের যে বিবরণ দিতেছেন, তাহাতে কিছু সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যের পরিচয় আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই বাজারের অধিকাংশ বণিক বিদেশী, এবং বাংলার বস্ত্রসম্ভার তাহারাই কিনিয়া বিদেশে চালান দিতেছে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে যে বিদেশী দ্রব্যসম্ভার তাহারা লইয়া আসিয়াছে, তাহা সমস্তই বিলাসের উপকরণ। যে বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্প বাংলা দেশের অর্থসমৃদ্ধির উপায় ছিল, বর্গীর হাঙ্গামায় তাহাও বিনষ্টপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। তাহা ছাড়া, পাইকারী দ্রব্য বিক্রয়ের উপর বাজারের মালিক জমিদারেরাও প্রচুর করভার চাপাইয়া দিতেন, দৈনন্দিন প্রয়োজনের খাদ্যবস্তুও তাহাতে বাদ পড়ে নাই। তাহার ফলে, চাল, ডাল, নুন, তেল, ঘি, চিনি ও ময়দা সমস্ত কিছুরই মূল্য অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল, জনসাধারণের দুঃখ-দুর্গতির সীমা ছিল না। এই অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধির কিছু পরিচয় ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে মালিনীর বেসাতির বিবরণে আছে।

এই চরম আর্থিক দুঃখ-দুর্গতির অন্যতম লক্ষণ, এই সময়ের গ্রাম ও নগরের বাজারগুলিতে প্রকাশ্য দাস-বিক্রয়ের অবাধ প্রচলন। সমসাময়িক অসংখ্য দলিলে জানা যায়, দরিদ্র জনসাধারণ নামমাত্র মূল্যে স্ত্রী, পুত্র ও পরিবার, এমনকি আত্ম-বিক্রয় পর্য্যন্ত করিতেছে। পর্ত্তুগীজ ও মগদস্যুদের এই দাস ক্রয়-বিক্রয় প্রায় একচেটিয়া ছিল। মুর্শিদকুলি খাঁর সময় হইতেই বাংলাদেশের এই আর্থিক দুর্গতির সূচনা, এবং আলিবর্দ্দীর সময় তাহার চরম পরিণতি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকেরা এই দুঃখ-দুর্গতি আরও শত গুণে বাড়াইয়া দিয়াছিল।

স্ফীত স্থানের উপর বিস্ফোটকের মত ইহার উপর ছিল আবার দস্যু-তস্করদের অত্যাচার ও লুণ্ঠন। কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যলব্ধ অর্থের অধিকারিগণ, বিশেষভাবে শিল্পী, তাঁতী ও বণিকসম্প্রদায়ের লোকেরা সর্ব্বদাই দস্যুভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিত। হাট-বাজার লুঠ, সওদাগরীনৌকা লুঠ, সমৃদ্ধ গৃহস্থ ও বণিক হত্যা, প্রায় নিত্য ঘটনা ছিল। শান্তি ও শৃঙ্খলা বলিয়া কিছু ছিল না বলিলেই চলে। দস্যু-তস্করের ভয়ে বহু শিল্পী, কৃষক ও বণিক জমি ও হাট-বাজার ছাড়িয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া নিরাপদ স্থানে পলাইয়া যাইত। অনেক তাঁতী

এই ভয়ে ব্যবসাই ছাড়িয়া দিয়াছিল, অনেক জমি অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। এই সমস্ত কিছুর মূলে ছিল, রাষ্ট্রের শৈথিল্য ও দুর্ব্বলতা এবং রাজ্যশাসনের বিশৃঙ্খলা, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, মধ্যযুগের নবাবী জীবন-সন্ধ্যার ঘন অন্ধকারের সমস্তই লক্ষণই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, বাংলা দেশের আর্থিক দুর্গতির এবং সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার সূচনা এই সময়েই দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

নবাব আলিবর্দ্দী এই আর্থিক ও সামাজিক দুর্গতির এবং রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার দুর্ব্বার স্রোত ঠেকাইতে চেষ্টা করেন নাই, এমন নয়; এবং সে চেষ্টা প্রধানতঃ হিন্দু-সামন্ত-ভূস্বামী-সম্প্রদায় এবং শ্রেষ্ঠী ও বণিক-সম্প্রদায়ের সাহায্য লইয়াই করিয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌল্লা এ বিষয়ে আলিবর্দ্দীর নীতি অনুসরণ করেন নাই, এবং না করিয়া যে ভুল করিয়াছিলেন, তাহার উপযুক্ত মূল্যও তাঁহাকে দিতে হইয়াছিল। সে যাহাই হউক, আলিবর্দ্দী হিন্দু-সামন্ত-ভূস্বামী-সম্প্রদায় এবং শ্রেষ্ঠী-বণিক-সম্প্রদায়কে যতই হাতে রাখিতে চেষ্টা করুন না কেন, অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভ হইতেই, কিংবা তাহার কিছু আগে হইতেই, কিছুটা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তির ক্রমবর্দ্ধমান দুর্ব্বলতা ও বিশৃঙ্খলার সুযোগে, কিছুটা বিদেশী বণিকদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিষ্ঠার সুযোগে হিন্দু-ভূস্বামী ও বণিকসম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ধূমায়িত হইতেছিল। এই অসন্তোষ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে সুস্পষ্ট, তাঁহার পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্রের চিত্তেও এই বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। যতদিন আলিবর্দ্দী বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন কিছু করা সম্ভব হয় নাই, কিন্তু আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহা ক্রমশঃ প্রকট হইতে আরম্ভ করিল, এবং পলাশীর যুদ্ধে তাহা প্রকাশ্য-রূপ ধারণ করিল।

ইতিমধ্যে ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে বিবর্ত্তিত হইবার স্বপ্ন রচনা করিতেছিল। তাহার সুযোগে বিদ্বিষ্ট হিন্দু সামন্ত ও ভূস্বামী-সম্প্রদায় মুসলমান রাজশক্তির হাত হইতে নিষ্কৃতির উপায় অনুসন্ধানে রত হইলেন। এই অবস্থার সুযোগ লইতে ইংরেজ বণিকের কূটবুদ্ধি বিলম্ব করিল না। মুসলমান রাজশক্তির ক্রমবর্দ্ধমান দুর্ব্বলতা এবং রাজ্যশাসনের বিশৃঙ্খলতার সুযোগ লইয়া ইংরেজ বণিক নিপীড়িত হিন্দু সামন্ত ও বণিক-সম্প্রদায়ের মনে মুসলমান রাজশক্তির প্রতি বিদ্বেষ জাগাইবার প্রয়াস আরম্ভ করিল। পলাশীর যুদ্ধের কয়েক বৎসর আগে কোম্পানীর চীফ ইঞ্জিনিয়র কর্ণেল স্কট তাঁহার বন্ধু মিষ্টার নোবলকে এক পত্রে

লিখিতেছেন, (১৭৫৪)—'The Jentu (Hindu) rajahs and the inhabitants were disaffected to the Moor (Mohommadan) Government and secretly wished for a change and opportunity of throwing off their yoke.'[১] ইহারই ফলে শতাব্দী-গঠিত হিন্দুমুসলমান মৈত্রী-বন্ধনেও শিথিলতা দেখা দিতে আরম্ভ করিল। দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রয়োজনে, শত নিত্যকর্ম্মের ভিতর দিয়া, বাংলার যে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায়, কর্ত্তব্যজ্ঞান ও দায়িত্ববোধে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইতেছিল, সেই হিন্দু-মুসলমান ক্রমশঃ পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট ও ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইতে আরম্ভ করিল। বলা বাহুল্য, ইহার মূলে ছিল অর্থ নৈতিক কারণ, ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত লাভের লোভ। এই লোভ প্রথমেই প্রকট হইল নগরের দরবারী মহলের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে। হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায় বহুদিনের সঞ্চিত ক্ষোভ ও অপমানের প্রতিশোধ খুঁজিতে গিয়া ইংরেজ বণিকের এই চাতুর্য্যের মধ্যে ধরা পড়িল। 'The supporters and partisans of the English were almost all Hindus. Thus, the support of the powerful Hindu aristocrats and Zeminders greatly advanced the supremacy of the English East India Company in Bengal.[২]

কেবল হিন্দু-মুসলমান এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ের বিরোধই যে এসময়ে বাংলার জাতীয় দুর্ব্বলতার একমাত্র কারণ, তাহা নয়, আর্থিক শ্রেণীগত বিভেদ আমাদের সমাজে বরাবরই ছিল, মুসলমান আমলে নাগর সমাজে তাহা আরও তীক্ষ্ণ হইয়া দেখা দেয়, অষ্টাদশ শতকে এই শ্রেণীগত বিভেদের রূপ আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। তাহার প্রধান কারণ, উৎপাদিত অর্থবণ্টনের ক্রমবর্দ্ধমান বৈষম্য এবং সাধারণজীবনে ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য। যে বিদেশীদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য-সম্পর্কে জড়িত থাকিয়া বাংলাদেশ এতদিন ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধি আহরণ করিতেছিল, সেই আহরিত ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধিতে ক্রমশঃ ভাটা পড়িতে আরম্ভ করে। বিদেশে ভারতীয় দ্রব্যের রপ্তানী ক্রমশঃ কমিয়া আসে এবং তাহার ফলে ভারতীয় বণিক ও শিল্পী সম্প্রদায়ের আর্থিক সমৃদ্ধি কমিতে আরম্ভ করে।

'The export of manufactured goods began to decline during the first half of the 18th century. The fifty years which

preceeded Plassey, were marked by a growing movement in all European countries against Indian imports.' [৩]

'Commerce came to be impeded by various factors, industries began to deteriorate, manufactures to be debased and agriculture having been disturbed, prices of food-stuff and other necessary articles of commerce ran high. To put it in a nut-shell, the pre-Plassey period of Bengal History left a legacy of economic decline for the succeeding years.' [8]

এই আর্থিক দুর্গতি ও শ্রেণীগত বিভেদ সাধারণ মানুষের মনে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা সকরুণ ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, রামপ্রসাদ। বস্তুতঃ, রামপ্রসাদের অসংখ্য গানেই বৃহত্তর সমাজের এই নিদারুণ দুঃখ যেন ভাষা পাইয়াছে। এখানে একটি মাত্র গান উদ্ধার করিতেছি ;—

'করুণাময়ি কে বলে তোরে দয়াময়ী।
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা, (গো তারা) আমার এম্নি দশা,
শাকে অন্ন মেলে কৈ ॥
কারে দিলে ধন জন মা হস্তী অশ্ব রথ চয়।
ওগো, তারা কি তোর বাপের ঠাকুর, আমি কি তোর কেহ নই ॥
কেহ থাকে অট্টালিকায়, মনে করি তেম্নি হই।
মাগো, আমি কি তোর পাকা খেতে দিয়াছিলাম মই ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, আমার কপাল বুঝি অম্নি অই।
ওমা, আমার দশা দেখে বুঝি, শ্যামা হলে পাষাণময়ী ॥'

(কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহ—১৯৩ নং)

বস্তুতঃ, আশাহীন, আশ্বাসহীন, আনন্দহীন জীবনের প্রাণপাত সংগ্রাম, লুণ্ঠিত সর্ব্বস্বান্ত জীবনের নৈরাশ্য ও হাহাকার এবং অবিরাম অত্যাচার ও নিপীড়নের করাল ছায়া যেন রামপ্রসাদের সমস্ত গানের উপর বিস্তৃত। এই ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়াই তিনি শক্তিসাধনা করিয়াছিলেন—কালী করালীর আরাধনা করিয়াছিলেন—ভবিষ্যতের সুদিন রচনা করিবার জন্য, জাতির প্রাণে আশা-বিশ্বাস ও নির্ভীকতা জাগাইবার জন্য।

এই রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডল এবং আর্থিক বিপর্যায়ের সঙ্গে সমসাময়িক সমাজ ও সংস্কৃতির সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। মুর্শিদাবাদের শাসনযন্ত্রের বিশৃঙ্খলা ও নিপীড়ন অপেক্ষা ভূস্বামী-সামন্ত-প্রভুদের শোষণ ও নিপীড়ন কিছু কম ছিল, এমন নয়। তাঁহাদের নিজেদের মধ্যেও নানা স্বার্থের বিরোধ, নানা ব্যক্তিগত আক্রোশ ও শক্রতা ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া বিচিত্র চক্রান্ত লাগিয়াই ছিল। একজন আর একজনের স্বার্থে আঘাত করিতে, অপরের শক্রতা সাধন করিয়া নিজের স্বার্থ সাধন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিতেন না। আর প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া, ছলে, বলে, কলে, কৌশলে, অত্যাচারে, নিপীড়নে রাজস্ব ও অন্যান্য নানা প্রকারের কর আদায় করিয়া নিজেদের প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা, ইহা তো তাঁহাদের নিত্যকর্ম্মই ছিল। হিন্দুভূস্বামী-সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এবং ঢাকার রাজা রাজবল্লভ নেতৃস্থানীয়, ইঁহারাই সমাজের প্রতিনিধি। শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতিসাধনে উৎসাহ ইঁহারা দান করিতেন না, এমন নয়; কিন্তু সেই পৃষ্ঠপোষকতার মধ্যে জনসাধারণের সাংসারিক বা সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধনের, বৃহত্তর মানবতার বা উচ্চতর কোন আদর্শের প্রেরণা ছিল না। এই পৃষ্ঠপোষকতার মূলে ছিল, চিরাচরিত উপায়ে রাজসভা অলঙ্কৃত করিবার বাসনা; নিজেদের ঐশ্বর্য্যবিলাস এবং রাজকীয় আভিজাত্যের দর্পিত ঘোষণা তাহা ছাড়া, সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় চক্রান্তে ইঁহারা সকলেই এত জড়িত ছিলেন, নিজেদের স্বার্থ-অন্বেষণে এত ব্যাপৃত ছিলেন যে, দেশের এই চরম দুর্গতির দিনেও জনসাধারণের কথা ভাবিবার অবসর বা ইচ্ছা তাঁহাদের ছিল না। যে শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা তাঁহারা করিতেন, তাহা তাঁহাদেরই ধর্ম্ম, আদর্শ ও রুচির প্রতিফলন দেখিবার জন্য, এবং সেই রুচি একান্তভাবে ক্ষীয়মান সামন্ততন্ত্রের বিলাসব্যসন-লিপ্ত, আত্মরতিময়, ভোগ-প্রমত্ত স্থূল রুচি।

এই সামন্তভূস্বামীরা আফগান, রাজপুত ও উত্তরাঞ্চলের নানা লোকদের নিযুক্ত করিতেন, পাইক, বরকন্দাজ ইত্যাদিরূপে, এবং ইহাদের সাহায্যে শুধু যে প্রজাশোষণ করিতেন, তাহাই নয়; নানা দরবারী দুষ্কৃতিরও ইহারাই ছিল পরম সহায়ক। একদিকে ছিল ইহাদের দৌরাত্ম্য, অন্যদিকে বর্গীদস্যুদের দৌরাত্ম্য—এই দুই দৌরাত্ম্যের মাঝখানে পড়িয়া পশ্চিমবঙ্গের সহর, গ্রাম প্রায় নিরুদ্ধ-নিশ্বাস হইয়া দিন কাটাইত। বস্তুতঃ, নবাব ও সামন্ত ভূস্বামীদের

অত্যাচার, পাইক, বরকন্দাজ ও মারাঠা দস্যুদের অত্যাচারে পশ্চিমবঙ্গের বহু সমৃদ্ধ লোক দেশ ছাড়িয়া উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল। এই সময়েই কাটোয়া ও দক্ষিণ বর্দ্ধমান অঞ্চল প্রায় বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। এক সময়ে তো নবাব আলিবর্দ্দীও তাঁহার পরিবারবর্গ এবং অস্থাবর সম্পত্তি পর্য্যন্ত সমস্তই পদ্মার পরপারে গোদাগাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি নিজেও মুর্শিদাবাদ ছাড়িয়া যাইবার সময় প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, নগরবাসীরা সকলে ইচ্ছা করিলে পদ্মার পরপারে নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাইতে পারে। মারাঠী দস্যুদের অত্যাচারে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও একবার কৃষ্ণনগর ছাড়িয়া ইচ্ছামতী-তীরে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এবং বর্দ্ধমান-রাজ তিলকচন্দ্রের জননী বর্দ্ধমান ছাড়িয়া মূলাজোড়ে চলিয়া গিয়াছিলেন, অনেকে কলিকাতায় পলাইয়া আসিয়া ইংরেজ বণিকের আশ্রয়ে প্রাণ, ধন উভয়ই রক্ষা করিয়াছিলেন।

যাহাই হউক, বর্গীর হাঙ্গামার কথা ছাড়িয়া দিলেও দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বলিয়া কিছু ছিল না। সেই কারণেই বিত্তশালী সম্প্রদায়ের লোকেরা সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, কলিকাতা প্রভৃতি নগরগুলিতেই বাস করিতেন এবং যেহেতু এই নগরগুলিই ছিল নবাব ও সামন্ত-ভূস্বামীগণের শাসনকেন্দ্র, সেই হেতু রাজসরকারের চাকুরীর প্রয়োজনে এবং ব্যবসাবাণিজ্য-সংক্রান্ত প্রয়োজনে ভদ্র, সমৃদ্ধ লোকেরাও অনেকে নগরে বাস করিতেন। রাজস্বের অধিকাংশই এই নগরগুলিতে ব্যয়িত হইত। চারি পাঁচ শত বৎসরের মুসলমান শাসনের ফলে এবং সমৃদ্ধ অভিজাত বণিকসম্প্রদায় নবাবী অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী থাকার ফলে, হিন্দু সামন্ত এবং সমৃদ্ধ ভূস্বামী-সম্প্রদায়ের সভা ও বৈঠকগুলিও মুসলমানী সংস্কৃতি দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াছিল, এবং নবাবী বিলাস ও জৌলুসের আবর্ত্তে কিছুটা আবর্ত্তিত হইত। আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা নগরগুলিতে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় শ্রেষ্ঠ কবি ও শিল্পীরাও সেইখানেই বাস করিতেন, এবং নিজেদের যোগ্যতা অনুসারে ধনী ও অভিজাত নাগরিকদের, বিলাস-ব্যসনের উপাদান যোগাইতেন। যে সকল ভূস্বামী ও বণিক ব্যবসায়ী হয় একদিকে নবাবের সমর্থন, পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়া অথবা অন্যদিকে ইংরেজ বণিকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া ধনী হইলেন, তাঁহারাই সমাজে প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিলেন এবং অনায়াসলব্ধ অপর্য্যাপ্ত বিত্ত লাভ করিয়া অস্তায়মান দরবারী সংস্কৃতি ও সভ্যতার চাকচিক্য ও বিলাস-ব্যসনের অন্ধ-অনুকরণে মত্ত হইলেন।

তাহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের নাগর সমাজের উচ্চস্তরে সর্ব্বত্র বাহ্যাড়ম্বরের প্রাণহীনতা, চারিত্রিক দুর্ব্বলতা এবং নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিল।

রাজা-রাজড়ার রাজদরবারের অনতিদূরেই বড় বড় বাজার বসিত এবং সেই বাজারের ছিল একটি বিশিষ্ট রূপ ও প্রকৃতি। এই সব বাজারের পণ্যদ্রব্য কেবল মাত্র রাজসভাসদ এবং অভিজাতবর্গেরই ভোগ্য ছিল। রাজদরবারের আবশ্যক-অনাবশ্যক বহু বেতনভোগী কর্ম্মচারী ও সভাসদ থাকিতেন, যাঁহারা রাজস্তুতি ও তোষণের দ্বারাই জীবন ধারণ করিতেন। এই সব সভা-দরবারের অপরিহার্য্য একটি অঙ্গ ছিল, ভাঁড় বা বিদূষক। সমসাময়িক রুচি অনুযায়ী এই কালের ভাঁড়ের রুচিও অত্যন্ত স্থূল। ইহাদের একমাত্র কাজ ছিল, অবসরমত রাজা-জমিদারদের কামনা-বিলাসের অগ্নিতে ইন্ধন সঞ্চার করা। অপর্য্যাপ্ত উচ্ছৃঙ্খল ভোগের ও বিলাস-ব্যসনের অনিবার্য্য পরিণাম, নৈতিক চরিত্রের দুর্ব্বলতা, যৌনউচ্ছৃঙ্খলতা। সমসাময়িক অভিজাত সম্প্রদায়ের সভা ও বৈঠকগুলি সেই অধোগতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে বাদ পড়ে নাই—তাহা বর্দ্ধমানেই হউক, মুর্শিদাবাদেই হউক, আর কৃষ্ণনগর নবদ্বীপেই হউক। এই বিলাস-ব্যসনের প্রমত্ত লীলা ও নৈতিক চরিত্রের উচ্ছৃঙ্খলতার নানা ইঙ্গিত সমসাময়িক সাহিত্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

'The vivid pages of the Seir Mutaqherin has already made familiar to us 'the depth of luxury, debauchery and moral depravity of the period, and Ghulum Hussin in one place offers a few better remarks on the ethicality of Murshidabad.'

'It must be observed,' he says, 'that in these days Murshidabad wore very much the appearance of one of Loth's town : and it is still pretty much the same to-day……Nay, the wealthy and powerful, having set apart sums of money for these sorts of amours, used to show the way and to entrap and seduce the unwary, the poor, and the feeble and as the proverb says,—so is the King, so becomes his people—these amours got into fashion.'[৫] দরবারী দুর্নীতি ও অনাচারের আতিশয্য ক্রমশঃ অভিজাত নাগর সমাজের সর্ব্বত্রই কিছুটা বিস্তৃতিলাভ করিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নয়।

এই সব দরবারী সভা ও বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকতায় ও তাহাদেরই অবসর বিনোদনের জন্য যে সাহিত্য ও শিল্পকলা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার রূপ ও প্রকৃতি ধরিতে পারা খুব কঠিন নয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজদরবার প্রতি-নিয়ত চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার নানারূপ বিলাসময় ব্যাখ্যান ও শিল্পময় পরিচর্য্যায় ছিল মুখরিত। রাজদরবারের একদিকে যেমন এই সকল নৃত্যগীতাদি শিল্পকলার লীলাময় প্রকাশ, ও পাণ্ডিত্য বৈদগ্ধ্যের সালঙ্কার ঝঙ্কার, আবার অন্যদিকে তেমনি নানারূপ ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও ছলাকলাময় হাস্যপরিহাস ও ভাঁড়ামিতে সুদক্ষ ভাঁড় জাতীয় পুরুষের কখনও স্থূল, কখনও অশ্লীল, কখনও প্রচ্ছন্ন, কখনও সুস্পষ্ট, নানাভঙ্গির হাস্য ও ব্যঙ্গরস রসিকতার পরিবেশনেও এই সকল দরবারী জীবন ছিল আচ্ছন্ন ও বিমোহিত।

'কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কুলীন প্রিয় বড়।
মুক্তিরাম মুখর্য্যা গোবিন্দভক্ত দড়॥'

(অঃ মঃ পৃঃ ১৭, সাঃ পঃ সং)

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় গোপাল ভাঁড়, হাস্যার্ণব ভাদুড়ী মহাশয় এবং কেনারাম মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি রসিকপ্রবরেরা সর্ব্বদাই নানারূপ রঙ্গরসময় আলাপ-আলোচনায় মহারাজ ও তাঁহার অন্তরঙ্গদিগের অনুরূপ রুচির পরিতৃপ্তি সাধন করিতেন।

দরবারী সভার এই মাত্রাহীন রস-রসিকতা, অসংযত ও নগ্ন ব্যঙ্গবিদ্রূপময় আলাপ-আলোচনা, একান্ত অলঙ্কারময় ও কায়ধর্ম্মী জীবনপরিবেশ ক্রমশঃ রাজদরবারের জীবনের প্রতিটি অঙ্গের মধ্যে অর্থাৎ ইহার ভাষা ও সাহিত্য, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, সর্ব্বত্রই বিস্তার লাভ করে, এবং কালক্রমে রাজদরবারের নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া মোটামুটিভাবে সমসাময়িক সাধারণ নাগর জীবনই এই দরবারী জীবনাদর্শে ঢলিয়া পড়ে। কারণ, সে যুগের নাগর সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প ও ধর্ম্ম, এই জাতীয় দরবারকে কেন্দ্র করিয়াই প্রতিষ্ঠিত; এবং এই দরবারী জীবনের ছলাকলাময় পাণ্ডিত্য, রূপরস ও কলাময় কথা ও কাহিনী, শিল্পচাতুর্য্যময় কাব্য ও সাহিত্য এবং তাল, লয় ও ছন্দময় নৃত্য-গীতাদির আড়ালে ছিল জীবনের যে বৃহৎ ফাঁক ও ফাঁকি, যথার্থ মানবতার যে অপচয়, তাহা এই দরবারী জীবনের সূত্র ধরিয়া ক্রমশঃ মুর্শিদাবাদ—বর্দ্ধমান—কৃষ্ণনগর—নদীয়া ও কলিকাতার প্রশস্ত নাগরজীবনের মধ্যে প্রসারিত হইতে

বিশেষ বিলম্ব হয় নাই। এই দরবারী ও নাগরজীবনের রুচি ও সভ্যতা, কাব্য, সাহিত্য ও ধর্ম্ম, সমস্তই একান্ত অলঙ্কারধর্ম্মী ও রূপ-বিলাসে আচ্ছন্ন; বাহ্য ঐশ্বর্য্য-আড়ম্বরের পিছনে, যেখানে ইহাদের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিহিত, তাহা জীবনের নানা ক্লেদ ও গ্লানি, শূন্যতা ও নগ্নতারই প্রতিচ্ছবি। এ জীবন ও সভ্যতা একান্তই ধন বা বিষয়-কেন্দ্রিক; ধনেই ইহার মান, ধনেই ইহার প্রাণ, ধনেই ইহার প্রসার ও প্রতিষ্ঠা।

'ধনে হতে ধর্ম্ম হয় ধনে হতে যশ।
বসু দিয়া ব্রহ্মাকে করিতে পারি বশ॥
… … …
ধন পেয়ে হরিহর ধর্ম্মপথ ছাড়ে।
মিথ্যা সাক্ষী দিব বলে রাজার নিয়ড়ে॥'

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল পৃঃ ২১৮
(হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, ১৩১২)
মাণিক গাঙ্গুলী

এই সমাজের সামাজিক মান, মর্য্যাদা, যশ, প্রতিষ্ঠা, সবই ধনলভ্য; বৈষয়িক বা আর্থিক জীবনের সমৃদ্ধি, অকুলীনের কৌলীন্য, হতমানের মান ও পুরুষের পৌরুষ, সকলই প্রদান করে।

'কুলহীন কেবল কুলীন হয় ধনে।
আপদ উদ্ধার হয় ধনের অর্জ্জনে॥'

(ধঃ মঃ পৃঃ ২১৮)

এই ধন বা বিষয়-সর্ব্বস্ব জীবনের অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য পরিণতি চরিত্র ও জীবনের হীনতা, দুর্ব্বলতা ও দৈন্য, যথার্থ মানবতার শ্রীহীন, সঙ্কুচিত রূপ। সমসাময়িক দরবারী ও নাগরিক জীবনের এই অত্যুগ্র বিষয়তারও এই অনিবার্য্য পরিণতির ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এ জীবনেরও শিল্পৈশ্বর্য্য ও নানা কলা ও লীলাবিলাসের আবরণতলে প্রচ্ছন্ন ছিল যে নিরাবরণ ও নিরাভরণ জীবন, তাহারও রূপ ও প্রকৃতি কিছু সুন্দর ও সুশ্রী নয়; তাহারও ধর্ম্ম কেবল প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানেই পর্য্যবসিত, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, অনুদার ও সঙ্কীর্ণ, মানবতার ঐশ্বর্য্য-বিহীন। এখানেও মানুষে মানুষে সম্প্রীতি ও ভালবাসা, আস্থা ও

বিশ্বাস নাই, জীবনের প্রতি, প্রাণমনের বিকাশ-প্রকাশের প্রতি আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা নাই।

'অন্নার্থী অতিথি পেয়ে যদি রাখে ঘরে।
ঘরদ্বার গুণাগার হবেক সবকারে॥
হেলা করে রাজার হুকুম যদি কাটে।
মাগু ছেলে বিকাবেক চৈতন্যের হাটে॥
... ...
রাজার এমন কেন অধর্ম্ম আচরণ।
বৈদেশীকে বাসা দিতে করে যে বারণ॥'

(ধঃ মঃ পৃঃ ১০৬)

এ জীবনের ধন, ঐশ্বর্য্য, বিষয়, সম্পদ, সকলই ব্যয়িত, লীলা-বিলাসময় জীবনের ঐকান্তিক বাহ্যভোগ বিলাসের অঙ্গে; যথার্থ দেবপূজা বা মানবসেবায় তাহার ব্যবহার ছিল না বলিলেই চলে।

'আমি বড় পাতকী প্রসন্ন নয় দশা।
করি নাই° কৃষ্ণসেবা কাল হৈল পাশা॥
না শুনেছি পুরাণ বিনষ্ট চিত্ত মোর।
প্রভু দেয় প্রতিফল পাপ হল ঘোর॥'

(ধঃ মঃ পৃঃ ১২৩)

অষ্টাদশ শতকের ধর্ম্ম-কর্ম্ম এবং সভ্যতা ও সাহিত্যময় দরবারী ও নাগরিক জীবনের এই পরিচয়ের আড়ালে এ জীবনের নিঃসাড়তা ও আত্মপ্রতারণার কথাও ভুলিয়া থাকিবার নয়। দিনের পর দিন এ জীবনের মূলে জমিয়া উঠিতেছিল যে অসার, আবর্জ্জনা, দুর্ব্বলতা ও দৈন্য, সে বিষয়ের এতটুকু চেতনাও কোথাও যেন সে জীবনে লক্ষ্য করা যায় না। সেই অন্তঃসার-শূন্য ধর্ম্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির আড়ালে আড়ালে যে দীন-হীন, কদর্য্য মানবরূপ ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, সে সম্বন্ধে যেন কোথাও বিন্দুমাত্র চেতনা নাই। যে চারিত্রিক দুর্ব্বলতা ও প্রাণের দীনতা কায়িক ঐশ্বর্য্য-বিলাসের তলে চাপা পড়িতেছিল, যে মেকী ও নকল জীবন খাঁটি ও আসলের নামে বিকাইতেছিল, তাহার সম্বন্ধে কাহারও যেন ভ্রূক্ষেপ নাই। জীবনের এই দৃষ্টি-হীনতা, জীবনের ধ্যান-কল্পনা ও ভাবাদর্শের এই আচ্ছন্নতা, কোন

আকস্মিক ঘটনা নয়; অনেকদিন ধরিয়া, ক্ষয়িষ্ণু নবাবী শাসনতন্ত্রের সমগ্র শেষ পর্য্যায় ধরিয়া, সেই নবাবী জীবনধারার জীর্ণ ও ম্লানোন্মুখ ঐশ্বর্য্য, বিলাস-ব্যসন এই বাংলার সামন্তনৃপতিগণের জীবনে একটু একটু করিয়া সঞ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু মোহ যে জীবনে একান্ত ঘোর, চেতনা যেখানে লুপ্তপ্রায়, দৃষ্টি সেখানে পরম আচ্ছন্ন, কালের প্রসারেও সে জীবনের পক্ষে মায়া ও অন্ধকার হইতে মুক্তি অনায়াসলভ্য নহে। অষ্টাদশ শতকের এই দরবারী ও নাগর জীবনও তাই অনেকদিন ধরিয়া অন্ধকারময় পরিবেশে ছিল আচ্ছন্ন ও মোহগ্রস্ত। নাগরিক ও দরবারী জীবনের পরিবেশে পুষ্ট ভারতচন্দ্র একান্তভাবেই এই জীবনের কবি বা বাঙ্‌ময় প্রতিনিধি।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা যে দরবারী ও নাগর জীবনের চিত্র তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিলাম, তাহাদের মধ্যে পুষ্ট কাব্য ও শিল্পের মধ্যে মানুষের সহজ প্রাণের স্পর্শ, তাহার দেহের লাবণ্যময় জ্যোতিঃ, তাহার চরিত্রের স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য ধরা পড়িবার কথা নয়। অলঙ্কারের বাহুল্যে দেহের সৌষ্ঠব ও লাবণ্য ঢাকা পড়িবে, ঐশ্বর্য্যের চাকচিক্যে প্রাণের দ্যুতি আড়াল হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য্য নয়। সমসাময়িক এই দরবারী, নাগর সাহিত্যের কথা বলিতে গিয়া আচার্য্য দীনেশচন্দ্র বলিতেছেন:—

'The style and the spirit both became depraved—the former by a vainglorious pedantry which made description grotesque by their overdrawn niceties, the serious often passing into the burlesque and the latter by scurrilous obscenities grosser than anything in Sterm, Smollett, of Wycherly and by the introduction of characters like those of Hiramalini and Bidu Brahmani—accessories to illicit love of the most revolting type.'[৬]

একটু অন্যদিক হইতে অন্যভাবে আচার্য্য সুশীলকুমার দে মহাশয় বলিতেছেন:—

'What had been fervid and spontaneous became fantastic and elaborate: and with these new poets, some of whom were good scholars, intellect and fancy predominated over sentiment

and passion, ingenuity took the place of feeling and poetry lost its true accent. On the one hand arose around the court of Krishna Chandra, the artificial school of Bharat Chandra, whose poetry, more fanciful than delicate, more exquisite than passionate, first turned the tide in favour of ornate and artificial standards of verse-making. On the other hand, under the patronage of the rival court of Raja Raja Ballabh, flourished a more serious, though less poetical, group of writers, who exhibit the same tendency to ornate diction and luxuriant style and the same weakness for frigid conceits.'

উপরোক্ত নাগর জীবনের সঙ্গে সমসাময়িক গ্রাম্য কৃষিনির্ভর জীবনের প্রকৃতি, আদর্শ ও জীবনযাত্রার প্রণালার সম্বন্ধ বিশেষ ছিল না বলিলেই চলে। নানা কারণে পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের গ্রাম্য জীবনের আর্থিক স্বচ্ছলতায় ভাটা পড়িয়াছিল, একথা সত্য। ভূস্বামী সম্প্রদায়ের অত্যাচার ও উৎপীড়ন, মারাঠা বর্গীর অত্যাচার, জমিদার কর্তৃক রক্তশোষণ সমস্তই সেই গ্রাম্য জীবনেও বিপর্যয়ের সূচনা করিয়াছিল, তাহাতেও সন্দেহ নাই। তাহা সত্ত্বেও মোটামুটি কৃষিনির্ভর গ্রাম্যজীবনের যে ধারা শতাব্দার পর শতাব্দী ধরিয়া গ্রাম্য জীবনে চলিয়াছিল, তাহা মোটামুটি অক্ষুণ্ণ ছিল। নাগর জীবনের দ্বৈতরূপ এখানে অনুপস্থিত। সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং ধর্ম ও শিক্ষাগত জীবনে সমসাময়িক উচ্চ-স্তরের নাগরিক জীবনের মত বহিরঙ্গের অলঙ্কারসুষমা ও জ্যোতি-জৌলুসের আড়ালে জীবনের গভীরে পুঞ্জীভূত অসার, দুর্নীতি ও অনাচার, অসংযম ও অবিশ্বাস এই লোকায়ত প্রাকৃত জীবনের পরিচয় নহে। সহজ ও সরল বিশ্বাস ও ভক্তি তখনও এ জীবনের স্বাভাবিক রূপ। কিন্তু এ বিশ্বাসের পিছনে অভাব ছিল, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের, বলিষ্ঠ কোন জীবন-জিজ্ঞাসার বা জীবনানুভূতির। এই গ্রাম্য লোকায়তজীবন যুগযুগান্তবিধৃত বিধিব্যবস্থা ও রীতিনীতির কাছে আত্মবিক্রীত; দৈনন্দিন জীবনের আচার-ব্যবহারে ও চলনে-বলনে চিরাচরিত জীবন ও সমাজ-প্রথা নানাভাবেই এই কৃষিনির্ভর গ্রাম্য পুরুষের পৌরুষ ও ব্যক্তিত্বের শোচনীয় অবমাননা ও অমর্য্যাদাই ঘটাইত। কিন্তু গতানুগতিক জীবন-প্রবাহের প্রতিরোধ করিবার সাহস ও আত্মবিশ্বাস নাই; যে গভীর জীবন

ও আত্মানুভূতি প্রথাবদ্ধ সমাজ ও জীবনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, সেই জীবন ও আত্মানুভূতি এ জীবনে নাই, যা আছে, তা শুধু দুর্ব্বল বিশ্বাস, যাহা অবিশ্বাস ও আত্মপ্রতারণারই নামান্তর ; কোনরূপ প্রতিবাদের সাহস নাই, প্রশ্ন করিবার শিক্ষা বা মনোবল নাই, যুগান্তসঞ্চিত মূঢ়তা, অন্ধতা ও কুসংস্কারে এই গ্রাম্য জীবন-মন একান্ত আচ্ছন্ন, জীবনের যে কোন অবস্থাতেই প্রশ্নহীন সন্তোষপ্রকাশ ও নির্ব্বাক আত্মসমর্পণই এ জীবনের মূলরহস্য ও সহজসম্পদ।

এই লোকায়ত জীবন একান্তভাবেই ছিল সমাজ বা গোষ্ঠী-শাসিত। বর্ণানুসারে বৃত্তিভেদের কঠিন অনুশাসন, পারিবারিক জীবনে গোষ্ঠীগত শাসন এবং সমাজ-গোষ্ঠী বা গ্রাম্য পঞ্চায়েতের ব্যক্তিনিরপেক্ষ বিধিব্যবস্থা ও শাসনের তলে ব্যক্তি পুরুষ বা ব্যক্তি মানসের প্রকাশ ও পরিচয়ের তেমন অবসর ছিল না বলিলেই চলে। জীবনধারণে নানা বাধা-বিঘ্ন ও বিপরীত অবস্থার নিকট নিরঙ্কুশ ও নির্ব্বাক আত্মসমর্পণের মূলেই এই ব্যক্তি মানসের জড়তা ও অনন্মশীলন, আত্ম-শক্তির অপরিচয়, আর ইহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, এ জীবনের নানাবিধ লাঞ্ছনা —দৈবী, প্রাকৃতিক ও লৌকিক। শুধু অষ্টাদশ শতাব্দী বলিয়া নয়, সমগ্র মধ্যযুগীয় বাংলা মঙ্গল সাহিত্যই দৈবীশক্তির নিকট মানবশক্তির এই লাঞ্ছনা ও অবমাননারই সুস্পষ্ট ইতিহাস। দৈবনির্ভরতা ব্যতীত এই লোকায়ত কৃষিনির্ভর মানব সমাজ জীবনোপায়ের জন্য প্রায় সমগ্রভাবেই প্রকৃতি-নির্ভর বলিলে চলে।

'শুনিতে সুন্দর চাষ আয়াস বিস্তর।
সকল সম্পূর্ণ যার তার নাই ডর॥
চাষ বলে ওরে চাষী আগে তোকে খাব।
মোরে খাবি পশ্চাতে যদ্যপি ক্ষেতে হব॥
অনেক আয়াসে চাষে শস্য উপস্থিত।
শুকা হাজা পড়িলে পশ্চাতে বিপরীত॥'

(শিবায়ণ, পৃঃ ২০৪-৫, বিহারীলাল সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত-১২৯৩,
রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী)

কৃষিই এ জীবনের একমাত্র নির্ভর, অথচ এই একমাত্র জীবন অবলম্বনের পথ কতই না বিঘ্নসঙ্কুল ; উন্নত কর্ষণোপায়ের ও শস্যোৎপাদনের শোচনীয় অভাবে সময়ে সময়ে প্রকৃতির হস্তে এ জীবনের দুর্দ্দশা ও লাঞ্ছনাও সামান্য নয়। দৈবী ও প্রাকৃতিক অত্যাচার ও লাঞ্ছনার উপর এ জীবনের সর্ব্বশেষ ও চরম লাঞ্ছনা ছিল

মানুষের দেওয়া। এই গ্রাম্য দরিদ্র সমাজের প্রতি অপেক্ষাকৃত ধনী ও সমৃদ্ধ নাগর জীবন ও সমাজের সহানুভূতি ছিল না বলিলেই চলে, পক্ষান্তরে এ জীবনের উপরে সেই ধনী ও প্রতিপত্তিবান্ সমাজের অত্যাচার ও অবিচার ছিল নানাপ্রকারে।

'দুরাচার দুষ্টমতি অতি খলচিত্ত।
দোষ বিনে প্রজাগণে দুষখ্ দেয় নিত্য॥
জবুল জমির জমা বেশী করে ধরে।
যে না দেয় তার সদ্য গুণাগার করে॥
ক্ষেতে হলে খন্দ সে বেচে লয় সব।
বিব্রত হইল প্রজার পেয়ে আধিভাব॥
দেশ ছেড়ে দেশান্তরে পলাইয়া গেল।
শহর নগর গ্রাম শূন্যময় হ'ল॥'

(ধঃ মঃ, পৃঃ ১৩)

অন্যত্র,

'গরিবের ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা
বার করে সকল বেচিয়া লয় রাজা॥
ক্ষেতে দেখে খন্দ যদি খেতে নাহি পায়।
কুতকাতে কায়েত কিফাতি করে তায়॥'

(শিবায়ণ, পৃঃ ২০৪-৫)

একাধারে দৈবী, প্রাকৃতিক ও লৌকিক জীবনের লাঞ্ছনা ও শাসনে অষ্টাদশ-শতকের এই সহজ বিশ্বাস ও সরলভক্তিপরায়ণ গ্রাম্যজীবন ছিল একান্ত বিড়ম্বিত, মথিত ও বিপর্য্যস্ত। জীবনের চারিদিকেই বিড়ম্বনা, অবমাননা, ও অনিশ্চিত পরিস্থিতি। নির্ব্বিঘ্ন শস্য উৎপাদনে কখনও কখনও এ জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি থাকিলেও নানা বাধা, নানা বিপর্য্যয় ও অসহায় অনিশ্চিত অবস্থার ভিতরে থাকিয়া ইহার সমগ্র রূপ আদৌ আশা, আশ্বাস ও নির্ভরতার চিত্র নহে। রামপ্রসাদের শিক্ষা ও জীবনের সঙ্গে অষ্টাদশ শতকের এই নিম্নস্তরের লোকায়ত, গ্রাম্য ও দরিদ্রসমাজের পরিচয়ই ঘনিষ্ঠ; তাই তাঁহার গানে, ইহার ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কারে এই জীবনের স্পর্শই স্পষ্টতর ও অধিক প্রত্যক্ষ।

একদিকে নবাবী আমলের সন্ধ্যা আসন্ন, আর একদিকে কুশলী ইংরেজ বণিকের কৌশল বিস্তার। সমাজের যাহারা নেতা, সেই শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সামন্ত প্রভুরা ও জমিদারসম্প্রদায় বিলাসব্যসনে মত্ত, নানা চক্রান্তে লিপ্ত। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলের বুকের উপরে দস্যু-তস্করের উপদ্রব, বর্গীদের উৎপাত, পাইক-বরকন্দাজের দর্পিত পদক্ষেপ। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে পড়িয়া গ্রাম্য কৃষিনির্ভর জীবন প্রায় কণ্ঠাগত, ধন ও জীবন কিছুই আর নিরাপদ ছিল না। ইহার উপর যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উচ্ছৃঙ্খল কর্ম্মচারীরা বন্য পশুর মত বাংলার জনসাধারণের জীবনের উপর তাহাদের যথেচ্ছাচার চালাইতে সুরু করিল, তখন লাঞ্ছনা ও দুর্গতির আর সীমা রহিল না। কোম্পানীর এই বন্য অনুচরেরা নবাবী ও সামন্ত প্রভুদের শাসনের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও প্রায় অচল করিয়া তুলিল। জনসাধারণ একান্তভাবেই দেশীয় ও বিদেশী দুর্ব্বৃত্তদের দয়ার উপরে বাঁচিয়াছিল; বিশেষ করিয়া বিদেশীদের উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচার মাঝে মাঝে যে নগ্ন ও উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিত, তাহার কাছে শিশু ও বৃদ্ধের জীবন এবং নারীর সতীত্বের কোন মূক্তি ছিল না। 'The reputation of the English was so bad in Bengal, that no sooner did a European come into one of the villages than all the shops were immediately locked up and all the people for their own safety ran away'.[৮] এই লাঞ্ছিত, নিপীড়িত ও দরিদ্র জীবনের ম্লান ছায়ার আকাশ রামপ্রসাদের সমস্ত পদাবলীর উপর বিস্তৃত।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদের বাংলাদেশের এই চিত্র চিত্তপটে ধারণ করিয়া ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের জীবন ও সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে।

প্রথম অধ্যায়ের পাদটীকা

১। 'History of Bengal' Vol. II, Page, 454
by
Sir Jadunath Sarkar

২। 'History of the Bengal Subah,' Pages, 104-6
by
K. K. Dutta

৩। Rise and Fulfilment of British Rule in India.

by

Thomson Edward John and Garratt

৪। Alivardi and his Times, Page, 262

by

K. K. Dutta

৫। Bengali Literature in the nineteenth Century

Page, 29

by

S. K. Dey

৬। History of Bengali Language and Literature,

Pages, 620-21

by

D. C. Sen

৭। Bengali Literature in the nineteenth Century,

Pages, 41-42

৮। „ „ „ Page, 13

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। ভারতচন্দ্রের জীবন-কথা

বর্ত্তমান হুগলী জেলার দামোদর নদের দক্ষিণতীরে ভুরস্থট গ্রাম ভুরিশিট প্রাচীন স্মৃতিবহ। খৃষ্টীয় একাদশ শতক হইতেই আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্য্যন্ত দক্ষিণ রাঢ়ের এই গ্রাম ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধ্যান ও ধারণার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। এক সময়ে এই গ্রাম বাংলার সমৃদ্ধতম শ্রেষ্ঠীদেরও আবাসস্থল ছিল, বহু শ্রেষ্ঠী এই গ্রামে বাস করিতেন বলিয়াই ইহার অন্যতম, প্রাচীন নাম ভুরিশ্রেষ্ঠী। শ্রীধর আচার্য্যের ন্যায়-কন্দলী গ্রন্থে আছে :

আসীদ্দক্ষিণরাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্ম্মাণাম।
ভূরিসৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্টিজনাশ্রয়ঃ॥

কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকেও ভূরিশ্রেষ্টিক্ গ্রাম গৌড়রাষ্ট্রের অন্তর্গত বলিয়া উল্লিখিত।

মধ্যযুগে ভুরস্থট পরগণায় তিনটি প্রধান গড়। ভবানীপুরের গড়ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও স্থানীয় রাজবংশের খাস দখলে। এই রাজ্যের দ্বিতীয় গড় পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো গ্রাম রাজবংশের এক কনিষ্ঠ শাখার অধিকারে ছিল এবং এই শাখাতেই ভারতচন্দ্রের জন্ম।

পঞ্চদশ শতকের শেষপাদে গড় ভবানীপুরে চতুরানন নিয়োগী নামে জনৈক ভূম্যধিকারী প্রবলতর হইয়া স্থানীয় বাগ্দী সামন্ত প্রভুদের পরাজিত করেন, এবং ক্রমশ এক বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিপতি হইয়া উঠেন। এই চতুরানন নিয়োগীর দৌহিত্র ফুলিয়ার মুখটি বংশীয় 'কৃষ্ণরায়' ভুরিশ্রেষ্ঠী রাজ্যের প্রথম ব্রাহ্মণ রাজা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রক্ষিত এক কুলগ্রন্থে দেখিতেছি, মুরারি সুত অর্থাৎ কৃত্তিবাসের জ্যেষ্ঠতাত মদন হইতেই এই বিখ্যাত রায়বংশের উৎপত্তি। এই সকল কুলপঞ্জীর সাক্ষ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা কঠিন। তবু, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এই কুলপঞ্জীকার বিবরণটি একেবারে অনুল্লিখিত থাকাও বাঞ্ছনীয় নয়।[১]

"মুরারি সুত, মদন ভট্টাচার্য্যস্য অকৃতী। তৎ সুতৌ রাঘব-কাকুৎস্থৌ। কাকুৎস্থস্য কুকর্ম্মণা কুলাভাবঃ তৎসুতাঃ শ্রীধর-শ্রীহরি-কৌতুককাঃ। শ্রীহরি রায়স্য সুতৌ সদানন্দ-বৈদ্যনাথৌ, সদানন্দসুত কৃষ্ণরায় রাজা খ্যাতি। (৩১৫ খ পত্র)

এই বিবরণে জানা যায় যে, এই বংশে শ্রীহরিই প্রথম 'রায়' উপাধি লাভ করেন। শ্রীহরির দ্বিতীয় পুত্র বৈদ্যনাথ পশপুরের রায় বংশের আদি পুরুষ এবং ইহারা এই রায় বংশের দূরতম জ্ঞাতি। মদনই প্রথমতঃ কুলক্রিয়ায় 'অকৃতী' এবং তাঁহার পুত্র কাকুৎস্থ হইতেই এই বংশে কুলাভাব জন্মে। মদনের বৃদ্ধ প্রপৌত্র কৃষ্ণ রায় এই রাজ-বংশের প্রথম রাজা। অকুলীন রা য় বংশে মোটামুটি ২৫ বৎসরে এক পুরুষ ধরিলে আনুমানিক ১৪৯০ খ্রীঃ তাঁহার জন্ম এবং এই ব্রাহ্মণ রাজ্যের প্রতিষ্ঠার কাল আনুমানিক ১৫২৫ খ্রীঃ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

ঢাকার এই পুঁথি অনুসারে লছির নারায়ণ (লক্ষ্মীনারায়ণ) এই বংশের শেষ রাজা এবং তাঁহার সময় আনুমানিক ১৭২০ খ্রীঃ। বর্দ্ধমান-রাজ কীর্ত্তিচাঁদ ভুরসুট রাজ্য আক্রমণ করিয়া ভবানীপুর গড় অধিকার করেন। মনে হয়, রায় পরিবার রাজ্যভ্রষ্ট হইবার পর বসন্তপুর গ্রামে আসিয়া অধিষ্ঠিত হন। হুগলী ও হাওড়া জেলার ইতিহাস-লেখক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'রায় বাঘিনী' গ্রন্থে ইহার জনশ্রুতিমূলক বৃত্তান্ত মিলিতেছে।

কিন্তু উল্লিখিত বংশ-বিবরণ কতদূর নির্ভরযোগ্য, স্বাধীন অন্যতর প্রমাণাভাবে তাহা বলা কঠিন। সেই হেতু ভারতচন্দ্রের কুলপরিচয় সংগ্রহ করিতে হইলে, কবির রচনাবলীর বিভিন্ন অংশে এই প্রসঙ্গে তাঁহার নিজের বক্তব্যের উপর নির্ভর করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

সত্যপীরের কথার মুখচন্দ্রিকায় ভারতচন্দ্র আত্ম-পরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন :—

ভরদ্বাজ অবতংশ ভূপতি রায়ের বংশ
সদাভাবে হতকংস ভুরসুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতীযুত,
কুলের মুখটি খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি॥

ভাঃ চঃ গ্রন্থাবলী পৃঃ ৪৪৫
(বঃ সাঃ পঃ)

অবশ্য কবির সত্যপীরের এ পাঁচালী অংশের যে পাণ্ডুলিপি সম্প্রতি সংগৃহীত হইয়াছে, (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) তাহাতে ভারতচন্দ্রের পিতৃপরিচয় নাই। পুঁথির মধ্যে কবির কুলপরিচয় ও আপন বাসস্থানের পরিচয় আছে মাত্র।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের উত্তরখণ্ড মানসিংহ অংশকে কিছুটা ইতিহাস-মূলক বলিলে খুব অন্যায় হয় না। সমসাময়িক ইতিহাসের কিছু কিছু পরিচয় এই অংশে পাওয় যায়। তাহা ছাড়া নদ-নদী, জেলা, পরগণা, গ্রাম, নগর ইত্যাদির ও কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক বিবরণ ইহাতে আছে। এই মানসিংহ অংশে আত্মপরিচয়-সূত্র ভারতচন্দ্র বলিতেছেন,—

"ফুলের মুখটি নৃসিংহের অংশ তায়।"

ভাঃ চঃ গ্রন্থাবলী পৃঃ ৩৯৬

কবির রসমঞ্জরীগ্রন্থে আত্মপরিচয়-সূত্রে লিখিত আছে,—

'ভূরিশিষ্ট রাজ্যবাসী নানাকাব্য অভিলাষী, যে বংশে প্রতাপনারায়ণ।'

ভাঃ চঃ গ্রন্থাবলী পৃঃ ৩৯৯

সত্যপীরের কথা ভারতচন্দ্রের স্বরচিত কিনা পণ্ডিত মহলে তাহা লইয়া কিছু কিছু সন্দেহ আছে। একেবারে অকাট্য না হইলেও এ বিষয়ে সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা অন্যত্র আমি করিয়াছি।[২] আপাততঃ সদ্যোক্ত তিনটি গ্রন্থকেই ভারতচন্দ্রের রচনা বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। সদ্য উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে ভারতচন্দ্রের যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহা এইরূপ :—

ফুলিয়ার যে মুখটি বংশে ভারতচন্দ্রের জন্ম, সেই বংশের আদি পুরুষ হইতেছেন নৃসিংহ, সেই বংশের বংশধর ভরদ্বাজ গোত্রীয় ভূপতি রায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের অন্যতম এবং রাজা প্রতাপনারায়ণ তাঁহার কুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তিনি স্বয়ং নরেন্দ্র রায়ের পুত্র; হুগলীজেলার দেবানন্দপুর গ্রামে রামচন্দ্র মুন্সীর বাড়ীতে তাঁহার ফারসী শিক্ষা।

ভুরস্থট রায়বংশের যে সকল বংশ-লতার সন্ধান মিলিতেছে, তাহাদের সাক্ষ্য ভারতচন্দ্রের নিজের সাক্ষ্যের প্রতিকূল নয়।

হুগলী ও হাওড়া জেলার ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার গ্রন্থোক্ত বংশ-লতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, পাটনার প্রবীণ ব্যবহারাজীবী

ভুরসুট রায় বংশীয় শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রায়ের নিকট হইতে। অতুলকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের বংশ-লতায় আছে :—

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তৎপুত্র রাজা দর্পনারায়ণ, তৎপুত্র রাজা উদয়নারায়ণ, তৎপুত্র রাজা প্রতাপ নারায়ণ, তৎপুত্র রাজা নরনারায়ণ, তৎপুত্র শেষ রাজা লছির নারায়ণ—

'রায় বাঘিণী' গ্রন্থে মুদ্রিত বংশ-লতা, পৃঃ ৩

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তৎপুত্র রাজা দেবনারায়ণ, তৎপুত্র রাজা দর্পনারায়ণ, তৎপুত্র রাজা উদয়নারায়ণ, প্রভৃতি, তৎপুত্র রাজা সত্যনারায়ণ, তৎপুত্র রাজা রুদ্রনারায়ণ, (পত্নী রাণী ভবশঙ্করী—'রায় বাঘিনী,') তৎপুত্র রাজা প্রতাপনারায়ণ—

ঢাকার পুঁথি অনুসারে বংশলতা (৩৫খ পত্র)

রাজা কৃষ্ণ রায়, তৎসুতাঃ বসন্ত রায়—মহেন্দ্র—মুকুট রায়—দক্ষিণ রায়—রাম রায়—দুর্গাদাস রায়—নারায়ণ রায়াঃ। বসন্ত রায় সুত গোপাল রায়, তৎসুত রাজা-দর্পনারায়ণ, তৎসুত উদয়নারায়ণ প্রভৃতি, তৎসুতাঃ রাজা প্রতাপ নারায়ণ—রমা-বল্লভ—যাদব—রঘুনাথ সিংহ—অমর সিংহ রায়াঃ। প্রতাপনারায়ণসুত শিব-নারায়ণ—তৎসুত নরনারায়ণ। তৎসুতৌ লছির নারায়ণ—হিরা রামৌ। লছির নারায়ণ সুতৌ—রাম নারায়ণ—রূপ নারায়ণৌ সাং বসন্তপুর।

উল্লিখিত তিন সাক্ষ্যের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিশেষ কিছু দেখা যাইতেছে না। ঢাকার পুঁথিটি অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে লিখিত এবং উহাই ভারতচন্দ্রের কাল।

আজও বসন্তপুরে রাজা প্রতাপনারায়ণের বংশধরের বাস বিদ্যমান, এবং কৃষ্ণ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা বসন্তরায়ের নামানুসারেই ঐ গ্রামের নামকরণ।

১৬৬২ খ্রীঃ রচিত ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত অনাদিমঙ্গল গ্রন্থেও দেখিতেছি, প্রতাপ নারায়ণ এই ভুরসুটের প্রসিদ্ধ রাজা। আবার রাজা প্রতাপনারায়ণের সভাসদ্ পণ্ডিত ভরত মল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভা' নামক বৈদ্যকুল-পঞ্জিকাতেও রাজার নিম্নলিখিত রূপ পরিচয় সুস্পষ্ট :—

ইতি প্রজাধীশ্বর ধীর বীর প্রতাপনারায়ণ
সং সদস্যঃ শ্রীকৃষ্ণ থানস্থ জগৎপ্রসিদ্ধাং বংশাবলীং
শ্রী ভরতো জগাদ। [৩]

শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের নবরত্নসভার অন্যতম রত্ন 'পশপুরের স্মার্ত্ত কৃপারাম' ১২০৯ সালের ৩ চৈত্র একটি তায়দাদে রাজা প্রতাপনারায়ণ সম্বন্ধে বিবরণ দিয়াছেন :—

'সাবেক রাজা প্রতাপনারায়ণ রায় আপন ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত আমার পিতামহ ঘনশ্যাম চট্টোপাধ্যায় এর বিবাহ দিয়া কুলভঙ্গ করিয়া বাটী বানাইয়া দিয়া গ্রামে যে জমি দিয়াছেন, তাহা আজ পর্য্যন্ত ভোগ দখল করিয়া আসিতেছি।"

কাশীর সরস্বতীভবনে রক্ষিত একটি কুলগ্রন্থেও ইহার যথাযথ সমর্থন মিলিতেছে :—

"ঘনে শ্যামস্য ভুরস্থটনিবাসী রামবল্লভ রায়স্য কন্যাবিবাহাদ্‌ভঙ্গঃ" [৪]

হাওড়া জেলার 'কুলটীকরি' গ্রামে বন্দ্যবংশীয় এক ব্রাহ্মণ পরিবার একটি বৃহৎ দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন। ১২০৯ সনের (৫১৯৩৪ নং) তায়দাদে ইহার বিবরণে লিখিত আছে :—

'প্রতাপনারায়ণ রায় জমিদার মাতার স্থাপিত ৺রুদ্রেশ্বর সীব ঠাকুরের নির্ত্ত সেবার কারণ' নিমানন্দ চক্রবর্ত্তীকে ১০০/ বিঘা দেবত্তর দেন।

মনে হয়, রাজা ভূপতি রায়, প্রতাপনারায়ণের পূর্ব্বেই আবির্ভূত হন। কুল-গ্রন্থে তাঁহার একটি কুলক্রিয়ার উল্লেখ দেখা যায়। নপাড়ী বন্দ্যবংশীয় দুলাল-সম্বন্ধে আছে—'ভুরস্থটনিবাসী মূং ভূপতি রায়স্য (কন্যা) গ্রহণাদভঙ্গঃ বংশাভাবঃ।' [৪]

সত্যপীরের কথার পুষ্পিকায় গ্রন্থটির রচনাকাল দেওয়া আছে, 'সনে রুদ্র চৌগুণা'। গুপ্ত কবি ঈশ্বরচন্দ্র রুদ্র অর্থে একাদশ এবং 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' এই নীতি অনুসারে চৌগুণা অর্থে ৩৪ ধরিয়া ১১৩৪ সাল এই গ্রন্থের রচনাকাল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "কতিপয় প্রামাণ্য লোকের কথামত ঐ সময় কবির বয়স পঞ্চদশ বৎসর ধরিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের মতে ১১১৯ সন (১৭২১ খ্রীঃ) ভারতচন্দ্রের জন্ম।

গুপ্ত কবির এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত মনে হয় না। কারণ ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে যদি কবির জন্ম হয়, তাহা হইলে মৃত্যুকালে (১৭৬০ খ্রীঃ) তাঁহার বয়স হয় মাত্র ৩৯ বৎসর। অথচ, 'নাগাষ্টক' রচনাকালে কবির বয়স চল্লিশ এবং এ গ্রন্থ যে তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বের রচনা, এমন কোন প্রমাণ নাই। নাগাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকে কবি লিখিয়াছেন :—

'বয়শ্চত্বারিংশত্তব সদসি নীতং নৃপ ময়া'—ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ, দেবানন্দপুরে সত্যপীরের কথা রচনার পূর্ব্বে কবির জীবনে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে, মাত্র পনর বৎসরের মধ্যে তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

বর্দ্ধমানরাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের রাজত্বকালে (১৭০২-৪০ খ্রীঃ) তাঁহার পিতৃরাজ্য নাশ হয়। এই সময়ের মধ্যে অনেকদিন (১৪ বৎসর বয়সে) তিনি মাতুলালয়ে বাস করেন, এবং সংস্কৃত ও পারস্য ভাষা শিক্ষার জন্য বেশ কিছুকাল ব্যয় করেন। এই সকল শিক্ষার পর কবি সত্যপীরের কথা রচনা করেন। অতএব এই কথা রচনাকালে কবির বয়স পনরর পরিবর্ত্তে অন্ততঃ ২৫।২৬ হওয়া যেন স্বাভাবিক। কাজেই 'সনে রুদ্র চৌগুণা' কবির এই ইঙ্গিতে 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' নীতি বর্জ্জন করিয়া ঐ গ্রন্থের রচনাকাল ১১৩৪এর পরিবর্ত্তে ১১৪৪ (রুদ্র=১১, চৌগুণা—১১×৪=৪৪) ধরাই যুক্তিসম্মত বলিয়া মনে হয়। অবশ্য গুপ্ত কবি নিজেই পরে আবার নিজেকে সংশোধন করিয়া রুদ্র শব্দে একাদশ ও শুভঙ্করের গণনামত এগারোকে চারগুণ করিয়া ঐ তারিখ ৩৪এর পরিবর্ত্তে ৪৪ ধরিয়াছেন। এই ধারণা সত্য হইলে, মোটামুটি অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশকের শেষার্দ্ধে কবির জন্মকাল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।[৬]

জনশ্রুতি মতে ভারতচন্দ্র যখন নিতান্ত বালক, তখন পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্দ্ধমান অধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র রায় বাহাদুরের জননী শ্রীমতী মহারাণী বিষ্ণু কুমারীর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহার বিরাগভাজন হন। রাজপুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র তখন একান্ত শিশু। মহারাণীর নির্ম্মম আদেশে 'পেঁড়োর গড়' ও 'ভবানীপুরের গড়' অধিকৃত হয়, এবং মহারাণী স্বয়ং গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাবতীয় ধনরত্ন অধিকার করেন।

পিতার এই বিপদের দিনে উপায়ান্তর না দেখিয়া ভারতচন্দ্র মণ্ডলঘাট পরগণার অধীন গাজীপুরের নিকটবর্ত্তী 'নওয়াপাড়া' গ্রামে আপনার মাতুলালয়ে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং তাজপুর গ্রামে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ করিতে থাকেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে ভারতচন্দ্র এই দুই গ্রন্থে দক্ষতা অর্জ্জন করেন এবং এই সময়ে তাজপুরের নিকটবর্ত্তী 'সারদা' নামক গ্রামের কেশরকুনি আচার্য্যদের নরোত্তম আচার্য্যের কন্যা বিবাহ করেন।

কিন্তু ভারতচন্দ্রের অগ্রজ সহোদরগণ তাঁহার এই সংস্কৃতশিক্ষার প্রতি অনুরাগে অসন্তুষ্ট হন এবং নিরর্থক সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তিরস্কার করেন। ক্ষুব্ধ ও

বিচলিত হইয়া ভারতচন্দ্র যুগধর্ম্ম অনুসারে পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতে সঙ্কল্প করেন এবং বর্ত্তমান হুগলী জিলার বাঁশবেড়িয়ার পশ্চিমস্থ দেবানন্দপুর গ্রামবাসী রামচন্দ্র মুন্সী মহাশয়ের গৃহে আসিয়া পারস্য ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ এই ভাষায় কবির দক্ষতাও জন্মাইল বিলক্ষণ। একদিন নাকি ঐ মুন্সী মহাশয়ের বাড়ীতে সত্যনারায়ণের সিণি উপলক্ষে পুঁথিপাঠের জন্য গৃহকর্ত্তা কবিকে অনুরোধ জানান। কবি অন্যের রচিত পুঁথি বর্জ্জন করিয়া অতি গোপনে স্বল্পকালের মধ্যেই এক পুঁথি রচনা করেন এবং যথাসময়ে আপন ভণিতাযুক্ত এই পুঁথি পাঠ করিয়া গৃহস্থ ও অন্যান্য শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেন।

ভারতচন্দ্র ত্রিপদী ছন্দে •এই ব্রতকথা ছাড়া চৌপদীছন্দেও আর একখানি ব্রতকথা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া গুপ্ত কবি বলিয়া গিয়াছেন।

'গণেশাদি রূপ ধর
বন্দ প্রভু স্মরহর—
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষদাতা'
—ইত্যাদি [৭]

কবি পারস্য ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অগ্রজ সহোদরেরা তাঁহাকে পরম প্রীতি ও সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং কিছুদিন পর বর্দ্ধমান অধিপতির নিকট হইতে ইজারাস্বরূপ পুনর্লব্ধ পৈত্রিক সম্পত্তির যথাযথ তদারকের জন্য তাঁহাকে বর্দ্ধমান যাইতে অনুরোধ করিলেন। ভ্রাতাদের সস্নেহ অনুরোধে ভারতচন্দ্র ঐ সম্পত্তির মোক্তার-রূপে বর্দ্ধমানে যান। বর্দ্ধমানে তাঁহার কাজ ভালই চলিতেছিল; কিন্তু পূর্ব্ব সর্ত্তানুযায়ী সহোদরেরা তাঁহার নিকট যথাসময়ে রাজস্বের টাকা পাঠাইতে পারিলেন না। বর্দ্ধমানাধিপ তখন ঐ ইজারা সম্পত্তি খাস করিয়া লইলেন। প্রতিবাদ জানাইতে গিয়া এবং রাজস্ব সময়মত জমা না দিতে পারার অপরাধে ভারতচন্দ্র কারাগারে বন্দী হইলেন। কিন্তু কারাধ্যক্ষের সঙ্গে পরিচয়সূত্রে অল্পকাল পরই তিনি কারাগার হইতে মুক্ত হইলেন।

কারাগারমুক্ত ভারতচন্দ্র এক নাপিত ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া কটকে উপস্থিত হইলেন। কটক তখন মহারাষ্ট্রীয় অধিকারের রাজধানী এবং শিবভট্ট নামে জনৈক ব্রাহ্মণ কটকের সুবেদার। কুশলী ভারতচন্দ্র শিবভট্টসমীপে উপস্থিত হইয়া আপন দুর্দ্দশা নিবেদন করিলেন। কৃপাবশ শিবভট্ট ভারতচন্দ্রকে রাজানু-

গ্রহী হইয়া শ্রীক্ষেত্রে বসবাসের অনুমতি দিলেন। জগন্নাথতীর্থে ভারতচন্দ্রের দিন ভালই কাটিতেছিল। গেরুয়া বসন ধারণ করিয়া ভারতচন্দ্র বাহ্যতঃ বৈষ্ণব হইলেন এবং বৈষ্ণবের অবশ্য-পাঠ্য গ্রন্থপাঠ এবং ভজনকীর্ত্তনে যোগদানে তাঁহার কোন আপত্তি দেখা গেল না। প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নাপিত ভৃত্যটিও বৈষ্ণবের ভেক ধারণ করিল। প্রভুটি হইলেন 'মুনি গোঁসাই' আর দাসটি 'বাসুদেব'।

এমন সময়ে শ্রীক্ষেত্রের বৈষ্ণবেরা ভারতচন্দ্রকে অনুরোধ করিলেন, বৃন্দাবন যাত্রায় তাঁহাদের সঙ্গী হইবার জন্য। ভারতচন্দ্রের সম্মতি পাইতে বিলম্ব হইল না। যাত্রাপথে বৈষ্ণব গোষ্ঠীটি কৃষ্ণনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে গোপীনাথজীর মন্দিরে মনোহরসায়ী কীর্ত্তনে যোগদান ও প্রসাদভক্ষণ উভয়ই ভারতচন্দ্র সমানভাবে উপভোগ করিলেন।

ভারতচন্দ্র বৈষ্ণব-ভেক ধারণ করিয়া বাহ্যতঃ বৈষ্ণব হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার একান্ত বুদ্ধিবাদী মন এবং নির্ম্মোহদৃষ্টি তাঁহাকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ভাবদৃষ্টি এবং গভীর তত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বাল্যাবস্থা হইতেই নানা সাংসারিক বিপাকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। সমকালীন ধর্ম্ম ও সমাজব্যবস্থা-সম্বন্ধে কোন মোহ তাঁহার আর ছিল না। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাতেই তিনি জানিয়াছিলেন, উভয়েই অনাচারগ্রস্ত ও অন্তঃসারশূন্য। গভীর ভাবের প্রেরণায় বা আন্তরিক শ্রদ্ধায় তিনি বৈষ্ণবের গেরুয়াবসন গ্রহণ করেন নাই; বৈষ্ণবের ভেক ধারণ করিয়া সমসাময়িক বৈষ্ণবসমাজের অভিজ্ঞতা মাত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন; এবং সেই অভিজ্ঞতা তাঁহার চিত্তে কোন ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিতে পারে নাই, পারিবার কারণও ছিল না। এ কথার প্রমাণ তাঁহার রচনাতেই পাইতেছি।

'চল যাই নীলাচলে

... ...

খাইয়া প্রসাদ ভাত মাথায় মুছিব হাত

নাচিব গাইব কুতূহলে।'[৮]

উদ্ধৃত উক্তির মধ্যে যে বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন, তাহা কাহারও দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। তাহা ছাড়া খানাকুল কৃষ্ণনগরেই তাঁহার জীবন আবার যে নূতন বাঁকে মোড় ফিরিল তাহা সম্ভবই হইত না।

খানাকুল কৃষ্ণনগরে ভারতচন্দ্রের শ্যালিকাপতির বাড়ী। শ্যালিকাপতি সংবাদ পাইয়া ভারতচন্দ্র সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং বৈষ্ণবের ভেক ছাড়িয়া দাড়ি-গোঁফ কামাইয়া ভদ্র গৃহস্থ সাজিতে ভারতচন্দ্রের বিলম্ব হইল না। শ্যালিকাপতি তাঁহাকে ঘরে ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র সম্মত হইলেন না। অনুরোধের উত্তরে ভারতচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন, গুপ্ত কবি ঈশ্বরচন্দ্র তাহা এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"আমি আপনাদিগের বিশেষ অনুরোধক্রমে তীর্থভ্রমণ, যোগসাধন প্রভৃতি ধর্ম্মাচরণ পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু যে পর্য্যন্ত বিষয়কর্ম্মদ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত কোনক্রমেই গৃহে গমন করিব না।" [৯]

গুপ্ত কবির এই উক্তি ভারতচন্দ্রের উক্তি কিনা এ প্রশ্ন উত্থাপন করা অপ্রাসঙ্গিক নয়। তীর্থভ্রমণ, যোগসাধন প্রভৃতি ধর্ম্মাচরণে ভারতচন্দ্রের অনুরক্তি কতটা ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু তাঁহার সমগ্র রচনাবলীতে সমসাময়িক গতানুগতিক ধর্ম্মাচরণের প্রতি যে মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা কোথাও শ্রদ্ধার বা ভক্তির নয়। বরং কতকটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের। সমস্ত দৃষ্টিটাই যেন নির্ম্মোহ, বুদ্ধিবাদী বিশ্লেষকের দৃষ্টি। তবে এ তথ্য অনস্বীকার্য্য যে, সাংসারিক জীবনে ভারতচন্দ্র শৈশবাবস্থা হইতেই নানা বিপর্য্যয় ভোগ করিয়াছেন এবং এ পর্য্যন্ত সংসার ভরণপোষণ করিবার মতন অর্থোপার্জ্জনের কোন স্থায়ী উপায়ই আশ্রয় করিতে পারেন নাই। সেইজন্য গুপ্ত কবি উদ্ধৃত উক্তির শেষের অংশের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

যাহাই হউক, শ্যালিকাপতির অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগর হইতে সারদা গ্রামে শ্বশুরালয়ে আসিলেন এবং কিছুদিন সেখানে কাটিল। পিতা বা ভ্রাতাদের সঙ্গে যে কারণেই হউক, এ সময়ে কবির সম্বন্ধ কিছু ছিল না বলিলেই চলে। কাজেই জীবিকাসংগ্রহের জন্য আবার সচেষ্ট হওয়া ছাড়া ভারতচন্দ্রের অন্যগতি ছিল না। সেই চেষ্টায় ভারতচন্দ্র ফরাসডাঙ্গায় ফরাসী গভর্ণমেন্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর শরণাপন্ন হইলেন। শ্বশুরগৃহ ছাড়িয়া আসিবার সময় তিনি স্ত্রী ও শ্বশুর মহাশয়কে বলিয়া আসিলেন, তাঁহার স্ত্রী যেন কোন মতেই তাঁহার পিতা বা ভ্রাতাদের আশ্রয়ে না যান।

সংসার অভিজ্ঞ বুদ্ধিকুশল ভারতচন্দ্রের পক্ষে দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের চিত্ত জয় করা কঠিন হইল না। চৌধুরী মহাশয় ভারচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তায়

মুগ্ধ হইলেন এবং সে বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য যে রাজসভারই উপযুক্ত তাহাও বুঝিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভাই তখন বাংলার রাজসভার আদর্শ। ইন্দ্রনারায়ণ বুঝিলেন, রাজার সভাকবিত্বই ভারতচন্দ্রের যোগ্য কর্ম্ম। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন আর্থিক স্বার্থে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকট জড়িত; কাজেই চৌধুরী মহাশয়ের অনুরোধ এড়াইয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। মাসিক ৪০৲ চল্লিশ টাকা বেতনে ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি নিযুক্ত হইলেন। ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি নিযুক্ত হইয়া কৃষ্ণনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার বিলাস ও জৌলুসের পরিচয় অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে সুস্পষ্ট। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক রাজসভার দোষ এবং গুণ সমস্তই সেখানে অভিব্যক্ত এবং ভারতচন্দ্রের বর্ণনার ক্ষণে ক্ষণে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের মধ্য দিয়া তাহা ধরিতে পারাও কঠিন নয়। সে পরিচয় এ গ্রন্থে অন্যত্র পাওয়া যাইবে।

কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় তিন পারিষদ্—গোপাল ভাঁড়, হাস্যার্ণব ভাদুড়ী মহাশয় এবং কেনারাম মুখোপাধ্যায়।

কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কুলীন প্রিয় বড়।
মুক্তি রাম মুখয্যা গোবিন্দভক্ত দড়॥

—অন্নদামঙ্গল, পৃ. ১৭

এই সকল রসিকবর সর্ব্বদাই কেবল শ্লীল-অশ্লীল নানাবিধ রসিকতার পরিবেশনে মহারাজের মনস্তুষ্টি-সাধনে ছিলেন ব্যতিব্যস্ত। ইঁহাদের শ্রেষ্ঠ গোপাল ভাঁড় শিক্ষার ধার বড় না ধারিলেও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে দ্ব্যর্থক শব্দ প্রয়োগে ছিলেন অদ্ভুত কুশল। সেক্সপীয়রের নাম না শুনিলেও তাঁহার অমোঘ শ্লেষ প্রয়োগে ভাঁড় মহাশয়ের নৈপুণ্য ছিল সহজাত। আর গোপাল ভাঁড়ের এই সকল পাগলা ঝোরাই কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজের রাজসভার প্রাণশক্তি।

মহারাজের প্রিয় বৈবাহিক কেনারাম মুখুজ্যে মহাশয়ও ছিলেন গোপাল ভাঁড়ের সার্থক সঙ্গী। তাঁহার সম্পর্কিত গল্প ও কাহিনী বহুকাল ধরিয়াই নবদ্বীপ ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে লোকমুখে চলিয়া আসিতেছে।

রাজসভার তৃতীয় বিশিষ্ট পারিষদ্ ভাদুড়ী মহাশয়ও রসিকতায় সিদ্ধহস্ত। নামই যাঁহার হাস্যার্ণব তাঁহার রসিক চরিত্রের বিশেষ পরিচয় বাহুল্য বলিয়াই মনে হয়।

উল্লিখিত রসিকপ্রবরগণের তরল চপল ও চটুল হাস্য ও রসালাপে রাজসভার পরিবেশ সর্ব্বদাই ছিল মসগুল। বিচক্ষণ ও কুশলী ভারতচন্দ্র দুদিনে

মধ্যেই রাজা ও রাজসভার নাড়ীনক্ষত্র বুঝিয়া ফেলিলেন এবং ঐ রুচির অনুরূপ কাব্য রচনা করিয়া 'গুণাকর' উপাধি লাভ করিলেন।

কবি এইভাবে একে একে ছোট বড় নানাবিধ সুরস ও সুললিত রচনায় মহারাজের প্রীতি উৎপাদন ও আনন্দবর্দ্ধন করিতে থাকিলে একদিন মহারাজ সাগ্রহে কবির পারিবারিক জীবনের সন্ধান জানিতে চাহিলেন। ভারতচন্দ্র অকপটভাবেই উত্তর দিলেন যে, পিতা ও ভ্রাতাদিগের সহিত মনোমালিন্যের জন্য তাঁহার স্ত্রী পিত্রালয়েই অবস্থিতা এবং সুযোগ বুঝিয়া গঙ্গাতীরে বসবাসের জন্য মহারাজের নিকট আবেদন জানাইলেন। কবির পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ মহারাজ প্রস্তাব মাত্রই ১০০৲ একশত টাকা নগদ ও ৬০০৲ ছয়শত টাকা বার্ষিক কর ধার্য্য করিয়া সমগ্র মূলাজোড় গ্রামখানিই কবিকে ইজারা দিলেন।

ভারতচন্দ্র এই সময় হইতে কিছুকাল সপরিবারে মূলাজোড়ে বাস করেন। তাঁহার বৃদ্ধ পিতাও গঙ্গার সান্নিধ্যলাভের আশায় কিছুদিন পুত্রের সঙ্গে একত্রে কাটাইলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই পিতার মৃত্যু ঘটে।

কবি কখনও কৃষ্ণনগর, কখনও ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ী, আবার কখনও বা নিজের বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রাঢ় অঞ্চলে এই সময় দেখা দিল প্রবল বর্গীর হাঙ্গামা। আর এই হাঙ্গামার সঙ্গে কবির জীবনেও আসিয়া জুটিল নূতন এক বিপর্য্যয়। বর্দ্ধমানরাজ তিলকচন্দ্রের মাতা সপুত্রক বর্দ্ধমান ছাড়িয়া মূলাজোড়ের নিকটবর্ত্তী কাউগাছি নামক গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করিলেন। কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী মূলাজোড় গ্রামে ভারতচন্দ্রের বাস। ভারতচন্দ্র ব্রাহ্মণ, তাই পাছে আপনার গো-অশ্ব ও গজাদি ব্রাহ্মণ কবির উদ্যানাদির অনিষ্ট করে, এই আশঙ্কায় রাজমাতা নিজেই মূলাজোড় গ্রামখানি ইজারা লইবার জন্য মহারাজের নিকট আবেদন জানাইলেন। আবেদন এক কথায় মঞ্জুর হইল। মহারাণী রামদেব নাগ নামক জনৈক ব্যক্তির নামে গ্রামখানি পত্তনি লইলেন। মহারাজের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট কবি স্থানান্তরে আপনার বাসস্থানের ব্যবস্থার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। মহারাজও অগত্যা আনারপুরের নিকটবর্ত্তী 'গুস্তে' গ্রামে ১০৫/ বিঘা এবং তাঁহার অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মূলাজোড়ে ১৬/ বিঘা ব্রহ্মত্ররূপে কবিকে দান করেন। মূলাজোড় পরিত্যাগ করিয়া কবি 'গুস্তে' বাসের জন্য উদ্যোগী হইলে মূলাজোড়বাসী তাঁহাকে ঐ স্থানে

থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানায়। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনুরোধে কবি মূলাজোড়েই থাকিয়া যান।

ইহার পর আসিল কবির জীবনে আর এক নূতন পর্ব্ব—নাগের অত্যাচার। রামদেব নাগ মহাশয়ের অত্যাচারে কবি যখন বিব্রত ও অতিষ্ঠ, তখন রচনা করিলেন 'নাগাষ্টক'। যে লেখনীর কৌশলে ও মহিমায় ভারতচন্দ্রের সাংসারিক জীবনের গঠন ও যাত্রা, তাহারই অদ্ভুত শক্তিতে কবি নাগমুক্ত হইলেন। মহারাজ 'নাগাষ্টক' পড়িয়া পরম তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইলেন এবং এক কথায় নাগের অত্যাচার বন্ধ করিলেন।

ইহার পর দীর্ঘ কাল বহুমূত্র রোগে ভুগিয়া ১৬৮২শকে বাংলা ১১৬৭ সালে (১৭৬০ ইং) কবির মৃত্যু হয়। জনশ্রুতি, মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে কবি ভস্মক রোগগ্রস্ত হইয়া দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করেন।

২। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

সত্যপীরের পাঁচালী

গুপ্ত কবির বিবৃতি সত্য ও অভ্রান্ত ধরিলে সত্যপীরের গ্রন্থ দুইখানিই কবির জীবনের প্রথম রচনা। ত্রিপদী ও চৌপদী ছন্দে রচিত এই পাঁচালী দুইখানির মধ্যে ত্রিপদীখানিই মনে হয় কবির প্রথম রচনা। ইহার সংক্ষিপ্ত আকার ও নানা ত্রুটিতে এবং চৌপদীখানির ভনিতায় লিখিত বর্ষের উল্লেখে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়। প্রথমখানির রচনার সময় কবির আশ্রয়দাতা ছিলেন হীরারাম রায়, আর দ্বিতীয়খানির বেলায় ছিলেন রামচন্দ্র মুনসী।

চৌপদীখানির 'সনে রুদ্র চৌগুণা' ইত্যাদি ইঙ্গিতে এই গ্রন্থ রচনার তারিখ শেষ পর্য্যন্ত ১১৪৪ই স্থির করিতে হয়। কবিজীবনের বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্যে এই কালেরই সামঞ্জস্য বা সহজ সঙ্গতি দেখা যায়। গুপ্ত কবিও নানা আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তেই পৌছিয়াছেন। এই অধ্যায়ের পূর্ব্বাংশে আমি এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

রসমঞ্জরী

নদীয়ার রাজসভায় নিয়োগের পর ভারতচন্দ্রের প্রথম রচনা গুটিকতক সুন্দর কবিতা। এই সকল ছোট কবিতা রচনার পর ভারতচন্দ্র 'রসমঞ্জরী'

রচনা করেন। এই গ্রন্থখানি মৈথিল কবি ভানুদত্তের রসমঞ্জরী গ্রন্থের অনুবাদ। সংস্কৃত সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি অলঙ্কারশাস্ত্রের নায়ক-নায়িকাদের লক্ষণ, বিদূষক, বিট, চেট প্রভৃতির স্বরূপ এবং শৃঙ্গাররসের লক্ষণ ও ভেদ এ সমস্তই এ কাব্যে কবি অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, জয়দেবের রতিমঞ্জরী গ্রন্থের শঙ্খিনী, পদ্মিনী প্রভৃতি স্ত্রীভেদ এবং শশ, মৃগ প্রভৃতি পুরুষ লক্ষণও এ কাব্যে কবির সুন্দর রচনা।

গুপ্ত কবির সংগ্রহে পাওয়া যায়, রসমঞ্জরী অন্নদামঙ্গলের পরবর্ত্তী রচনা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি অন্নদামঙ্গলের পূর্ব্বেরই রচনা হইবে। কারণ ইহার রচনায় 'গুণাকর' উপাধির উল্লেখ নাই। কিন্তু ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দের একখানি দলিলে ভারতচন্দ্রের নামের সঙ্গে এই উপাধি উল্লিখিত হইয়াছে।[১২] সুতরাং এ গ্রন্থ ১৭৪৯ সালের পূর্ব্বেরই রচনা। অথচ অন্নদামঙ্গল রচনার সময় ১৬৭৪ শকাব্দ (১৭৫২-৫৩)।

অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর ও অন্যান্য পালাগান

ইহার পর মহারাজের নির্দ্দেশে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের আদর্শে কবির অন্নদামঙ্গল রচনা। কবির বর্ণনানুসারে জনৈক ব্রাহ্মণ লেখক কাব্য লিখিয়া যান এবং নীলমণি সমদ্দার নামক এক ব্যক্তি ঐ সকল 'পালাভুক্ত' গানের সুর, রাগ ও পাচালী শিখিয়া গান করেন [১৩]। পরে মহারাজের অনুরোধে কবি এই কাব্যের মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান এবং ভবানন্দ মজুমদারের পালা জুড়িয়া দেন।

'বেদ লয়ে ঋষি রসে, ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥'

কবির এই ইঙ্গিত অনুসারে ১৬৭৪ শকে, বাংলা ১১৫৯ সালে অন্নদামঙ্গল রচিত।

নাগাষ্টক

এই গ্রন্থখানি কবি মূলাজোড়ের পত্তনিদার রামদেব নাগের অত্যাচারের প্রতিবাদ কল্পে রচনা করেন। কবি ইহা পত্র মারফতে মহারাজের নিকট প্রেরণ করেন এবং ইহার অদ্ভুত রচনানৈপুণ্য ও চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া মহারাজ মূলাজোড় গ্রামে নাগের অত্যাচার বন্ধ করেন।

গ্রন্থের তৃতীয় শ্লোকে দেখি,

'পিতা বৃদ্ধঃ পুত্রঃ শিশু রহহ নারী বিরহিণী'

কবির বৃদ্ধ পিতা যখন জীবিত এবং তাঁহার মাত্র একটি পুত্রই জন্মিয়াছে, তখনই এই গ্রন্থ রচিত।

আবার এ গ্রন্থ রচনাকালে বাংলাদেশে বর্গীর হাঙ্গামার শেষপর্য্যায়। বর্দ্ধমানরাজ তিলকচন্দ্র বর্গীর ভয়ে (১৭৪৪-৭০) মূলাজোড়ের কাউগাছি গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের পর বর্গীর হাঙ্গামার অবসান। অতএব মনে হয়, ১৭৪৫-৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই এ কাব্য রচিত।

বিবিধ কবিতাবলী

মূলাজোড়ে পিতার মৃত্যুর পর কবি যখন শেষবারের মত কৃষ্ণনগরে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখনই কিছুদিনের জন্য ঐখানে থাকিয়া তিনি বসন্ত ও বর্ষাবর্ণনা এবং পাদপুরাণ প্রভৃতি কবিতা রচনা করেন।

গঙ্গাষ্টক

গুপ্ত কবির সংগ্রহের মধ্যে কবির এই রচনাটির স্থান নাই। মনে হয়, তিনি সে সময়ে ইহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, পরে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভারতচন্দ্রের প্রপৌত্রের নিকট হইতে পাইয়া ইহা রহস্যসন্দর্ভে (সংবৎ ১৯২০) (১ম পর্ব্ব, ৯ম খণ্ড পৃ. ১৩৯) মুদ্রিত করেন।

চণ্ডীনাটক

গুপ্ত কবির বিবরণ অনুসারে কবি মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসারে মহিষাসুরের যুদ্ধ বর্ণনাস্থলে চণ্ডীনাটক রচনা করেন। বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দী এই তিন ভাষার সংমিশ্রণে এই গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত। যতদূর জানা যায়, মাত্র ভূমিকা ও যুদ্ধের আড়ম্বর রচনা করিয়াই কবির মৃত্যু হয়।

৩। ভারতচন্দ্রের জীবনপ্রকৃতি

অষ্টাদশ শতকের মধ্যাহ্নে বাংলাদেশের বর্দ্ধমান, চন্দননগর, কৃষ্ণনগরে যে সামাজিক অবস্থা, সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত জীবনে শিক্ষাদীক্ষালাভের যে সুযোগ বর্ত্তমান, তাহার প্রেক্ষাপটে ভারতচন্দ্রের জীবন আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃই মনে হয়, পারিবারিক বিপর্য্যয়ের জন্য কিছু দুঃখ ভোগ ঘটিলেও সাধারণভাবে

ভারতচন্দ্র সম্ভ্রান্ত বিত্তশীল সমাজের কোন সুযোগ-সুবিধা হইতেই বঞ্চিত হন নাই। শৈশবে পিতৃকুলের বৈষয়িক বিপত্তি ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার ক্ষতিপূরণলাভ ঘটিয়াছিল মাতুলালয়ে। শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারেও তাঁহার বাল্য ও কিশোর জীবনে নানা আনুকূল্য ও অনায়াসলব্ধ সুযোগ-সুবিধার অভাব ঘটে নাই। সমসাময়িককালে সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয় হিন্দুরা বিশেষতঃ রাজসরকারের সঙ্গে যাঁহাদের যোগাযোগ ছিল, তাঁহারা সকলেই একই সঙ্গে সংস্কৃত ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিতেন। ভারতচন্দ্রও তাহাই করিয়াছিলেন। উভয় ভাষা ও সাহিত্যেরই প্রভাব তাঁহার রচনায় সুস্পষ্ট। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তিনিও বিশেষ কৃতিত্বই অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তাহার কারণও ছিল। দক্ষিণ রাঢ়ের ব্রাহ্মণ ও উচ্চবংশীয় হিন্দুসমাজ বহু শতাব্দী হইতেই সংস্কৃত-সাধনার পরম অনুরাগী এবং সেই অনুরাগ ভারতচন্দ্রকেও গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছিল। একথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, ভুরসুটের ঐতিহ্যে তিনি মানুষ হইয়াছিলেন।

জীবনে নানা বাধাবিপত্তি তাঁহার আসে নাই, একথা সত্য নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক কালপ্রভাবেই তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইবার সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন। দেবানন্দপুর, শ্রীক্ষেত্র, চন্দননগর ও কৃষ্ণনগরে তাঁহার জীবনের বিভিন্ন পর্য্যায়—সেই সুযোগেরই ইতিহাস।

বর্দ্ধমানের অথবা কৃষ্ণনগরের রাজবাটীই হউক অথবা চন্দননগরের ফরাসী সরকারের দপ্তরই হউক, সর্ব্বত্রই রাজসভার বা সরকারী দপ্তরীর রূপ ও প্রকৃতি প্রায় এক। সেখানে অথবা বিত্তশীল সম্প্রদায়ের দরবারে ও বৈঠকে যে আবহাওয়া সঞ্চরমাণ তাহা বহুলপরিমাণে ক্ষীয়মাণ লক্ষ্ণৌ-পাটনা-মুর্শিদাবাদের মুসলমানী আদব কায়দা ও পরিবেশের। সে আবহাওয়া ফরাসী-সংস্কৃতি দ্বারা স্পৃষ্ট। অথচ তাহারই মধ্যে বসিয়া রাজসভার পণ্ডিতেরা যাহা লইয়া তর্ক ও বিচার করেন, গ্রন্থাদি রচনা করেন, তাহা একান্তভাবে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুসংস্কৃতি এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য দ্বারা পরিপুষ্ট। ভারতচন্দ্রের জীবনে ও সাহিত্যে উভয় ধারাই বহমান।

দুঃখ ও জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের পরিচয় ঘটে নাই, তাহাও সত্য নয়। শৈশবে পিতৃগৃহে, কৈশোরে দেবানন্দপুরে, যৌবনে শ্রীক্ষেত্রে, নানা অভিজ্ঞতা তাঁহার জীবনে ঘটিয়াছিল। বাংলাদেশ ও বাঙালী সমাজের

বুকে বসিয়া বাঙ্গালীর প্রবহমাণ জীবনধারা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—সেই জীবনধারার একদিকে যেমন ছিল বর্দ্ধমান—কৃষ্ণনগরের রাজসভা এবং শ্রীক্ষেত্রের পরিবেশ, তেমনি আর একদিকে ছিল সাধারণ জীবনের দুঃখদারিদ্র্য-লাঞ্ছনা এবং ছলনা-চাতুরী। সমসাময়িক সংস্কৃত ও পারস্যশিক্ষার এবং জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া ভারতচন্দ্রের মন ও বুদ্ধি যে সুমার্জ্জিত তীক্ষ্ণতা ও গভীরতা লাভ করিয়াছিল, সেই সুতীক্ষ্ণ ও সুগভীর দৃষ্টিতে তিনি চলন্ত সমাজপ্রবাহকে দেখিয়াছিলেন। সমসাময়িক সমাজের ধর্ম্মাচরণের মধ্যে রাজসভার জীবন আচরণের মধ্যে, যে মিথ্যাচার, যে ছলনা ও চাতুরী, যে দুঃখ ও দৈন্য, যে আবর্ত্তিত আবিলতা—তাহার কিছুই তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। অথচ নিজের জীবনোপায়ের জন্য এই সব কিছুর মধ্যে ভারতচন্দ্রকেও লিপ্ত হইতে হইয়াছিল, অন্য দশ জনের মত তিনিও সেই প্রবহমাণ স্রোতেই অবগাহন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে স্রোত যে পঙ্কিল এবং আবর্জ্জনাময়, তাহা তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই, তাঁহার মন ও বুদ্ধি কখনও মোহগ্রস্ত হয় নাই। বৈষ্ণবসমাজ ও জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়াও বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি তিনি অনুরক্ত হইতে পারেন নাই। জগন্নাথ তীর্থ, দেবাদিদেব মহাদেব, নারদ ঋষি, রাজা এবং সমাজজীবন—তাঁহার কাছে সমভাবে তীক্ষ্ণ কৌতুক ও বিদ্রূপের পাত্র। ইহাদের লইয়া ভারতচন্দ্রের হাস্য—বিদ্রূপেরই নামান্তর।

আসল কথা, ভারতচন্দ্রের ধর্ম্ম—ভক্তি-শ্রদ্ধা-প্রেম নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীর ধর্ম্ম। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে চলন্ত জীবনের সমস্ত ফাঁক ও ফাঁকি তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। হাস্যময় বিদ্রূপের কশাঘাতে তিনি তাহাদের আঘাতও করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই ফাঁক ও ফাঁকির কারণ অনুসন্ধানে কোথাও তিনি প্রবৃত্ত হন নাই; সমসাময়িক মানুষ এবং মানুষের সমাজকে ভালবাসিয়া তাহাদের আলিঙ্গন করেন নাই। কোথাও তাহাদের জন্য তিনি আশা ও বিশ্বাসের পাথেয় দান করেন নাই। স্নেহময়ী মাতা মেনকা সাংসারিক দুঃখ-দুর্গতিতে তাঁহার জননী সুলভ নারীত্ব হারাইয়া যেখানে কলহপরায়ণা হইয়াছেন, ভারতচন্দ্র সেই কলহপরায়ণার মূর্ত্তি সবিদ্রূপে রচনা করিয়াছেন। কিন্তু যে নিদারুণ দুঃখ মেনকাকে কলহপরায়ণা করিয়াছে, সেই দুঃখের ক্ষতে প্রীতি ও মমতার প্রলেপ বুলাইবার কথা তাঁহার মনে হয় নাই। কিংবা সেই দুঃখের কারণ নিরাকরণেও তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। যাহা কিছু শ্রদ্ধেয়, যাহা কিছু প্রেম

ও ভক্তির উৎস, সমসাময়িক সমাজে তাহার অনেক কিছুরই বিকৃতি ঘটিয়াছিল, সন্দেহ নাই। ভারতচন্দ্র বুদ্ধিজীবীর নির্ম্মম দৃষ্টি লইয়া হাস্যপরিহাসময় বিদ্রূপে তাহাদের উপর কশাঘাত করিয়াছেন, এবং সে কশাঘাত করিতে হইয়াছে অত্যন্ত সুকৌশলে, যাঁহাদের অন্ন তিনি গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের মন ও মান বাঁচাইয়া।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের পাদটীকা

১। $\frac{M3/38}{7+8}$ পুঁথির সংখ্যা

২। পরিশিষ্ট, পৃ. ১৩২

৩। চন্দ্রপ্রভা, পৃ. ২৭

৪। ১০৯০ সং পুঁথি, ৩৭১ ক পত্র, লিপিকাল ১২১০ সন

৫। ব. সা. প. ১৮১৫ খ পুঁথি, ১৫৯ ক পত্র

৬। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে (ষষ্ঠ সং পৃ. ৫১৪) গুপ্ত কবির এই বিচারই গ্রহণ করিয়াছেন।

৭। 'কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত', ১৮৫৫, পৃ. ৭

৮। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (সা. পা.) পৃ. ৩৩৪-৩৫

৯। 'কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত', ১৮৫৫ (১২৬২), পৃ. ১৭-১৮।

১০। "রাজ্যা দ্ভ্রষ্ট ইহাগতস্য নৃপতেঃ পার্শ্বে বভূবাশ্রিতঃ।
মুলাজোড়পুরং দদৌ স নৃপতি বাসায় গঙ্গাতটে॥"

ভা. চ. গ্রন্থাবলী, পৃ. ৪৫৪

১১। 'কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত'।

১২। সা. প. প. ৫২, পৃ. ৬

১৩। ভূরিশিটে মহাকায় ভূপতি নরেন্দ্র রায়
তাঁর সুত ভারত ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপাজ্ঞায় অন্নদামঙ্গল গায়
নীলমণি প্রথম গায়ন॥

অ. ম. পৃ. ৩৪৭

তৃতীয় অধ্যায়

রামপ্রসাদের জীবন-কথা

১। প্রসাদের বংশপরিচয়

বিদ্যাসুন্দর কাব্যে রামপ্রসাদ নিজেই বলিতেছেন :—

ধনহেতু মহাকুল পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল গুণবন্ত শিষ্ট শান্ত গুণান্বিত,
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী ॥

এই কীর্ত্তিবাস কে এবং তাঁহার শুদ্ধমূলত্বই বা কি ?

যে বৈদ্যবংশে রামপ্রসাদ সেনের জন্ম কুলপঞ্জিকাকারদের মতে সেই বংশের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন রাজা শ্রীহর্ষ সেন। শ্রীহর্ষ ছিলেন চিকিৎসক, তাঁহার সার্থক চিকিৎসায় পরিতুষ্ট হইয়া নবাব ফকিরুদ্দীন সাহা তাঁহাকে সেনভূমপ্রদেশের জমিদারী এবং রাজা উপাধি দান করেন। [১] শ্রীহর্ষসেনের দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কমলসেন পিতার মৃত্যুর পর রাজা হন, এবং কনিষ্ঠ বিমল সেন পিতার জমিদারী পরিত্যাগ করিয়া রাঢ় দেশে চলিয়া আসেন। কিন্তু চন্দ্রপ্রভাপ্রণেতা ভরত-মল্লিক বলিতেছেন, বিমলই নাকি পিতার পর রাজা হইয়াছিলেন এবং বিমল সেনের পুত্র ছিলেন রাজা বিনায়ক সেন। [২]

বাংলাদেশে বিনায়ক সেনের বংশের প্রসিদ্ধি আছে। মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক, কবিরাজ হরিচরণ কণ্ঠাভরণ, সদাশিব কবিরাজ, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ, কবি রাজনারায়ণ, রাজকল্প রামচন্দ্র সেন প্রভৃতি সকলেই এই বংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। বিনায়ক সেনের অধস্তন পঞ্চমপুরুষ হইতেছেন কীর্ত্তিবাস সেন। [৩]

কীর্ত্তিবাস সেন ধলহণ্ডগ্রামে বাস করিতেন বলিয়া তাঁহার বংশধরেরা ধলহণ্ডীয় নামে পরিচিত।

কীর্ত্তিবাসের অধস্তন নবমপুরুষে রামেশ্বর সেনের জন্ম। [৪]

রামপ্রসাদ নিজেও বলিতেছেন, কীর্ত্তিবাসের পর রামেশ্বরের জন্মের মধ্যে অনেক মহাশয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। [৫]

রামেশ্বর সেনের জীবিতকালেই সেন বংশের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিল। 'দুর্দৈব দৈন্যবশতঃ রামেশ্বরের পিতা জয়কৃষ্ণ নিজের কন্যাদের নীচ কুলে সম্প্রদান করিতে বাধ্য হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহ হয় কুমারহট্টনিবাসী জগদীশ দাসের সঙ্গে। জয়কৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া রামরাম পর্য্যন্ত এই তিন পুরুষের মধ্যে বংশের দুর্দ্দৈব দৈন্য বোধ হয় বাড়িয়াই গিয়াছিল এবং জয়কৃষ্ণ বা রামেশ্বর বা রামরাম কাহাকেও কোন সময় বোধহয় ধলহণ্ড গ্রামের পাট উঠাইয়া কুমারহট্টে আসিয়া কুটুম্বচ্ছায়ায় আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। কারণ রামপ্রসাদ যে কুমারহট্টে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তিনি নিজেই বলিতেছেন,—

'ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম।'

রামপ্রসাদ আপন বংশের প্রতি যে শুদ্ধমূল কথাটি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার অর্থ এখন সুস্পষ্ট। সে সময়ে বৈদ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে সিদ্ধ ও সাধ্য এই দুইটি বিশেষ শ্রেণী ছিল। ধন্বন্তরি, শক্তি, মৌদগল্য ও কাশ্যপ—এই চারিটি ছিল সিদ্ধ গোত্র। হীন কর্ম্মের জন্য অনেকে সিদ্ধ বংশ হইতে সাধ্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। আর যাহারা মধ্যপদীয়, তাহারা মৌলিক বলিয়া পরিচিত ছিল। বিনায়ক সেনের বংশ মহাকুলীন হইলেও তাহার মধ্যে কেহ ছিল কুলীন, কেহ মৌলিক, আবার কেহ সন্মৌলিক। রামপ্রসাদের বংশ সন্মৌলিক পদবাচ্য ছিল। সাধ্যবৎ ভাবনা হওয়ার জন্য এবং মূল বংশের শুদ্ধতা থাকায় রামপ্রসাদ স্ববংশকে শুদ্ধমূল আখ্যা দিয়াছেন।

চন্দ্রপ্রভার সাক্ষ্য এবং রামপ্রসাদের নিজের সাক্ষ্য একত্র করিলে রামপ্রসাদের বংশপরিচয় এইরূপই দাঁড়ায়—

২। রামপ্রসাদের কাল

বামপ্রসাদের কালনির্ণয়ে ভরত মল্লিক মহাশয়ের চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থখানি বিশেষ সহায়ক। মল্লিক মহাশয় আপন গ্রন্থে আপনার পৌত্র কৃষ্ণরামের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সাণ্ডুসেন হইতে দশমপুরুষে যখন কৃষ্ণরাম জন্মগ্রহণ করেন, তখন ঐ সাণ্ডুসেন হইতে একাদশ পুরুষে রামেশ্বর সেন বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু ভরত মল্লিক রামেশ্বরের বিবাহ পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়া তাঁহার চন্দ্রপ্রভাগ্রন্থে অথবা

পরবর্ত্তী রত্নপ্রভাগ্রন্থেও রামেশ্বর সেনের পুত্রের নাম আদৌ করেন নাই। অথচ রামেশ্বর সেনের শ্বশুর রামেশ্বর 'বাচস্পতি' ছিলেন ভরত মল্লিকের পরমাত্মীয়। আবার বাচস্পতির পিতৃব্যপুত্র গোবিন্দ কবিরাজ, ভরত মল্লিকের ভগিনীপতি। এই অবস্থায় মনে হয়, ১৫৯৭ শক বা ১৬৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রপ্রভা রচনাকালে রামপ্রসাদের পিতা বলরাম সেন জন্মগ্রহণ করেন নাই অথবা জন্মাইলেও তখন নিতান্ত শিশু।

প্রথমতঃ, রামরাম সেনের জন্মাব্দ ধরিয়া রামপ্রসাদের আবির্ভাবকাল মোটামুটি ঠিক করা যায়। রামরাম সেনের জন্মাব্দ যদি ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া অনুমান করা যায়, তবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিধিরামের জন্মাব্দ আনুমানিক ১৬৯৫ সালের পূর্ব্বে হইতে পারে না। অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রামপ্রসাদগ্রন্থের প্রসাদী-কথায় (৩৩৬ পৃ.) দেখিতেছি, নিধিরামের ৮ বৎসর বয়সে রামরাম সেন দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেন, এবং ঐ গ্রন্থেই আছে (৩২৫ পৃ.) রামপ্রসাদ তাঁহার মাতার তৃতীয় সন্তান। এ অবস্থায় নিধিরামের সহিত রামপ্রসাদের বয়সের ব্যবধান অন্ততঃ ১৫।২০ বৎসর ধরাই উচিত, এবং ইহাতে প্রসাদের আবির্ভাব-কালের উদ্ধতম সীমা ১৭১০-১৭১৫ সাল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, নিধিরামের জন্ম প্রকৃতপক্ষে ১৭০০ সালের পূর্ব্বে বলিয়া অনুমান করা কঠিন। কারণ, ১৭৫১ খ্রী. হইতে হলওয়েল এবং ১৭৫২ খ্রী. হইতে গভর্ণর ড্রেক যাহাকে 'মীরমুন্সী' পদে নিযুক্ত করেন,[৭] সেই নিধিরামের বয়স তখন মোটামুটি ৫০ ধরাই যুক্তিসঙ্গত। আবার নিধিরামের প্রপৌত্র গঙ্গাচরণ সেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহাধ্যায়ী।[৮] তাঁহার জন্ম ১৮১০ সালে ধরিলেও নিধিরাম হইতে গঙ্গাচরণ পর্য্যন্ত তিন পুরুষে ১১০ বৎসর হয়, অর্থাৎ এক পুরুষের গড়পড়তা হয় প্রায় ৩৭ বৎসর। সুতরাং ১৭০০-১০ সালে নিধিরামের জন্ম ধরিয়া রামপ্রসাদের আবির্ভাবকাল স্থূলভাবে ১৭২০-৩০ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে স্থির করা যায়।

তৃতীয়তঃ, গুপ্ত কবির মতেও রামপ্রসাদের আবির্ভাবকাল মোটামুটি এই সময়ের মধ্যেই পড়িতেছে। রামপ্রসাদের জন্মমৃত্যুর কাল সূচনা করিয়া গুপ্ত কবি লিখিয়াছেন—"৬০ বৎসর বয়সের কিঞ্চিৎ পরেই রামপ্রসাদ সেন মায়িক সংসার পরিহারপূর্ব্বক নিত্যধাম যাত্রা করেন। তাঁহার মৃত্যুর দিন গণনা করিলে ৭২ বৎসরের অধিক হইবে না।"[৯]

গুপ্ত কবির রচনাই রামপ্রসাদের জীবনীসম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক। এই অনুসারে রামপ্রসাদের মৃত্যু সন গণনা করিলে ১১৮৯ বঙ্গাব্দের ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে হইতে পারে না, হয়ত ২।৩ বৎসর পরেও হইতে পারে। সে সময়ে তাঁহার বয়স ৬১।৬২ ধরিয়া তাঁহার জন্মকাল মোটামুটি ১৭২১-২৬ খ্রীষ্টাব্দই নির্ণয় করিতে হয়।

চতুর্থতঃ, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল নন্দী তাঁহাদের কালী-কীর্ত্তনের ভূমিকায় প্রসাদের যে সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত দিয়াছেন, তাহাতেই প্রথমে ১৬৪০-৪৫ শক মধ্যে রামপ্রসাদের জন্ম অনুমিত হইয়াছে এবং গুপ্ত কবির উল্লিখিত উক্তিই তাঁহাদের এইরূপ অনুমানের হেতু।[১০]

অবশেষে বিদ্যাসুন্দর ও কালীকীর্ত্তন-গ্রন্থের রচনার তারিখ ধরিয়াও রামপ্রসাদের কাল অনেকটা নির্ভুলরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর কাব্যখানি রচনার ঊর্দ্ধতম কাল ১৭৬০ সাল। ইহার পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচিত হইতে পারে না। কারণ বিদ্যাসুন্দরের রচয়িতা রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন উপাধিতে ভূষিত। অথচ ১৭৫৯ সালেও রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন উপাধি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। রামপ্রসাদের নামে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রপ্রদত্ত সনদই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই সনদটি এখানে উদ্ধার করা যাইতে পারে।

শ্রীশ্রীরাম

শরণং

নকল

পারশী নং ১৮৩৪৮

১৫৮৩

ইঙ্গরাজী

শ্রীরামপ্রসাদ সেন সুচরিতেষু শুভাসীঃ প্রয়োজনঞ্চ বিশেষঃ এ অধিকারে তোমার ভূমিভাগ কিছু নাহি অতএব বেওয়ারিষ গরজমা জঙ্গলভূমি সমেত পতিত পরগণে হাবেলী সহর ১৬ ষোল বিঘা এবং পরগণে উখড়ায় ৩৫ পয়ত্রিশ বিঘা একুনে ৫১ একান্ন বিঘা তোমাকে মহোত্তরাণ দিলাম নিজ জোত করিয়া ভোগ করহ ইতি সন ১১৬৫ তারিখ ৪ ফাল্গুন শহর—

লর্ড কর্ণওয়ালিসের রাজত্বকালে বিশেষ আইনের বলে যখন বাংলার নিষ্কর ভূমির সনদাদি তলব করা হয়, তখন ১২০২ সালে (১৭৯৫ খ্রী.) শ্রীরামদুলাল

সেন সাং কুমারহট্ট "সন ১২০২ সাল ১৯ অগ্রহাহণ" তাঁহার পিতা রামপ্রসাদের নামীয় 'মহাত্রাণ' সম্পত্তির বিবরণ চারিটি পৃথক সংখ্যায় দাখিল করেন।

তায়দাদ নং ১৮৩৪৭

৺সুভদ্রা দেবী ২ বৈশাখ ১১৬৫ সনে দানপত্র করিয়া রামপ্রসাদ সেনকে হাবিলি সহর পরগণার নকুল বাটি গ্রামে 'আন্দাজী' ১৴০ বিঘা জমি দান করেন—দখলকার পুত্র রামদুলাল সেন।

তায়দাদ নং ১৮৩৪৮

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ৪ ফাল্গুন ১১৬৫ সনে তাঁহাকে ৫১৴০ একান্ন বিঘা জমি 'সনন্দ' করিয়া দেন। যথা—

বউলপুর	১৮৴০	উখরা পরগণা
পদ্মনাভপুর	১৭৴০	ঐ
মামুদপুর	১৬৴০	হাবিলি সহর পরগণা[১১]

এই সকল সনন্দে রামপ্রসাদের নামের পূর্ব্বে 'কবিরঞ্জন' উপাধির উল্লেখ কোথাও নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের সনন্দের তারিখ ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দ।

অথচ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রদত্ত সনন্দে দানভাজন ব্যক্তির উপাধি প্রয়োগ করারই ব্যবস্থা দেখা যায়। কারণ ১৭৪৯ সালে ভারতচন্দ্রকে যে সনন্দ দিয়াছিলেন, তাহাতে কবির উপাধির স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং

শ্রীতরঙ্গ

নকল

শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

সদুদার চরিতেষু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মনো।

নমস্কারঃ শিবং বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষঃ

সপরিবারে অধিকারস্থ হইয়া আনাওরপুর·চাকলায় বসতি করিয়াছ অতএব চাকলা মজকুরে বেওয়ারেশ গরজমাই উজ্জট বাস্তু ও লায়েক বাগাতি জঙ্গলভূমি

২১ একইশ বিঘা এবং বেলায়তি সমেত পতিত জঙ্গলভূমি ৫১ একান্ন বিঘা ও একুনে ৭২/০ বাওক্তর বিঘা বৃত্তি দিলাম বাস্তুতে সপরিবারে বসতি করিয়া বাগাতি জমিতে বাগিচা করিয়া জঙ্গলভূমি নিজ জোতে ভোগ করহ ইতি সন ১১৫৬ ছাপান্ন —১ অগ্রহায়ণ।

ইহা হইতে এই সহজ সিদ্ধান্তই আসিতেছে যে ১৭৬০ সালের পূর্ব্বে বিদ্যাসুন্দর রচিত হয় নাই।

আবার বিদ্যাসুন্দর রচনার নিম্নতম কাল ১৭৭০ সাল। কারণ এই গ্রন্থ-রচনাকালে রামপ্রসাদের কনিষ্ঠ সন্তান রামমোহনের জন্ম হয় নাই। রামমোহনের জন্মকাল ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ বা তাহার দুই এক বৎসর পরেই হইবে।

শ্রীযুক্ত দীনেশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন—

"রামমোহনের পৌত্র গোপালকৃষ্ণ ২৯।৪।১৮৯৫ তারিখে '৭৩' বৎসর বয়সে স্বর্গী হন অর্থাৎ তাঁহার জন্ম সন ১৮২২-২৩ খ্রী.—তৎকালে রামমোহনের বয়স ন্যূনকল্পে ৫০ ধরিলে তাঁহার জন্মতারিখ হয় ১৭৭২-৩ খ্রীষ্টাব্দ। দ্বিতীয়তঃ, রামমোহনের দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র দুর্গাদাস সেন ১২৯৩-৯৪ সনে 'প্রায় ৮০' বৎসর বয়সে স্বর্গী হন অর্থাৎ অনুমান ১৮১০ সনে তাঁহার জন্ম ধরা যায়। তৎকালে রামমোহনের বয়স ৪০ ধরা যায়। আমরা সম্বাদ দুইটি গোপালকৃষ্ণের পৌত্র মানসবাবু এবং দুর্গাদাসের পৌত্র রামরঞ্জনবাবুর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম।"[১২]

অতএব বিদ্যাসুন্দর-রচনার কাল যদি ১৭৬০ হইতে ১৭৭০ সনের মধ্যে ধরা যায়, তবে রামপ্রসাদের বয়স তখন ৩৫-৪০ হইবে। কারণ ২২ বৎসর বয়সে দারপরিগ্রহ করিলে তিনটি সন্তানের পিতা প্রসাদের বয়স তখন স্থূলভাবে অনুরূপই হইবে। ১২৮২-৮৩ সনে দয়ালপ্রসাদ ঘোষ তাঁহার প্রসাদ-প্রসঙ্গে রামপ্রসাদের পৌত্র দুর্গাদাস এবং দুইজন প্রপৌত্র গোরাচাঁদ ও গোপালকৃষ্ণকে জীবিত পাইয়া তাঁহার গ্রন্থের ২য় সংস্করণে পৃ. ৭৬ লিখিয়াছেন :—

'দ্বাবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি দারপরিগ্রহ করেন।"

সুতরাং উপরি-উক্ত গ্রন্থরচনার কালনির্ণয়দ্বারা এবং ঐ সময়ে রামপ্রসাদের ঐরূপ বয়সনির্দ্ধারণে রামপ্রসাদের আবির্ভাবকাল স্থূলভাবে ১৭২০-৩০ সনের মধ্যেই হওয়া যুক্তিসম্মত।

৩। প্রসাদ-জীবনী

কবিরঞ্জনের পিতা রামরাম সেনের দুই বিবাহ। প্রথম স্ত্রীর একমাত্র পুত্র সন্তান নিধিরাম। দ্বিতীয় স্ত্রীর চারিটি সন্তান। প্রথম দুইটি কন্যা—অম্বিকা ও ভবানী। রামপ্রসাদ মায়ের তৃতীয় সন্তান এবং বিশ্বনাথ চতুর্থ। রামপ্রসাদের তিনটি সন্তান, রামদুলাল, পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরীর নামই সাধারণে পরিচিত। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বা শেষ সন্তান রামমোহন অনেক দিন ধরিয়া জনসাধারণের কাছে অজ্ঞাত ছিলেন। কারণ রামমোহন পিতার অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধ বয়সের সন্তান। তাই বৃদ্ধ বয়সে প্রসাদের পত্নী গর্ভবতী হইলেই আজো গোঁসাই রহস্য-ভাবে গান রচনা করিয়াছিলেন—'তুমি ইচ্ছাসুখে ফেলে পাশা কাটায়েছ পাকা গুঁটি।'

বাল্যকালে রামপ্রসাদ বাংলা, সংস্কৃত, পারস্য ও হিন্দী ভাষায় কিছু কিছু দক্ষতা অর্জ্জন করেন। 'প্রসাদপ্রসঙ্গ' কার দয়ালপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বলিতেছেন, ষোল বৎসর বয়সের মধ্যেই তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি ও ঈশ্বরপ্রীতির সহজ বিকাশ দেখা যায়। ২২ বৎসর বয়সে তিনি সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং যৌবনের প্রারম্ভেই পিতার মৃত্যুতে সংসারভার নিপীড়িত রামপ্রসাদ অনেকটা বাধ্য হইয়াই চাকুরী জীবন বরণ করিতে বাধ্য হন এবং কলিকাতা সহরের কোন এক ধনীর গৃহে নাকি তিনি মুহুরীর কার্য্যে ব্রতী হন। এই ধনী ব্যক্তিটির প্রকৃত পরিচয় আজও অনির্ণীত। কেহ বলেন, ভূকৈলাশের দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালই এই ধনী ব্যক্তি, আবার কাহারও মতে 'নবরঙ্গ কুলাধিপ' দুর্গাচরণ মিত্রই তাঁহার প্রভু।[১৩]

অষ্টাদশ শতকের বাংলার গ্রাম্য সমাজে যে অর্থনৈতিক জীবনের বিস্তার সে জীবন নানা স্তরে উপস্তরে বিভক্ত। ভূমিনির্ভর কৃষিজীবনে ভূমিহীন অথবা স্বল্পভূমিবান্ গৃহস্থদের দৈন্যের যেমন অন্ত ছিল না, বিশেষভাবে ভদ্র বর্ণ সমাজের উপর স্তরে, তেমনি ভূমিবান্ স্তরে আর্থিক সম্পদ্ এবং ঐহিক ক্ষমতারও অপ্রাচুর্য্য ছিল না। কিন্তু অর্থনৈতিক জীবনের যে স্তরেই হউক, সর্ব্বত্রই যে ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম জীবনের বিস্তার, তাহা ছিল একান্তই মাতৃকেন্দ্রিক তন্ত্র-ধর্ম্মদ্বারা স্পৃষ্ট, এবং এই স্পর্শ শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় ধর্ম্মেই গভীরভাবে লাগিয়াছিল। ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম জীবনের এই সাধারণ পরিবেশের মধ্যেই রামপ্রসাদ মানুষ হইয়াছিলেন। তাঁহার পারিবারিক ও সাংসারিক জীবনে দুঃখ ও দারিদ্র্যের দংশন, ক্ষতও সৃষ্টি করিয়াছিল প্রচুর। সমাজের ধন-বৈষম্য এবং দুঃখ-দারিদ্র্যক্লিষ্ট সাংসারিক জীবনের

দুর্গতি-ভোগের নানা অভিজ্ঞান তাঁহার অসংখ্য গানে কিছু কিছু চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। সমসাময়িক জীবন ও ভাবনার, চিন্তা ও দর্শনের প্রেক্ষাপটে দৈন্য-পীড়িত অথচ সূক্ষ্ম স্পর্শ-কোমল চিত্তে জাগতিক সমস্ত দুঃখ ও বৈষম্যের হাত হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় অন্তরের গভীর গহনে অধ্যাত্ম জীবনের একটি স্থিরকেন্দ্রে আশ্রয় খোঁজা, এবং সে আশ্রয় যে হইবে মাতৃকেন্দ্রিক তন্ত্রসাধনা, তাহাও কিছু আশ্চর্য্য নয়। রামপ্রসাদের জীবনে তাহাই হইয়াছিল।

জীবিকানির্ব্বাহের তাড়নায় রামপ্রসাদ জমিদার সরকারের চাকরী লইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অধ্যাত্মভাবমুগ্ধ অন্তর কম্পাসের কাঁটার মত যে কেন্দ্রে স্থির হইয়া রহিল, তাহা হিসাবের খাতা নয়, সেই হিসাবের খাতার পাতা ভরিয়া উঠিত তাঁহার ইষ্ট দেবতার নামকীর্ত্তনে, বসিয়া বসিয়া আপন মনে খাতায় তিনি ইষ্ট দেবতার নাম লিখিতেন, আর নিজের অন্তরের গভীর বেদনাবাসনা নিবেদন করিতেন তাঁহারই ইষ্টদেবতার কাছে গানের রূপে। মাহিনা দিয়া যাহাকে কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছে, তাহার এই অপরূপ আচরণ উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের ভাল লাগিবার কথা নহে। কিন্তু উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী যখন রামপ্রসাদের এই আচরণ জমিদার প্রভুর নিকট নিবেদন করিলেন, তখন ফল ফলিল বিপরীত। ধর্ম্মভীরু প্রভু রামপ্রসাদের হিসাবের খাতাখানি পরীক্ষা করিয়া একটু বিস্ময় অনুভব করিলেন। মনে হইল, হয়ত রামপ্রসাদের চিত্ত অন্য ধাতুতে গড়া, প্রাণধারণ ও সংসারপালনের প্রয়োজনে চাকুরীতে লিপ্ত হইলেও রামপ্রসাদের চিত্ত গভীরতর কোন আবেগে আপ্লুত। প্রভু রামপ্রসাদকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহাকে মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি দিয়া বিদায় দিয়া তাহাকে চাকুরীর বন্ধন হইতে এবং সংসারপালনের দায় হইতে মুক্তি দিলেন।

সংসারদায়মুক্ত রামপ্রসাদের এখন আর অন্য কোন কাজ রহিল না। ঘরে ফিরিয়া তিনি পঞ্চমুণ্ডের আসন প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সেই আসনই হইল তাঁহার অধ্যাত্মসাধনার বীজ। একদিকে তদ্গত তান্ত্রিকসাধন, অন্যদিকে গভীর ভাবাবেগে আপ্লুত হইয়া সেই সাধনার আনন্দ গানের সুরে বিস্তার— এই দুই বস্তু লইয়াই রামপ্রসাদের জীবন। কাজেই রামপ্রসাদের সাধনা ও রামপ্রসাদের গান অঙ্গাঙ্গী জড়িত, রামপ্রসাদী গান পাণ্ডিত্য, বিদ্যাবত্তা ও কবিত্ব শক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করিবার জন্য রচিত হয় নাই। তাঁহার গান একটি ভাব-মুগ্ধ অন্তরের এবং অধ্যাত্মসাধনোপলব্ধ সত্যের আনন্দ-বেদনাময় প্রকাশ।

যাহাই হউক, রামপ্রসাদের কাল কাটিত সাধনায় এবং গানের পর গান রচনায়। অবসর সময়ে তিনি কিছু কাব্য, ভজন বন্দনাদিও রচনা করিতেন। কিন্তু তাহাও তাঁহার জীবনদর্শন ও সাধন আনন্দ দ্বারা স্পৃষ্ট। শেষ পর্য্যন্ত কাব্য-ভজন-বন্দনাদি ছাড়াও সাধনসঙ্গীতই তিনি রচনা করিয়াছিলেন অসংখ্য। তিনি যে বলিয়াছিলেন—'লাখ উকিল করেছি খাড়া'—তাহার ব্যঙ্গার্থ কিছু মিথ্যা নহে।

রামপ্রসাদ যখন শক্তিসাধনায় এবং সাধনসঙ্গীত রচনায় ব্যাপৃত, তখন কখনও কখনও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কুমারহট্ট গ্রামে বেড়াইতে যাইতেন এবং অবসরমত প্রসাদের সঙ্গে নানা ধর্ম্মালোচনায় যোগদান করিতেন। ক্রমশঃ মহারাজ প্রসাদের বৈরাগ্য ও সাধনার গভীরতা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইলেন এবং আপনার সভাকবিরূপে আমন্ত্রণ জানাইলেন। রামপ্রসাদ সবিনয়ে এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া অকুণ্ঠ আনন্দই প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাকে 'কবিরঞ্জন' উপাধিসহ ১০০/০ বিঘা নিষ্কর জমি দান করিলেন।

ইহার পর প্রাণধারণের দায়সম্বন্ধে রামপ্রসাদের আর কোন ভাবনাই রহিল না। কিন্তু তাহাতে সংসারদুঃখ ঘুচিল তাহাও সত্য নয়। ধনের প্রতি যাঁহার অনাসক্তি তিনি সেই ধন মুক্তহস্তে অকাতরে বিলাইবেন, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। রামপ্রসাদও তাহাই করিতেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও রামপ্রসাদের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়া নানা কাহিনী আশ্রয় লাভ করিয়াছে। এ সব কাহিনীর সত্যতা নির্দ্ধারণকল্পে গুপ্তকবিবিরচিত প্রসাদ-জীবনী[১৪] এবং তাঁহার ঐ বিবরণ সমর্থনকল্পে তাঁহারই প্রকাশিত একখানি পত্রই[১৫] আমাদের একমাত্র নির্ভর। আবার আজু গোঁসাইয়ের সঙ্গে রামপ্রসাদের যে সম্বন্ধ তাহাও কিছু কাল্পনিক গল্প নয়, রামপ্রসাদ এবং আজু গোঁসাইয়ের গানের মধ্যেই সে প্রমাণ বিস্তৃত এবং রামপ্রসাদের জীবনের পরিচয় লইতে হইলে কুমারহট্টনিবাসী আজু গোঁসাইয়ের (অযোধ্যারাম গোস্বামী) পরিচয়ও অপরিহার্য্য।

সাধারণের নিকট অযোধ্যা গোস্বামী আজু গোঁসাই বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। ইনি রামপ্রসাদের স্বগ্রামবাসী ও সমসাময়িক। অনেকে তাঁহাকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি পাগল ছিলেন না। অনেক উক্তি শুনিয়া আপাতঃ পাগল মনে হইলেও যথার্থতঃ তিনি ছিলেন ভাবুক কবি।

রামপ্রসাদ শাক্ত, কালীভক্ত আর ইনি বৈষ্ণব ও হরিভক্ত। শাক্ত ও বৈষ্ণবের চিরন্তন স্বাভাবিক বিরোধ অনুসারে ইঁহাদের মধ্যেও অনেক সময় নানা বিরুদ্ধ আলাপ আলোচনা চলিত। প্রতিপদে ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা প্রসাদের শাক্ত সঙ্গীতের খণ্ডনই ছিল আজু গোঁসাইএর ধর্ম্ম। দুই-একটি অনুরূপ সঙ্গীত উদ্ধারেই পরস্পরের সম্বন্ধটি সুব্যক্ত হইবে।

রামপ্রসাদ গাহিতেন—

'আর কাজ কি আমার কাশী'———ইত্যাদি

আজু গোঁসাই জবাব দিতেন—

'পেসাদ তোর যেতেই হবে কাশী'———ইত্যাদি

রামপ্রসাদ—

'এই সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি ॥'———ইত্যাদি

আজু গোঁসাই—

'এই সংসার ধোঁকার টাটি।
ওরে খাই, দাই, মজা লুটি ॥'———ইত্যাদি।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কুমারহট্টে আপনার অবস্থানকালে অনেক সময় রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাইকে একত্র করিয়া এই সকল শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব উপভোগ করিতেন। তবে আজু গোঁসাই-এর ব্যঙ্গোক্তি যেখানেই একটু মাত্রায় চড়িত, সেইখানেই মহারাজ তাঁহাকে নিষেধ করিতেন। প্রসাদের সঙ্গীত রচনার শক্তি ছিল অসাধারণ। যখনই যাহা গাহিতেন, প্রাণের আবেগই ছিল তাঁহার মূল উপাদান। ভাবের সঙ্গে ভাষা যেন আপনা হইতেই আসিয়া জুটিত। একবার রথযাত্রার সময় প্রসাদ রাজা নবকৃষ্ণের সহিত একত্র ভ্রমণ করিতেছিলেন। রাজা মহাশয় প্রসাদকে একটি সময়োচিত গানের প্রার্থনা জানাইলে রামপ্রসাদ গাহিলেন—

'কালী কালী বল রসনারে।
ঐ ষটচক্র রথমধ্যে শ্যামা মা মোর বিরাজ করে ॥'

দোলযাত্রা উপলক্ষেও একবার রাজা নবকৃষ্ণের অনুরোধে প্রসাদ নিম্নোদ্ধৃত স্বরচিত এবং সময়োচিত সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন—

'হৃৎকমলে মঞ্চদোলে করাল-বদনী—শ্যামা।
মনপবনে দোলাইছে দিবস রজনী ও মা ॥'

অধ্যাত্মসাধন অভিজ্ঞতায় অনেক বস্তু ও ঘটনা অলৌকিক লক্ষণ দ্বারা আক্রান্ত। সে সব অলৌকিক কাহিনী বা ঘটনা বিচার-বিশ্লেষণের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, কিন্তু এইরূপ কোন কোন ঘটনার সঙ্গে রামপ্রসাদের কোন কোন গানের যোগাযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং সেই সব গানের পদার্থের মধ্যে কোন কোন প্রচলিত কাহিনীর সমর্থন পাওয়া যায়।[১৬]

রামপ্রসাদের মৃত্যুকাহিনীও কিছুটা অলৌকিক। স্থিতধী পুরুষের ন্যায় রামপ্রসাদ আপনার মৃত্যুকাল আসন্ন বুঝিয়াই তৎপূর্ব্বদিন বিশেষভাবে কালীপূজার আয়োজন করেন। পূজার পরদিন বিসর্জ্জনের সময় বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনকে আপনার মৃত্যুক্ষণ আসন্ন জানাইয়া সকলকে শোকপ্রকাশ করিতে নিষেধ করেন। অন্যান্য অনেকের সঙ্গে সমারোহ সহকারে শক্তিগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রসাদ জাহ্নবীতীরে গমন করেন। পরে অর্দ্ধনাভি গঙ্গাজলে ডুবাইয়া একে একে চারিটি সঙ্গীত করেন। শেষ সঙ্গীতের উপসংহারে, 'মাগো, ওমা আমার দফা হলো রফা, দক্ষিণা হয়েছে,'—এই বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়া তাঁহার জীবনের অবসান ঘটে। এ কাহিনী কতটা সত্য বা মিথ্যা তাহা বিচারের বস্তু নয়। তবে জীবনে এইরূপ ঘটে না একথাও জোর করিয়া বলা যায় না।

৪। কবিরঞ্জন ও দ্বিজ রামপ্রসাদ

প্রসাদীপদ বলিতে বাংলাদেশে যে অগণিত পদ প্রচলিত, কেবল কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনকে এই সমুদয় পদের রচয়িতা হিসাবে গ্রহণ করা কঠিন। কারণ, যদিও পূর্ব্ববঙ্গের দ্বিজ রামপ্রসাদের জীবন ও পরিচয় আজও সুপ্রতিষ্ঠিত নহে, তথাপি নানা কারণে তাঁহার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য্য। এ পর্য্যন্ত রামপ্রসাদের জীবন ও রচনাবলী অবলম্বনে যাঁহারা বিশেষ গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রাচীন ও প্রধানতম ঈশ্বর গুপ্ত ও দয়াল ঘোষ মহাশয় এই দ্বিজ রামপ্রসাদ নামক দ্বিতীয় ভক্তপ্রসাদের অস্তিত্বকে বিশেষভাবেই স্বীকার করিয়াছেন। স্পষ্ট বা প্রবল প্রমাণ সুলভ না হইলেও তিনি যে কবিরঞ্জন হইতে ভিন্ন এবং সার্থক পদকর্ত্তা, এ বিষয়ে তাঁহাদের সংস্কার ছিল সুদৃঢ়। পরিশিষ্টে এ সম্পর্কে যথাসাধ্য বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, কাজেই এখানে তাহার বিশেষ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

৫। রামপ্রসাদের রচনাবলী

প্রসাদের সমগ্র রচনার মধ্যে বিদ্যাসুন্দর যে সর্ব্বপ্রথম রচনা, একথা প্রমাণ-সাপেক্ষ বলিয়া মনে হয় না। কারণ এ রচনায় কবির যে রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সিদ্ধভক্ত রামপ্রসাদের নয়, মনে হয় পরবর্ত্তী জীবনের অধ্যাত্মসাধনার স্পর্শ তখনও তাঁহার জীবনে লাগে নাই, তখনও তিনি কালের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। প্রসাদী সঙ্গীতগুলি যেমন সাধকজীবনের ক্রম অভিব্যক্তির প্রকাশ, এই সকল শাক্ত সঙ্গীত যেমন সাধকের সাধনাজীবনের বিভিন্ন পর্য্যায়ের ইতিহাস, তাঁহার শৃঙ্গার রসাত্মক বিদ্যাসুন্দর কাব্যখানি তেমনই সাধনাজীবনের পূর্ব্বাবস্থার রচনা বলিয়া ধরাই যুক্তি ও মনোবিজ্ঞানসম্মত। আবার যে অবস্থায় ভক্ত মাতৃনামে আত্মহারা, 'ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি তা জান না,'—এইভাবে ত্রিভুবনই যখন ভক্তের কাছে মাতৃময়, আবার 'আমি বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোঁজ তল্লাসী, ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম, সকলই আমার এলোকেশী'—এইভাবে শিবশক্তি ও বিষ্ণুরূপ যে সময়ে ভক্তের মাতৃরূপের মধ্যে সমাহিত, সীতাবিলাপ বা কৃষ্ণকীর্ত্তন মাতৃনাম-পাগল ভক্তের সেই একান্ত পরিণত মনের নিদ্বন্দ্ব অবস্থার রচনা বলিয়া বুঝিতে কেমন যেন অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। তাই মনে হয়, বিদ্যাসুন্দর ত বটেই, প্রসাদের কৃষ্ণকীর্ত্তন রূপ ভজনগীত বা সীতা-বিলাপ অপেক্ষাকৃত অপরিণত বা অসিদ্ধ অবস্থারই রচনা। এ রচনা-প্রকৃতির মধ্যে সমসাময়িক সাহিত্যরচনার একটি গতানুগতিক ধারার পরিচয় আছে। মনে হয়, প্রসাদ যখন অপরিণত মানসিক অবস্থায় রচনাধারার এই চিরাচরিত প্রথাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই, তখনই যুগের রুচির অনুবর্ত্তনে কখনও বিদ্যাসুন্দর, কখনও কৃষ্ণকীর্ত্তন বা সীতাবিলাপ রচনা করিয়াছেন।

কালীকীর্ত্তন

প্রসাদের কালীকীর্ত্তন গ্রন্থই প্রথম প্রচার লাভ করে। মনে হয়, গুপ্ত কবিই ১৮৩৩ সালে এ গ্রন্থ প্রথম মুদ্রিত করেন, এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের গ্রন্থাগার হইতে এই মুদ্রিত গ্রন্থ সংগ্রহপূর্ব্বক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ উহা পুনর্মুদ্রিত করেন।[১৭] ওয়ার্ড সাহেবের গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৮]

বিদ্যাসুন্দর

প্রসাদের দ্বিতীয় মুদ্রিত গ্রন্থ 'কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর'। ভারতচন্দ্রের মত রামপ্রসাদ তাঁহার 'কবিরঞ্জন' বা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের মধ্যে উহার রচনাকাল সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিতই দান করেন নাই। এজন্য প্রসাদী বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বের অথবা পরের রচনা, ইহা লইয়া সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সাহিত্য সাধকদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ চলিয়াছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যের তুলনায় প্রসাদী বিদ্যাসুন্দরের ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ও শিল্পগত দৈন্য দেখিয়া অনেকেই ইহাকে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বের রচনাই মনে করেন। দীনেশবাবু স্পষ্টভাষাতেই ইহাকে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে অন্যতম বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতা প্রাণরামের উক্তি উল্লেখ করিয়া আপন মন্তব্যের সমর্থন করিয়াছেন—"ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী আর দুইখান বাঙ্গালার বিদ্যাসুন্দর পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে ভারতের পদলালিত্য ও অপূর্ব্ব শব্দমন্ত্র নাই, কিন্তু দোষগুলি সমধিক পরিমাণে বিদ্যমান। এই দুইখানি বিদ্যাসুন্দর-প্রণেতা কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ। প্রাণরাম নামক এক কবি ভারতচন্দ্রের পর আর একখানি বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে এই কয়েকটি কথা আছে,—"বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম বিকাশ। বিরচিল কৃষ্ণরাম নিমতা যার বাস॥ তাঁহার রচিত পুঁথি আছে ঠাঁই ঠাঁই। রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা পাই॥ পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে। রচিলেন উপাখ্যান প্রসাদের ছলে'॥" [১৯]

দীনেশবাবু অন্যত্র লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণরামের হাতে বিদ্যাসুন্দর একমেটে, রামপ্রসাদের হাতে দোমেটে এবং ভারতচন্দ্রের হাতে বিদ্যাসুন্দরের রং ফিরান হইয়াছিল।" [২০]

দীনেশবাবু ছাড়াও বিদ্যাসুন্দর কাব্যসম্পর্কে যাঁহারা কিছু আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অপর অনেকেরই ধারণা, প্রসাদী কাব্য ভারতচন্দ্রের কাব্যের পূর্ব্বেরই রচনা। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয় [২১] এবং গুপ্ত কবিও [২২] অনুরূপ মন্তব্যেরই পরিপোষক।

কিন্তু বস্তুতঃ প্রসাদী বিদ্যাসুন্দর যে ভারতচন্দ্রের পরবর্ত্তী রচনা, এ বিষয়ে এখন আর সন্দেহের কারণই থাকিতে পারে না। কারণ প্রসাদের এ কাব্যের অপর নাম 'কবিরঞ্জন' অর্থাৎ কবি তখন ঐ উপাধিযুক্ত। অথচ ১১৬৫ সালেও (১৭৫৯ খ্রীঃ) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে যে সকল সনন্দ দিয়াছিলেন, তাহাদের

কুত্রাপি কবির নামের পূর্ব্বে ঐ উপাধির উল্লেখ নাই। দৃঢ়প্রত্যয়ের জন্য ঐ সকল সনন্দের একটি এখানে উদ্ধার করিতেছি—

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সনদের নকল। নং ১৮৩৪৮

নকল

শ্রীশ্রীরাম

শরণং

পারশী

১৫৮৩

ইঙ্গরাজী

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেবস্য

শ্রীরামপ্রসাদ সেন সুচরিতেষু শুভাসীঃ প্রয়োজনঞ্চ বিশেষঃ এ অধিকারে তোমার ভূমিভাগ কিছু নাহি অতএব বেওয়ারিষ গরজমা জঙ্গলভূমি সমেত পতিত পরগণে হাবেলী সহর ১৬ ষোল বিঘা এবং পরগণে উখড়ায় ৩৫ পঁয়ত্রিশ বিঘা একুনে ৫১ একান্ন বিঘা তোমাকে মহোত্তরাণ দিলাম নিজ জোত করিয়া ভোগ করহ ইতি সন ১১৬৫ তারিখ ৪ ফাল্গুন শহর—[২৩]

আবার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে দানভাজন ব্যক্তির প্রতি সর্ব্বদাই উপাধির উল্লেখ করিতেন, তাহাও ভারতচন্দ্রের প্রতি মহারাজপ্রদত্ত নিম্নোদ্ধৃত সনন্দেই প্রমাণ :—

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং

শ্রীতরঙ্গ

নকল

শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

সদুদার চরিতেষু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মনো,

নমস্কারঃ শিবং বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষঃ

সপরিবারে অধিকারস্থ হইয়া আনওরপুর চাকলায় বসতি করিয়াছ অতএব চাকলা মজকুরে বেওয়ারেশ গরজমাই উজ্জট বাস্তু ও লায়েক বাগাতি জঙ্গলভূমি ২১ একইশ বিঘা এবং বেলায়তি সমেত পতিত জঙ্গলভূমি ৫১ একান্ন বিঘা একুনে ৭২/০ বাহত্তর বিঘা বৃত্তি দিলাম বাস্তুতে সপরিবারে বসতি করিয়া বাগাতি

জমিতে বাগিচা করিয়া জঙ্গলভূমি নিজ জোতে ভোগ করহ। ইতি সন ১১৫৬ ছাপ্পান্ন—১ অগ্রহায়ণ।[২৪]

এই জাতীয় রাজকীয় সনন্দে ইহা সুস্পষ্ট যে, ১১৬৫ (ইং ১৭৫৯) সালেও রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন উপাধি পান নাই। অথচ বিদ্যাসুন্দর বা কালীকীর্ত্তন-গ্রন্থে কবির 'কবিরঞ্জন' ভণিতা বহুস্থলেই লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং বিদ্যাসুন্দর-কাব্য যে ঐ সকল সনন্দের তারিখের পরবর্ত্তী রচনা ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর রচনার সমাপ্তিকাল কবির নিজেরই উক্তি অনুসারে ১৭৫২—৫৩।[২৫] অতএব প্রসাদী বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের কাব্যের পরবর্ত্তী রচনা, ইহা এখন আর প্রমাণসাপেক্ষ মনে হয় না।

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' এই সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন—"রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর কাব্য যে ভারতচন্দ্রের কাব্যের পরে লেখা তাহাতে সন্দেহ নাই।"[২৬]

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বটতলা 'বিদ্যারত্ন যন্ত্র' হইতে মুদ্রিত কবিরঞ্জনের 'কাব্য-সংগ্রহ' নামক গ্রন্থে জীবনী-সহ প্রসাদের সম্পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় (পৃঃ ৩) পাওয়া যায়, 'আমরা কবিরঞ্জনের যে কিছু রচনা প্রাপ্ত হইয়াছি, স্বভাবতই এই তত্ত্ব গ্রন্থে গ্রন্থিত হইয়াছে।' ইহাতে বিদ্যাসুন্দর (পৃ. ১-১৮৭), কালীকীর্ত্তন (পৃ. ১৮৯-২১৯) ও কৃষ্ণকীর্ত্তন (পৃ. ২২১-২২) ব্যতীত প্রথম রামপ্রসাদের মোট ৯১টি পদাবলী (পৃ. ২২৩-৭৭) মুদ্রিত হয়। ইহার মধ্যে (পৃ. ২৪৩-৪৬) 'সীতার বিলাপোক্তি'ও দেখা যায়।

গুপ্ত কবিও সংবাদ প্রভাকরের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রসাদের অন্যান্য নানা পদাবলীর সহিত কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিষয়ক[২৭] গীত প্রকাশ করেন এবং উহারই একটি সংখ্যায়[২৮] সীতার বিলাপোক্তিও প্রকাশ করেন।

৬। রামপ্রসাদের জীবনপ্রকৃতি

প্রসাদের জীবনে ঘটনার তেমন বিচিত্র ও বহুল সমাবেশ নাই। দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁহার জন্ম, দারিদ্র্যেরই মধ্যে তিনি মানুষ। ভারতচন্দ্রের মত সমৃদ্ধ রাজকুলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই, অথবা বৈষয়িক জীবনের খাতিরে তাঁহার মত সমসাময়িক গণ্যমান্য ধনী মহাজনের বিত্তশালী ও প্রভুত্বসমৃদ্ধ সমাজের সঙ্গে পরিচয়ের অবসরও ঘটে নাই তাঁহার। ভারতচন্দ্রের মত শৈশবে কালোচিত শিক্ষাদীক্ষা তিনিও লাভ করিয়াছিলেন, এবং যুগোচিত রীতি অনুসারে তিনিও

বিদ্যাসুন্দর এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনাদি রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু শিক্ষাজীবনে তাঁহার মত বিচিত্র দেশ কাল অথবা পাত্রের সঙ্গে অথবা সমসাময়িক জীবনের নানা রূপ ও লীলার সঙ্গে রামপ্রসাদের তেমন পরিচয় ঘটে নাই। প্রসাদের শিক্ষা বা কর্ম্ম-জীবন স্বল্পপরিসর। সংসার বা প্রাণের দায়ে কলিকাতা সহরের কোন মহাজনের আশ্রয়ে তাঁহাকে সামান্য একটি চাকুরী গ্রহণ করিতে হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা একান্তই জীবিকাহিসাবে। বৈষয়িক উচ্চাশা বা ইহজীবনে অর্থসমৃদ্ধির বা স্বাচ্ছন্দ্যের কোন কামনা তাঁহার ছিল না। তাই মহাজনের হিসাবের খাতায় টাকা কড়ি জমার পরিবর্ত্তে দিনের পর দিন তিনি কেবল কালী তারার নামই জমা করিয়াছিলেন। জমিদারের তহবিলদারীতে নিযুক্ত হইয়াও অনুক্ষণ কেবল সেই মায়ের তহবিলদারীর জন্যই ছিলেন ব্যাকুল।

কিন্তু রামপ্রসাদ তাঁহার এই স্বল্পপরিসর ও অনাড়ম্বর কর্ম্মজীবনের ভিতরে থাকিয়াও বিস্তৃত ও বিচিত্র সংসারটিকে দেখিতে ভুল করেন নাই। সমসাময়িক ধর্ম্মময় জীবনের নানা দৈন্য, ক্লেদ ও গ্লানি কোথাও তাঁহার সদাজাগ্রত ও সশ্রদ্ধ দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। ভারতচন্দ্রের সূক্ষ্ম নির্ম্মোহ দৃষ্টিতেও তৎকালীন দেশ ও জীবনরূপ ধরা পড়িয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, রামপ্রসাদের কাছে সমাজ ও জীবনের যাবতীয় রূপ ও অবস্থাই তাঁহার মাতৃলীলামাত্র। জীবনের সুখ-দুঃখ, সম্পদ্-বিপদ্, উত্থান-পতন সকলই সেই মায়েরই লীলাবৈচিত্র্য। মাতৃভক্ত-প্রসাদের কাছে এইজন্যই সমাজ ও জীবনের সকল অবস্থা,সর্ব্বপ্রকৃতিই সমান শ্রদ্ধার দৃষ্টি লাভ করিয়াছে। সমসাময়িক সমাজব্যবস্থার যাবতীয় বৈষম্য, সমাজদেহের শতগ্লানি ও দুর্নীতি, প্রসাদ তাঁহার স্বল্পপরিসর কর্ম্মজীবনের মধ্যে থাকিয়া দেখিয়াছেন ;—

> "জানি গো জানি গো তারা তোমার যেমন করুণা।
> কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে, কারু পেটে ভাত গেঁটে সোনা॥
> কেহ যায় মা পাল্কী চড়ে, কেহ তারে কাঁদে করে।
> কেহ গায় দেয় শাল দোশালা কেহ পায় না ছেঁড়া টেনা॥"

সমাজজীবনের এই বৈষম্য তাঁহাকে ব্যথিতও করিয়াছে একান্ত। কিন্তু প্রসাদ সমাজদেহের সেই দুর্ব্বলতা ও বিকারের প্রতিকার খুঁজিয়াছেন মানসপথে—মাতৃসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া অধ্যাত্মজীবনের সংস্কার ও সমৃদ্ধিসাধনে, লৌকিকপথে নয়। ঐশী শক্তির আনুগত্যে মানুষ যাহতে মনঃক্ষেত্রের চাষ

করিতে শিখে, মায়ের কাছে প্রসাদের এই ছিল একান্ত প্রার্থনা। সমাজদেহের দৈন্যে ও বৈষম্যে প্রসাদের মনে ঘৃণা জন্মায় নাই কোথাও, অথবা সে জীবনের প্রতি ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ প্রকাশও তাঁহার ছিল না। যেহেতু বাহিরের জীবন ও তাহার ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, নীতি, দুর্নীতি, শুচিতা ও অশুচিতা—সব কিছুর মধ্যেই তিনি নিঃসংশয়চিত্তে লক্ষ্য করিয়াছেন একই সত্য—মায়ের লীলাবৈচিত্র্য, সেইজন্য তাহার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ ও মমত্ববোধ তাঁহার আগাগোড়াই ছিল। ভারতচন্দ্রের মত তিনি সেই জীবনকে, সেই জীবনের মিথ্যা ঐশ্বর্য্যকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ অথবা ছলাকলা বর্ণনার বিষয়ীভূত করেন নাই। রামপ্রসাদ বিশ্বাস করিতেন—যতদিন মানবজীবনের মান ও আদর্শ জাগতিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত, বৈষয়িক জীবন যতদিন আত্মিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকিবে, ততদিন সে জীবন ও সমাজের বিকার ও বিকৃতি ঘুচিবার নয়, আর এই মানব-জীবনের মান ও আদর্শকে স্বচ্ছ, সহজ, সরল করিতে গেলে ঐকান্তিক ঐশীশক্তির আরাধনাই সহজ ও অমোঘ পথ, বৈষয়িক বা লৌকিক জীবনের তথাকথিত সংস্কার বা মার্জ্জনে এই আত্মিক উন্নতি সম্ভব নয়। রামপ্রসাদের এ প্রত্যয় ছিল সুদৃঢ়। সে জীবনের প্রতি ঘৃণাবিদ্রূপ বা ব্যঙ্গপ্রকাশেও যে সার্থক ও পূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, এ ধারণাও তাঁহার ছিল দৃঢ়মূল।

আমাদের এই সমাজের বিচিত্র দুঃখ ও দারিদ্র্য, ছলাকলা, ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর, চরিত্রের দৈন্য, মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব, হিংসাকলহ এবং গভীর বৈষম্যবোধ—সমস্তই রামপ্রসাদ দেখিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রও না দেখিয়াছিলেন বা না জানিতেন, এমন নয়, কিন্তু সমাজের এই রূপ ভারতচন্দ্রকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল ব্যঙ্গ—বিদ্রূপ—ঘৃণায়; তীক্ষ্ণ ও চটুল হাস্যপরিহাসে। সমাজের এই একই রূপ রামপ্রসাদকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল পরমপ্রীতিতে ও ভালবাসায়, গভীর আবেগময় বেদনায়। এই বেদনার সান্ত্বনা তিনি খুঁজিয়াছিলেন ঐশীশক্তির দুয়ারে; মানুষের প্রতি, মানব-জীবনের প্রতি এই প্রীতি ও ভালবাসা ছিল বলিয়াই তিনি সকল দুঃখ-দারিদ্র্য-বৈষম্যের প্রতিকার খুঁজিয়াছিলেন তাঁহার শক্তিময়ী মাতার চরণে—সেখানে তাঁহার মান-অভিমান-আব্দারের সীমা ছিল না। তাঁহার একান্ত সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ঐশী মাতৃশক্তির সাধনাই মানবজীবনের সকল দুঃখ, দৈন্য, বেদনা নিরাকরণের একমাত্র উপায়। এ বিশ্বাস যুক্তিসহ কিনা, ইতিহাসগ্রাহ্য কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর। মানুষ যে আপন চেষ্টায় নিজের ও সমাজের রূপ বদলাইতে পারে, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে

যে সমাজ বিবর্ত্তিত হয়, এই ধ্যান সমসাময়িক কালের বাতাসে কোথাও ছিল না—রামপ্রসাদেরও ছিল না। রামপ্রসাদ কালের ধর্ম্মকেই আপন ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ জাগতিক সকল দুঃখ, দৈন্য, বৈষম্য, সমস্ত কিছুর হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে সুদৃঢ় প্রত্যয় লইয়া, গভীর আশা লইয়া, ঐশীশক্তির সাধনা এবং সেই শক্তিরই কৃপায় আত্মশক্তির উদ্বোধন—ইহাই ছিল রামপ্রসাদের ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মবিশ্বাসকে আশ্রয় করিয়াই রামপ্রসাদ অষ্টাদশ শতকের নিশ্চেষ্ট, হতচেতন, বিমূঢ় বাঙ্গালীর অবসাদগ্রস্ত চিত্তে আশা, বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়কে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্রের জীবনপ্রকৃতির সঙ্গে রামপ্রসাদের জীবনের পার্থক্য এইখানেই। উভয়েই সমসাময়িক সমাজ ও জীবনকে দেখিয়াছিলেন, চিনিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পার্থক্য তাঁহাদের মনঃপ্রকৃতির মধ্যে বা দৃষ্টিকোণের ভিতর। ভারতচন্দ্র সমসাময়িক জীবন ও সমাজকে দেখিয়াছেন, তাঁহার প্রখর বুদ্ধি-শাণিত-দৃষ্টি দিয়া। সে দৃষ্টির কাছে তৎকালীন জীবনের সকল ত্রুটি ও ফাঁকি, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপ, তীক্ষ্ণতর হাস্যপরিহাসে লাঞ্ছিত হইয়াছে, সহৃদয় আত্মীয়ের প্রীতি ও ভালবাসার স্পর্শে ক্ষতস্থল চিকিৎসিত হয় নাই, প্রতিকারের কোন ইঙ্গিতও পায় নাই। সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মাইলেও ভারতচন্দ্রের জীবন শৈশব হইতেই নানা সামাজিক ও রাজকীয় অত্যাচারে বিড়ম্বিত। মনে হয়, জীবনের প্রথম হইতেই সমাজজীবনের নানা অপ্রীতিকর ও তিক্ত অভিজ্ঞতা ভারতচন্দ্রকেও তিক্ত করিয়া তুলিয়াছিল এবং সে সমাজকে এইজন্যই তিনি ক্ষমা করিতে পারেন নাই। তাহার দোষত্রুটিগুলিকে কেবল তীক্ষ্ণ ও শাণিত দৃষ্টিতে দেখিয়াই গিয়াছেন, আর অবসরমত কৌশলে তাহার প্রতি শ্লেষ প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু প্রসাদের দৃষ্টি ছিল প্রেমসিক্ত। যেহেতু সে সমাজের দোষ-গুণ, উন্নতি-অনুন্নতি, দৈন্য বা ঐশ্বর্য্য—সকলই সেই মায়েরই লীলাবৈচিত্র্য প্রসাদ সে জীবনের প্রতি সমবেদনা জানাইয়াছেন, তাহার ক্ষতে প্রীতির প্রলেপ বুলাইয়াছেন। প্রসাদীসঙ্গীতে অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালী জীবন সমগ্রভাবে মূর্ত্ত। ধনী-নির্ধন, অভিজাত-অনভিজাত—সমাজের সকল স্তরের জীবনই চিত্রিত এবং সর্ব্বত্রই একই প্রীতিময় সহানুভূতি ও সমবেদনার স্পর্শ সুস্পষ্ট। প্রসাদের এককেন্দ্রিক জীবনদৃষ্টি সমাজ ও জীবনের সকল অবস্থার ভিতরেই সন্ধান করিয়াছে একটি মাত্র

ধ্যানের—সে ধ্যান মাতৃশক্তির প্রকাশ। ভারতচন্দ্রের দৃষ্টিতে এই ধরণের কোন সুদৃঢ় প্রত্যয় বা বিশ্বাস ছিল না। সেইজন্যই ভারতচন্দ্রের সমৃদ্ধ সাহিত্যে জীবনের কোন গভীরতর ইঙ্গিত নাই; আদর্শের কোন প্রেরণা নাই, আবেগের গভীর কোন স্পর্শ নাই, রামপ্রসাদের আদিপর্ব্বের রচনা বিদ্যাসুন্দর ও কৃষ্ণকীর্ত্তনও প্রায় তাহাই, এগুলি কালপ্রচলিত শিক্ষাদীক্ষারই প্রতিফলন। কিন্তু প্রসাদীসঙ্গীত অন্য স্তরের বস্তু, সে স্তরে কাব্যচর্চ্চা বা পাণ্ডিত্যের বা সাহিত্যরসের প্রশ্ন অবান্তর। এই স্তরে আছে আশা ও বিশ্বাসের, সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আনন্দময় প্রকাশ, এবং তাহারই ভিতর দিয়া প্রাকৃত জনচিত্তে আশা ও বিশ্বাসের সঞ্চার, জীবনের নূতন ইঙ্গিত। অষ্টাদশ শতকের মধ্যপাদের বাঙালী-জীবনের ঘনায়মান অন্ধকারে এই আশা, বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের, শক্তিমন্ত্রের উদ্বোধনের প্রয়োজন ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

তৃতীয় অধ্যায়ের পাদটীকা

১। সেনভূমাবভূদ্ রাজা ধন্বন্তরি কুলোদ্ভবঃ।
শ্রীহর্ষস্তস্য তনয়ঃ কমলো বিমলস্তথা॥

কণ্ঠহারকৃত কুলপঞ্জিকা, পৃ. ৪৬

২। কুলীনানাং প্রসঙ্গেঽপি তস্যৈবোচ্চারণং পুরঃ।
স চ গৌড়মহী-পালাৎ পূর্ব্বং লেভে নিজৈ গু´ণৈঃ॥
গজং কনকছত্রঞ্চ ধনং বহুবিধং তথা।
অসৌ ব্রাহ্মণ বৈদ্যেভ্যো গজবাজি ধনানি চ।
দদৌ বহূনি মালঞ্চে স্থিতঃ শ্রেষ্ঠোভিষককুলে।
বিনায়কস্য সেনস্য জজ্ঞিরে তনয়াস্ত্রয়ঃ।
রোষ সেনস্তদীয়াদ্যো ধন্বন্তরি-রথাপরঃ॥

বিনোদলাল সেনগুপ্ত প্রকাশিত চন্দ্রপ্রভা, পৃ. ২২

৩। রোষ সেনাদ জায়ন্ত ষট্ পুত্রাঃ স্বকুলোজ্জ্বলাঃ।
নারায়ণঃ পশুপতি দাঁড়ুসেন তৃতীয়কঃ॥
যো নারায়ণ সেনোঽসৌ নানাশাস্ত্র বিশারদঃ।
ধর্ম্ম কর্ম্ম রতো বাগ্মী বদান্যো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥

নারায়ণাদ জায়েতাং দ্বৌ পুত্রৌ বিশ্ববিশ্রুতৌ ॥
সাণ্ডু সেনো হথ ভরতো ব্রহ্মদত্ত সুতাসুতৌ ॥
সাণ্ডু সেনস্য চত্বারস্তনয়া বিনয়ান্বিতাঃ।
কুমারসেনঃ কাকুৎস্থঃ সরণিঃ শ্রীনিবাসকঃ ॥

চন্দ্রপ্রভা, পৃ. ২২—২৩

ভরত মল্লিক লিখিয়াছেন :—

যঃ কৃত্তিবাসাঃ সরণেস্তনুজস্তস্যাত্মজাঃ পঞ্চবভূবুরেতে।
মৌঢ়েশ্বরীয়স্য চ শূলপাণে র্দাসস্য পুত্রী জঠর প্রসূতাঃ ॥
ত এব পূর্ব্বং ধলহণ্ড গোষ্ঠীং সমাশ্রিতাস্তত্র তদীয় বংশ্যাঃ।
স্থিতাশ্চিরং তে কুলশীলভাজস্তন্নামতোহদ্যাপি মতাশ্চ সর্ব্বে।
আদ্যঃ পশুপতি র্জাতো দ্বিতীয়ো রঘুনন্দনঃ।
রত্নাকর স্তৃতীয়োহভূন্ম ারারিস্ত চতুর্থকঃ ॥

চন্দ্রপ্রভা, পৃ. ৫০

৪। তস্য রত্নাকরস্যৈতে জজ্ঞিরে তনয়াস্ত্রয়ঃ।
আদ্যো নিত্যানন্দ সেনঃ সর্ব্বানন্দ স্ততঃ পরঃ ॥
নিত্যানন্দস্য সেনস্য পুত্রোহভূদ্ বিনয়ান্বিতঃ।
পবিত্রঃ পরমঃ শান্তো নানাগুণ সমন্বিতঃ ॥
যো জগন্নাথ সেনোহসৌ জগন্নাথ পরায়ণঃ।
জগন্নাথস্য সেনস্য জজ্ঞিরে তনয়াস্ত্রয়ঃ ॥
যদুনন্দন সেনোগ্র্যো বৃষধ্বজ ইতঃ পরঃ।
যদুনন্দন সেনস্য জজ্ঞাতে তনয়াবুভৌ ॥
আদ্যো রঞ্জন সেনোহভূৎ দ্বিতীয়ঃ পুরুষোত্তমঃ।
অথ রঞ্জন সেনস্য ষট্ পুত্রা অভিজজ্ঞিরে ॥
গোপীনাথো লোকনাথস্ততো রাজীবলোচনঃ।
পুত্রৌ রাজীব সেনস্য গোপাল জয়কৃষ্ণকৌ ॥
জয়কৃষ্ণস্য সেনস্য পুত্রৌ দ্বৌ রাঘবোহগ্রজঃ।
রামেশ্বরঃ পরো দৈবাৎ গোস্বামিদাস সূনুজৌ ॥
তৎপক্ষে কন্যকাজাতা দত্তা দুর্দৈব দৈন্যতঃ।

জগদীশায় দাসায় কুমারহট্ট বাসিনে ॥
রাঘবো দৈন্যতোঽগৃহ্নাৎ হুসেনপুরবাসিনঃ।
প্রথমং রামকৃষ্ণস্য সরকারস্য কন্যকাম্ ॥
ততশ্চায়ুকুলে রামেশ্বর কন্যাং কুলোচিতম্।
রামেশ্বরোঽপি জগ্রাহ চায়ুরামেশ্বর রাত্মজাম্ ॥

চন্দ্রপ্রভা, পৃ. ৫৩-৫৫

৫। সেই বংশে সমুদ্ভূত ধীর সর্ব্বগুণযুত
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সবলহৃদয় ॥

কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহ, পৃ. ১৮৬

৬। চন্দ্রপ্রভা, পৃ. ২৬৮ ;
রত্নপ্রভা, পৃ. ৫৬

৭। রামপ্রসাদ, পৃ. ৩৩৭-৩৮
অতুলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

৮। রামপ্রসাদ, পৃ. ৩৩৬
অঃ প্রঃ মুঃ

৯। সংবাদ প্রভাকর, ১ পৌষ ১২৬০।

১০। কালীকীর্তন, ১৮৫৫ ভূমিকা পৃঃ ./০।

১১। সা. প. প. ১৩৫২ ১ম, ২য়, সং পৃঃ ৪।

১২। সা. প. প. ১৩৫২ ১ম, ২য় সং পৃ. ৭।

১৩। সংবাদপ্রভাকর, ১ পৌষ, ১২৬০।

১৪। ,, ,, ,,।

১৫। ,, ১ মাঘ ,,।

১৬। 'মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।'
নয়ন থাকতে না দেখলে মন কেমন তোমার কপাল পোড়া,
মা ভক্তে ছলিতে, তনয়া রূপেতে, বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া ॥'

কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহ ২৩ নং

১৭। সা. প. প. ৪৯শ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃঃ ৫৫-৬৩।

১৮। The Hindoos, London, 1822, Vol. II p. 478.
Kalee Keerthunn by Ramprasad a Shoodra (?)
অন্যত্রও (Vol. III, p. 300—1.)

১৯। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সং, পৃ. ৩২৮।

২০। ,, ,, ,, ৩২৯।

২১। সা. প. প. ১৩৫০ পৃঃ ৬২-৬৩।

২২। সংবাদপ্রভাকর ১২৬০, ১লা পৌষ, পৃ. ৬।

২৩। সা. প. প. ১ম, ২য়, সং, ৫২শ বর্ষ, পৃ. ৫।

২৪। ,, ,, ,, পৃ. ৬।

২৫। বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা,
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

২৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় সং পৃঃ ৮৫১।

২৭-২৮। ১২৬০ সালের ১ আশ্বিন, ১ পৌষ, ১ মাঘ এবং
১২৬১ সালের ১ চৈত্র।

চতুর্থ অধ্যায়

বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারা ও ভারতচন্দ্র

অষ্টাদশ শতকে উচ্চকোটি বাঙ্গালী জীবনে একই সঙ্গে সংস্কৃত ও ফরাসী শিক্ষার ধারা প্রবহমান। ধর্ম্মজীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত সংস্কৃত শিক্ষা-দীক্ষা, অন্য দিকে কর্ম্ম বা রাজনৈতিক জীবনে ফারসী জ্ঞান অনেকটা অপরিহার্য্য। শিক্ষিত ও অভিজাত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে এক দিকে সংস্কৃত-শিক্ষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা, অন্যদিকে তেমনি নবাবী আমলে কর্ম্মজীবনের দায়ে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, তাঁহাদের মধ্যে ফারসী ভাষা ও সাহিত্য, মুসলমানী শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারাও সমান প্রবহমান। এইজন্যই সে যুগের উচ্চকোটি জীবনে ব্রাহ্মণ্য ও ফারসী সংস্কৃতির প্রতিফলন। সংস্কৃত তখন এদেশের জীবনের, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ প্রভৃতি শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত জীবনের সাংস্কৃতিক ভাষা ও এই ভাষাই হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে যোগরক্ষার একমাত্র অবলম্বন। সম্ভ্রান্ত ও উন্নত হিন্দুদের সংস্কৃতশিক্ষার মধ্যেই ছিল সুরুচি ও সংস্কৃতির পরিচয়। সুতরাং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনের কার্য্যকলাপ ও আলাপ-আলোচনার মধ্যেও সংস্কৃত শিক্ষাদীক্ষা, ঐতিহ্য ও রীতিনীতি যে এক বিশেষ স্থান পাইবে, তাহা অনায়াসেই অনুমেয়, বিশেষতঃ নাগরসমাজে, রাজসভায়, বিদগ্ধ উচ্চস্তরে এবং পণ্ডিতকুলের মধ্যে।

তবে এই শিক্ষিত বিদগ্ধ সমাজ, সমগ্র নাগরজীবনের অতি নগণ্য অংশ। দরবারী জীবন ও উহার পার্শ্বস্থ জনগণের ভিতরেই এই সাংস্কৃতিক শিক্ষা ও পাণ্ডিত্য সীমাবদ্ধ। এই নির্দ্দিষ্ট জীবনসীমার বাহিরে অশিক্ষা ও অজ্ঞতা অপরিসীম, সে জীবনের ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি একান্ত স্থূল, রুচি অসংস্কৃত ও অমার্জ্জিত। নাগরজীবনের পরিবেশে বর্দ্ধিত ভারতচন্দ্র সমসাময়িক পল্লী-জীবনের সঙ্গে সুপরিচিত না হইলেও নাগরজীবনের এই দ্বিবিধ জীবন প্রকৃতির সহিতই সংশ্লিষ্ট। সাহিত্যে প্রধানতঃ এই সমগ্র নাগরজীবনেই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। তাই তাঁহার সাহিত্যের ভাষা প্রকৃতির মধ্যে একই সঙ্গে পাশা-পাশি গ্রাম্য ও নাগর, স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। এক দিকে যেমন

গম্ভীর ও সমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষা, অপর দিকে তেমনি একান্ত কথ্য বা গ্রাম্য ভাষা—কোথাও আবার ইহাদের অবাধ সংমিশ্রণ। আবার ভারতচন্দ্রের সাহিত্যে কোথাও যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যধারার অত্যধিক প্রাধান্য, তাহাও কিছু বিস্ময়ের বিষয় নহে। কারণ, ভারতচন্দ্রের জন্ম যে কুলে, তাহা পুরুষানুক্রমে অনেকদিন ধরিয়াই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও সংস্কৃতশিক্ষায় প্রভাবিত। ১

আবার অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালী জীবন ও সমাজের উপর মুসলমানী প্রভাব সর্ব্বত্রই লক্ষণীয়—আচার ও রীতিনীতি এবং ভাষায় ও বেশভূষায়। হিন্দুর সামাজিক জীবনের নানা ধারায় মুসলমানী সভ্যতা প্রবিষ্ট এবং তদানীন্তন হিন্দু রুচি ও মনোভাবের নিকট এই ফারসী সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্মান ও সম্ভ্রমের বস্তুই ছিল। কর্ম্ম বা বৈষয়িক জীবনে তখন ফারসী ভাষা উনবিংশ ও বিংশশতাব্দীর ইংরাজী ভাষার মতই প্রভাবশীল এবং ইহাতে ব্যুৎপত্তিলাভ সে জীবনে বৈষয়িক উন্নতিরও একমাত্র উপায়। কবি নিজের জীবনেও তাই প্রথমে ফারসী শিক্ষার পরিবর্ত্তে কেবল সংস্কৃত শিক্ষাগ্রহণের জন্য অগ্রজগণের নিকট তিরস্কৃতই হইয়াছিলেন। বুদ্ধিমান ও কালচরিত্রজ্ঞ ভারতচন্দ্র তাই আপন কাব্যে কালোচিত মুসলমানী পরিবেশসৃষ্টির জন্য নানাস্থানে আরবী ও ফারসী শব্দের ও ইস্‌লামী পরিবেশের বহুল ব্যবহার করিয়াছেন।

সংস্কৃত ধারা ও ভারতচন্দ্র—নাগাষ্টক, গঙ্গাষ্টক ও অন্যান্য কাব্যে ঃ— ভুরসুট বা ভুরিশ্রেষ্ঠী পরগণার এবং আপন কুলের ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতশিক্ষার স্বাভাবিক প্রভাবে ভারতচন্দ্রের সাহিত্যজীবন আগাগোড়াই সংস্কৃত ধারারই অনুবর্ত্তন করিয়া আসিয়াছে। তাঁহার কাব্যের রূপ ও প্রকৃতি সেই সংস্কৃতধারারই উজ্জ্বল সাক্ষ্য। কবির 'গঙ্গাষ্টক ও নাগাষ্টক' উৎকৃষ্ট সংস্কৃতরচনার নিদর্শন। ইহাদের ছন্দের বিশুদ্ধি এবং পদলালিত্য একান্তই সংস্কৃতনিষ্ঠ। 'রসমঞ্জরী'ও মৈথিল কবি ভানুদত্তের রসমঞ্জরী নামক নায়ক-নায়িকা লক্ষণ গ্রন্থের অনুবাদ। বিদূষক এবং বিট চেট ইত্যাদি লক্ষণ এবং শৃঙ্গার রসের ভেদ ও রূপ-বর্ণনায় এ কাব্যে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রভাবও সুস্পষ্ট। মহারাজের প্রতি কবির পত্রখানিও 'অথ পত্রং' অনুরূপ সংস্কৃত নিষ্ঠারই দ্যোতক।

'অবশ্য প্রতিপাল্যস্য শ্রীভারতচন্দ্র শর্ম্মণঃ।
নমস্কৃতীনামানন্ত্যং সবিশেষ নিবেদনং॥

ইত্যাদি।

কবি শেষ জীবনে যে অসমাপ্ত 'চণ্ডীনাটক' রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহারও রূপ ও ধ্বনি কতকাংশে সংস্কৃতময়।

'সংগায়ন্‌যদশেষ কৌতুককথাঃ পঞ্চাননঃ পঞ্চভি-
র্বক্তৈ্র্বাস্থ বিশালকৈ ৰ্ডমরু কোথানৈশ্চ সংনৃত্যতি।'
ইত্যাদি।

মূল অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর কাব্যেরও ভাষা ও ভাবাদর্শ বিভিন্ন প্রাচীন সংস্কৃতশাস্ত্র ও কাব্য হইতেই সংগৃহীত। কোন কোন চরিত্রের আদর্শও প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্য হইতে গৃহীত।

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে কুটনী চরিত্রটিই সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয়। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে অনেক প্রাচীন সংস্কৃত কবিই এ জাতীয় চরিত্রের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড়ের মন্ত্রী কবি দামোদরগুপ্ত 'কুট্টনীমতম্' নামে একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, মৃচ্ছকটিক নাটকেও এই জাতীয় চরিত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র-রচিত 'সময় মাত্রিকা' গ্রন্থে এই শ্রেণীর রমণীচরিত্র অত্যন্ত সুলভ। মনে হয়, সংস্কৃতশাস্ত্র ও সাহিত্যের আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট ভারতচন্দ্র এই সকল চরিত্রের সহিত সুপরিচিত ছিলেন। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একাধারে সংস্কৃত, ফারসী এবং বাংলা ও হিন্দি ভাষায় সুদক্ষ ভারতচন্দ্র এ সকল চরিত্রের অল্পবিস্তর আভাষ সংস্কৃতকাব্য ও সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে 'গোলেব কাওয়ালী', 'লায়লা মজনু', 'জেলেখা' প্রভৃতি ইস্‌লামী কাব্য নাটকাদি হইতেও সংগ্রহ করিতে পারেন। কুটনী ব্যতীত তাঁহার সমগ্র রচনার কোন কোন পাত্র-পাত্রীর চরিত্রেরও মূল পূর্ব্বের নানা সংস্কৃত কাব্য বা নাটক।

চরিত্রচিত্রণ ছাড়া অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর কাব্যের ভাষাসৃষ্টি ও ভাব-কল্পনার মধ্যেও সংস্কৃতসাহিত্যের প্রভাব অনেক স্থলেই অতি স্পষ্ট। ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের স্বল্পাক্ষর, অথচ অর্থবহ গাঢ়রচনায় রসজ্ঞ; তাঁহার গভীর অর্থসংকেতময় সংক্ষিপ্ত প্রবচনগুলির মধ্যে সংস্কৃত রচনা, রীতি ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

ক। 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন'।
খ। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'।
গ। 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়'।

এই সকল প্রবচন সংস্কৃতের আদর্শেই রচিত।

'অন্নদামঙ্গলের প্রথমভাগের অন্তর্গত 'শিবনামাবলী' 'হরিনামাবলী' 'শিবব্যাসে কথোপকথন' ইত্যাদি অংশ শুধু সংস্কৃতস্পৃষ্টই নয়, সংস্কৃতভাষিতই বলা চলে।

আবার অন্নপূর্ণা কিংবা বিদ্যার রূপবর্ণনায় দেখি, অত্যুক্তিমূলক নৈষধীয় অথবা বাণভট্টীয় পদ্ধতি প্রমূর্ত্ত।

'কোটি শশী জিনি মুখ কমলের গন্ধ।
ঝাঁকে ঝাঁকে অলি উড়ে মধুলোভে অন্ধ॥
ভুরু দেখি ফুল ধনু ধনু ফেলাইয়া।
লুকায় মাজার মাঝে অনঙ্গ হইয়া॥

অন্নপূর্ণার রূপবর্ণনা।

'বিননিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥
কে বলে শারদ-শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥

বিদ্যার রূপ বর্ণনা।

কি নারী, কি পুরুষ, ভারতচন্দ্রের কাব্যের রূপবর্ণনার সর্ব্বত্রই সংস্কৃতসাহিত্যের আদর্শে এইরূপ ব্যতিরেক অলঙ্কারের মালা গাঁথা।

ভাষা বা রচনারীতির মধ্যে এইরূপ সংস্কৃতপ্রভাব ব্যতীত কবির কাব্যের অনেক অংশই নানা সংস্কৃত কাব্য, নাটক ও পুরাণের দ্বিতীয় সংস্করণ বলিয়াই মনে হয়। কবির কাব্যজীবনে সংস্কৃতধারার ঐকান্তিক প্রভুত্বপ্রদর্শনের জন্য এখানে অনুরূপ কয়েকটী অংশের উদ্ধার করিতেছি।

ক। নষ্ট নই নষ্ট সঙ্গে হয়েছে মিলন।
রাবণের দোষে যেন সিন্ধুর বন্ধন॥

অ. মঃ. পৃ. ২৯৫

'দশাননো হরেৎ সীতাং বন্ধনং স্যান্মহোদধেঃ'।

পঞ্চতন্ত্র

খ। বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্দ্ধেক চাষ
রাজসেবা কত খচ মচ।

অ. ম. পৃ. ৭৬

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥

গ। চাঁদের মণ্ডল বরিষে গরল
চন্দন আগুন কণা।
কর্পূর তাম্বুল লাগে যেন শূল
গীত নাট ঝন ঝনা

অ. ম. পৃ. ২২৭

তব কুসুম-শরত্বং শীতরশ্মিত্বমিন্দোর্দ্বয়মিদম যথার্থং,
দৃশ্যতে মদ্‌বিধেষু।
বিসৃজতি হিমগর্ভৈরগ্নিমিন্দুর্ময়ূখৈস্তমপি কুসুমবাণান্‌
বজ্রসারী করোষি।

অভিজ্ঞানশকুন্তল ৩।৩

ঘ। বরমিহ গঙ্গাতীরে শরট করট।
ন পুনঃ গঙ্গার দূরে ভূপতি প্রকট॥

অঃ মঃ ৩১৪

বরমিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ কৃশঃ শুনীতনয়ঃ।
নশপুন দূ‍র্‌রতরস্থঃ করিবরকোটীশ্বরো নৃপতিঃ॥

বাল্মীকি রামায়ণ, গঙ্গাস্তব পৃঃ ১৭৮

ভারতচন্দ্রের সমগ্র কাব্যের নানা অংশে সংস্কৃত কাব্য, নাটক ও পুরাণাদির ভাষা ও ভাবাদর্শের এইরূপ অবিকল অনুকরণে মনে হয় ভারতচন্দ্রের সাহিত্যিক ভাবনা-চিন্তা এবং ধ্যান-কল্পনা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রশস্ত রাজপথেই অনুক্ষণ আনাগোনা করিত।

মনে হয়, সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে কবিমনের পরিচয়টি ছিল একান্ত নিবিড়, সহজ ও স্বাভাবিক, আর এই সকল সংস্কৃত সাহিত্যের আদশের ভাব ও ভাষান্তর দেখিলে এ ধারণাও না আসিয়া পারে না যে, সাহিত্যের মৌলিক গভীর উৎস হইতে দূরে সরিয়া সংস্কৃত ঐতিহ্যের যথাযথ ও কৌশলপূর্ণ অনুকৃতির দিকেই ভারতচন্দ্রের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল বেশী। বস্তুতঃ সংস্কৃত ভাষিতকে বাংলায় রূপান্তরের মধ্যে কবির যেন ছিল এক অপূর্ব্ব বিজয়-আনন্দ। এই রূপান্তর ক্ষমতার আনন্দাতিশয্য এক এক সময় এত উগ্র হইয়া উঠিত যে, কবি স্থানে স্থানে ভাব ও ভাষারূপ ব্যবহারের খাতিরে সাহিত্যের ভাষার মধ্যে সঙ্গতি, সামঞ্জস্যও হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

ক। 'মা ভৈষীঃ মা ভৈষীঃ বেটা তোরে বা বধিবে কেটা
তবে আজি করিব প্রলয়'।

খ। 'একে আরম্ভিতে হয় আর অবসর
ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট ন পূর্ব্ব ন পর ॥'

গ। 'অলঙ্ঘ্য দেবীর বাক্য অন্যথা না হয়।
ভবিতব্যং ভবত্যেব গুণাকর কয় ॥'

ভারতচন্দ্রের মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি, পণ্ডিত ও কুশলী শব্দশিল্পী যে শব্দ-যোজনার অভাবে সাহিত্যের ভাষাগত এই অসঙ্গতি বা অসৌষ্ঠব ঘটাইয়াছেন তাহা ঠিক মনে হয় না। সম্ভবতঃ কবি আপনার ভাষা ও রূপদক্ষতার অপূর্ব্ব শক্তি উপভোগের জন্যই ভাষাকে আপন শক্তিক্রীড়ার ক্রীড়নক করিয়া যেমন খুসী তেমন করিয়া ভাঙ্গিয়াছেন গড়িয়াছেন।

কাব্যের ভাষা ও রচনারীতি এবং ভাব ও চরিত্রচিত্রণ ছাড়া অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরের প্রায় যাবতীয় ছন্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগেও এই সংস্কৃত আদর্শ ও ধারার একান্ত প্রভাব আগাগোড়াই লক্ষ্য করিবার যোগ্য।

কবি যে সকল ছন্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ভুজঙ্গপ্রয়াত, তূণক, তোটক, দিগক্ষরা একাবলী ও মালিনী এইগুলি বিশেষ করিয়া সংস্কৃতমূলক।

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গাঘোর বাজে ॥—ভুজঙ্গপ্রয়াত।
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে।
হুম হাম থুম থাম ভীম শব্দ ভাষিছে।—তূণক।
রতিরঙ্গরণে মজিলা দুজনে
দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভণে ॥—তোটক।
বিমল-ধবল-লীলা শম্ভুমৌলৌ বিলোলা।
প্রবল-জল-বিশালা স্বর্জনে স্বর্ণমালা ॥
মদন-দহন-কাঙ্গা স্বর্গ সোপান সঙ্গা।
কলুষহরতরঙ্গা ভারতং পাতু গঙ্গা ॥—মালিনী

ছন্দের মত ভারতচন্দ্রের উপমা, রূপক, দৃষ্টান্ত, অর্থান্তরন্যাস, অতিশয়োক্তি ব্যতিরেক, তুল্য-যোগিতা বিশেষোক্তি, অপ্রস্তুত-প্রশংসা, সমাসোক্তি, বিরোধ,

অনুপ্রাস, যমক ও শ্লেষ প্রভৃতি নানা শব্দ ও অর্থালঙ্কার ও সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র-নিষ্ঠার উৎকৃষ্ট পরিচয়। এই সকল অলঙ্কারের শাস্ত্রসঙ্গত নিখুঁত ব্যবহার ও ভঙ্গিমা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র ও উহার আদর্শের প্রতি কবির একান্ত শ্রদ্ধাই জ্ঞাপন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে এইরূপ দুই চারিটি অলঙ্কারের ব্যবহার দেখাইতেছি।

বসিয়া চতুর করে চাতুরীর সার।
অপরূপ দেখিনু বিদ্যার দরবার।
তড়িৎ ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণ চাঁদে।

—অতিশয়োক্তি।

সুয়া যদি নিমদেয় সেও হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনিদেয় নিম হন তিনি।

—অপ্রস্তুত-প্রশংসা।

অভাগা যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।
হেদে লক্ষ্মী হলো লক্ষ্মীছাড়া।

—অর্থান্তর ন্যাস।

কহে একজন যায় মোর মন এ নব রতন ভুবন মাঝে।
বিরহে জ্বলিয়া সোহাগে গলিয়া হারে মিলাইয়া পরিলে সাজে॥
আর জন কয় এই মহাশয় চাঁপা ফুলময় খোঁপায় রাখি।
হলদী জিনিয়া তনু চিকনিয়া স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি॥

—সমাসোক্তি।

কপাটেতে খিল আঁটা দেখিতে কে পায়।
ডেকে ভুলাইয়া ভৃঙ্গ পদ্মমধু খায়॥

—দৃষ্টান্ত ২

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ধারা ও ভারতচন্দ্র

পাঁচালী কাব্য ও ভারতচন্দ্র

যতটা জানা যায়, প্রাচীন বাংলা কাব্য ও কবিতা মাত্রই কোন না কোন রাগিনী সহযোগে গান করা হইত, এবং এই গীতধর্ম্মী যাবতীয় কাব্যই পাঁচালী বা মঙ্গলগান[৩] নামে পরিচিত ছিল। এই সকল পাঁচালী কাব্য কতকগুলি পালায় বিভক্ত। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে উদ্ভূত পীরমাহাত্ম্য পাঁচালীগুলি মোটের উপর

তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত—'প্রথম ভাগ আনুষ্ঠানিক ও সংক্ষিপ্ত। দ্বিতীয়ভাগ উপকথামূলক। তৃতীয় ভাগ মুসলমানি ভাবসিক্তকাহিনীমূলক[৪]। সমগ্র পীরমাহাত্ম্য কাব্যের মধ্যে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পাঁচালীই প্রধান, এবং সাধারণ পাঁচালী হইতে সত্যপীরের পাঁচালী আবার একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির।

প্রথমতঃ, অন্যান্য পাঁচালীগুলি সাধারণ গৃহস্থঘরের নিত্যপাঠ্য বস্তু ছিল। কিন্তু সত্যপীরের পাঁচালী বিশেষ তিথিতে বিশেষ অনুষ্ঠানেই গীত বা পঠিত হইত।

দ্বিতীয়তঃ, ইহার আয়তন অন্যান্য অনেক প্রাচীন পাঁচালী হইতে ক্ষুদ্র এবং অন্যান্য পাঁচালীর মত সত্যপীরের পাঁচালী কতকগুলি পালায় বিভক্ত নয়।

আবার সাধারণ পাঁচালীর ধর্ম্ম বা বিষয়বস্তু হইতে ইহার ধর্ম্মও স্বতন্ত্র। ইহার মধ্যে যে দেবতার পূজা বিহিত, হিন্দু ও মুসলমান এই দুই পৃথক ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের মিলনসাধনই তাঁহার লক্ষ্য। পরস্পর সম্পর্ক-বিশিষ্ট এই দুই প্রবল ও পৃথক জাতির সমন্বয়সাধনই সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ ঠাকুরের ধর্ম্ম, কিন্তু অন্যান্য পাঁচালীর মধ্যে জাতি বা ধর্ম্মগত এইরূপ কোন সমন্বয়ের প্রচেষ্টা নাই।

সাধারণভাবে সত্যপীরের পাঁচালীর যে পরিচয় ভারতচন্দ্রের আগে ও পরে আমাদের দৃষ্টিগোচর, ভারতচন্দ্রের পাঁচালীটি তাহা হইতে একটু ভিন্ন প্রকৃতির।

প্রথমতঃ ইহার আয়তন অন্যান্য সত্যপীরের পাঁচালী হইতে বিশেষ সংক্ষিপ্ত।

অন্যান্য পাঁচালীর সহিত ইহার ভাষাগত পার্থক্যও লক্ষণীয়। পাঁচালীর ভাষা একান্ত সহজ ও সরল গ্রাম্য ভাষা। সাধারণ জীবনের সুখদুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত এ ভাষার একটা প্রাণের যোগ আছে। জীবনের নানা সমস্যা ও অভাব-অভিযোগের প্রতিকার মানসে দেবতার নিকট অকপট হৃদয়ে আত্ম-নিবেদনও পাঁচালীর এই সহজ ও সজীব ভাষার ধর্ম্ম। কিন্তু ভারতচন্দ্রের সত্যপীরের পাঁচালীর ভাষায় ঐ সহজ সারল্য অনুপস্থিত; সে ভাষা ফারসী ও সংস্কৃতনিষ্ঠ পণ্ডিতের ভাষা। যে দেবতার পূজার জন্য এই পাঁচালী, সেই দেবতার প্রতি কোন শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠা, আত্মনিবেদনের কোন আবেগের স্পর্শও সেই ভাষা বা কাব্যরূপের মধ্যে নাই। আবার প্রাচীন পাঁচালী কাব্যের অনেকগুলিই যেমন কালক্রমে মঙ্গলকাব্যে পর্য্যবসিত,[৫] ভারতচন্দ্রের সত্যপীরের এই পাঁচালী মঙ্গলকাব্যে পরিণতির সম্ভাবনা বর্জ্জিত বলিলেই চলে। এইভাবে প্রাচীন পাঁচালীনামক সাধারণ কাব্য হইতে ভারতচন্দ্রের পাঁচালী-কাব্যের প্রকৃতিগত পার্থক্য নানাভাবেই অনুভব্য।

ভারতচন্দ্রের পাঁচালীর আকৃতি ও প্রকৃতিগত এই বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় প্রাসঙ্গিক-ভাবেই কবির রচনার যথার্থ উদ্দেশ্যের আলোচনা আসিয়া পড়ে। অন্যান্য পাঁচালী কাব্যের মত দৈবমাহাত্ম্য কীর্ত্তন অথবা কাব্য কাহিনীর সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিচয় এবং আর্ত্ত বা বিপন্ন জীবনের প্রতি মমতাপ্রকাশ, ভারতচন্দ্রের কাব্যরচনার উদ্দেশ্য নহে। সমসাময়িক জীবন ও তৎসংপৃক্ত দেবদেবী কাহিনী ইত্যাদির সঙ্গে কবি-হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও বিশেষ ছিল না, প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মে বিশ্বাসও বোধ হয় ছিল কিছুটা শিথিল। এই পাঁচালী-কাব্যটি রচনায় কবির যাহা মূল ও মুখ্য প্রেরণা, তাহা হইতেছে, আপনার ও আপন কুলের পরিচয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাবত্তা ও শিল্পদক্ষতার পরিচয়ও বটে। এইখানেই ভারতচন্দ্রের সঙ্গে অন্যান্য পাচালীকারের রচনাপ্রকৃতির পার্থক্য। পূর্ব্বে পাঁচালী রচনার এমন আড়ম্বরময় ব্যক্তি বা কুলপরিচয়ের সাক্ষ্য মিলে না। অন্যান্য পাচালীর যেটি মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ কাব্যকাহিনী ও তাহাকে আশ্রয় করিয়া বিশিষ্ট দেবদেবীর প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসের সঞ্চার, দেবদেবীর মাহাত্ম্যকীর্ত্তন, সাধারণ জীবনের সুখদুঃখের পরিচয়, ভারতচন্দ্রের কাব্যে এ সমস্তই একান্ত গৌণ বস্তু।

মঙ্গলকাব্য ও ভারতচন্দ্র

প্রাচীন পাঁচালী সাহিত্যগুলিই কালক্রমে বিশেষ সামাজিক মর্য্যাদা লাভ করিয়া মঙ্গলকাব্যে পরিণত হইয়াছে।[৬] তাই আজও অনেক মঙ্গলকাব্যকারের ভণিতায় মঙ্গলকাব্য শব্দের পরিবর্ত্তে পাঁচালী কথার উল্লেখ দেখা যায়।[৭] বস্তুতঃ মঙ্গলকাব্যগুলি এদেশের বাংলাপুরাণ ছাড়া আর কিছুই নহে। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যে বিবিধ মহাপুরাণ ও উপপুরাণগুলি যে উদ্দেশ্যে রচিত হয়, এই বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিও সেই উদ্দেশ্যেই সর্ব্বপ্রথম রচিত হইতে আরম্ভ করে। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্তই এই মঙ্গলকাব্যের কাল। সংস্কৃতপুরাণ বা বাংলা মঙ্গল-কাব্য উভয়েতেই আছে শুধু দীনহীন মানবশক্তির উপর দেবশক্তির প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা। উভয়ত্রই দৈবশক্তির কাছে জৈবশক্তি, অপমানিত তিরস্কৃত ও লুণ্ঠিত। মঙ্গলকাব্যের সর্ব্বত্রই দেখা যায়, ছলেবলে বা কৌশলে দৈবশক্তি মানবশক্তিকে দলন করিয়া চলিয়াছে, আর কবির লক্ষ্য শুধু নানা ভঙ্গীতে সেই দৈবশক্তির স্তুতি ও মহিমাকীর্ত্তন, এবং মানবশক্তির দীনতা ও দুর্ব্বলতার কাহিনীবর্ণন। যেখানে পুরুষের পৌরুষ এবং নারীর নারীত্ব ও মাতৃত্ব এমন করিয়া অবজ্ঞাত ও তিরস্কৃত,

সে কাব্য কেমন করিয়া যুগযুগান্তরে মানবসমাজে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পদ হইতে পারে? কেমন করিয়া তাহা সুসভ্য, আত্মসচেতন ও পৌরুষাভিমানী মানবের পূজা ও শ্রদ্ধা পাইবে? তাই সংস্কৃতপুরাণের মত বাংলার এই মঙ্গলকাব্যের ভাব ও আদর্শ উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর মানবজীবনে তেমন প্রভাবশীল মনে হয় না। আজও মঙ্গলকাব্যের প্রতি মানবমনের যা কিছু প্রীতি ও আকর্ষণ, তা কেবল কাব্যের সেই সকল অংশেই, যেখানে মানবশক্তি ও মহিমার উপর কবির শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম প্রকাশ পাইয়াছে।

যাহা হউক, এই মঙ্গল সাহিত্য একান্তভাবেই সাম্প্রদায়িক। শৈব, শক্তি ও বৈষ্ণব, মঙ্গলকাব্য মোটের উপর এই তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং সমগ্র মঙ্গল সাহিত্যকে প্রধানতঃ তিনটি যুগ বা কালে ভাগ করা যায়।

প্রথম—উদ্ভব বা উৎপত্তির যুগ।

দ্বিতীয়—সৃষ্টি বা গঠনের যুগ।

তৃতীয়—পরিণতির যুগ।

ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের এই পরিণত বা শেষ পর্য্যায়ের কবি। মঙ্গলকাব্যের এই পরিণতির যুগকে ঐশ্বর্য্যের যুগও বলা চলে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরের যাহা প্রথম ও প্রধান পরিচয়, তাহা কাব্যের এই ঐশ্বর্য্য।

কবিকঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গল ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল

ষোড়শ শতাব্দীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যই প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্নদামঙ্গলে পরিণত, এই ধারণা আমাদের মধ্যে অনেকটা বদ্ধমূল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে চণ্ডীমঙ্গলের আদর্শেই ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল রচনা করেন, কাজেই এই পরবর্ত্তী কাব্য আকারে প্রকারে অনেকটা পূর্ব্বকাব্যেরই দ্বিতীয় সংস্করণ, এ সংস্কার আমাদের অনেকদিন হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কি পৌরাণিক কাহিনীতে কি ইহার লৌকিক অংশে, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল যে দুইশত বৎসরের পরবর্ত্তী কাব্য, ইহা যে অনেকটা ভিন্নযুগ, ভিন্নরূপ সংস্কার ও পৃথক রুচির প্রেরণায় রচিত, তাহা যে কোন মননশীল পাঠক, যে কোন তত্ত্বানুসন্ধী বা সত্যজিজ্ঞাসুর নিকট ধরা না পড়িয়া যায় না।

মুকুন্দরামের যুগ একান্তই দৈবনির্ভরতার যুগ। মানুষ তখন সুখে দুঃখে, দুর্দ্দিনে সুদিনে কেবলই দৈবানুগ্রহের অপেক্ষায় থাকিত। আপন বলে, স্বীয়

প্রচেষ্টায় যে সে কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারে, এ বিশ্বাস, আত্মশক্তিতে এই আস্থা তাহার তেমন জন্মে নাই। তাই, কি 'কালকেতু-ফুল্লরা' কি 'ধনপতি সওদাগরের উপাখ্যান' সর্ব্বত্রই দেখি, উঠিতে বসিতে, চলিতে ফিরিতে দৈবশক্তি ছাড়া গত্যন্তর নাই। মানুষ কেবল দেবতার ক্রীড়নকমাত্র। এই দৈবভয়, দৈববিশ্বাস ও দৈবনির্ভরতাই মুকুন্দরামের যুগের বিশেষ রূপ ও ধর্ম্ম। তাই মুকুন্দরামের কাব্যের লক্ষ্যই কায়মনোবাক্যে চণ্ডীর ধ্যান, চণ্ডীর জ্ঞান ও চণ্ডীর আরাধনা। কাব্যের যাবতীয় কাহিনীই কেবল ঘুরিয়া ফিরিয়া এই মূল বিষয়কে একান্তভাবে কেন্দ্র করিয়া আছে। পুরুষের পৌরুষ, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব দৈবশক্তির কাছে তখন একান্ত লাঞ্ছিত, ধিক্কৃত ও বিড়ম্বিত। এই দৈবপরিচালিত মানব-জীবনে প্রতিপদেই ভয়, ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট দেবতার অভিশাপের ও দৈবপ্রবঞ্চনার, আর এই ভয়, শঙ্কা ও ত্রাসে পুরুষের পৌরুষ সদাই যেন সঙ্কুচিত, ত্রস্ত ও বিপর্য্যস্ত। মুকুন্দরামের কাব্যের আগাগোড়াই তাই দেখি এই দৈবভয়বিড়ম্বিত মানুষের চণ্ডিকা আরাধনা।

কিন্তু ভারতচন্দ্রের যুগ ঠিক এই দৈবভয় বিপর্য্যস্ত প্রতিনিয়ত দৈবমুখাপেক্ষী মানবজীবনের চিত্র নহে। যদিও দৈব ও লৌকিক, নানা বিঘ্ন বিপত্তিতে সামাজিক, ধর্ম্মনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন এক্ষণে বিপন্ন, তবু দেখি, ষোড়শ শতাব্দীর মানব চরিত্রের মত ঠিক ততখানি দৈবে আত্মসমর্পণ এখানকার মানব চরিত্রে আর নাই। 'ব্যাসকৃত গঙ্গাতিরস্কার', 'ব্যাসের তপস্যায় অন্নদার চাঞ্চল্য' ইত্যাদি কাব্যাংশের পুরুষের পৌরুষ; মানুষের মনুষ্যত্ব অনেকটা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

> "যে হোক সে হোক আরো করিব যতন।
> মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন॥"

ইত্যাদি অংশে এই যুগের এই বিশেষ মানবীয় শক্তির চেতনার লক্ষণই ধরা পড়ে। ইহাই মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের যুগধর্ম্মের বৈলক্ষণ্য। মুকুন্দরামের অঙ্কিত চণ্ডীমূর্ত্তি এবং ভারতচন্দ্রের অঙ্কিত অন্নদার মূর্ত্তির বৈসাদৃশ্যেরও মূলে এই যুগোচিত রুচি, বিশ্বাস ও মানস প্রবণতার পার্থক্য। মুকুন্দরামের চণ্ডিকা-আরাধনা, চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন অনেকটা জীবনের দায়ে, অস্তিত্বের দায়ে। লোকের তখন দৃঢ় বিশ্বাস, চণ্ডী সর্ব্বভয়নাশিনী, সর্ব্বসুখদাত্রী, তাই তখনকার জীবন চণ্ডিকাময়।

কিন্তু ভারতচন্দ্রের অন্নদা এই দায়গ্রস্ত, ভীত ত্রস্ত ভক্তের দেবতা নহেন। একেই এখনকার যুগের মানসপ্রকৃতি ভিন্নরূপ, তাহার উপর নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের তো কথাই নাই। কোনরূপ অভাব, আর্ত্তি বা পীড়নের বালাই তাঁহার ছিল না। জীবন, ধন বা মানরক্ষার খাতিরে তিনি অন্নদার শরণাপন্ন হন নাই। তাঁহার এই অন্নদাপূজা অনেকটা রাজসিক ব্যাপার। রাজভয়, লোকভয়, দৈবভয় এসকল কোন ভয়েরই বিশেষ সম্পর্ক তাঁহার জীবনে ছিল না। এই কারণেই মহারাজের নির্দ্দেশে রচিত ভারতচন্দ্রের অন্নদামূর্ত্তি মুকুন্দরামের চণ্ডিকা-মূর্ত্তি হইতে স্বতন্ত্র বস্তু। চণ্ডীমঙ্গলের আদর্শে ভারতচন্দ্রও অন্নদামঙ্গলের প্রারম্ভে দেবদেবীবন্দনা, 'সৃষ্টি প্রকরণ ও গ্রন্থোৎপত্তি বর্ণনা' এবং 'হরগৌরীর কাহিনী' বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উভয় কাব্য পাশাপাশি রাখিলে এই সত্য অতি সুস্পষ্ট যে, একজনের বর্ণনা বিপত্তারণ, দুঃখহরণ ভগবানের প্রতি অনন্য সহায় দুর্ব্বল মানবের আত্মসমর্পণ, আর অন্যের কাছে দেববন্দনা অনেকটা সখশ্রদ্ধার ব্যাপার, আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদনের বালাই এখানে নাই। মুকুন্দরাম একান্তই আর্ত্ত, বিপন্ন ও অসহায় জনসমাজের বাঙ্‌ময় প্রতিনিধি। দেবমূর্ত্তি অঙ্কনে তাঁহার সাবধানতা, সতর্কতা, ভয় ও ভক্তির তাই এত আয়োজন। গ্রন্থারম্ভেই কবির এই বিশেষরূপ মনঃপ্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্য-রচনায় সঙ্কল্প যে ভিন্ন, সেখানকার আশা আকাঙ্ক্ষা, ভয় ও ভাবনা যে একেবারেই ভিন্নখাতে চলিয়াছে, তাহা তাঁহার গ্রন্থারম্ভের দেবদেবী বন্দনায় বা সৃষ্টিপ্রকরণ বিশ্লেষণে বরাবরই ধরা দিয়া চলিয়াছে। দেবচরিত্র অঙ্কনে, হর-পার্ব্বতীর কাহিনী বর্ণনায়, অনেক স্থলেই অষ্টাদশ শতকের নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার সুস্থ, নিশ্চিন্ত ও বিলাস কৌতুকময় পরিবেশের প্রভাব যেন উঁকিঝুঁকি দিতেছে। দেবাদিদেব মহাদেব যেন কবির সেই বিলাসী ও সৌখীন রুচির ক্রীড়নক মাত্র। সতীও তাঁহার হস্তে পড়িয়া অনেকক্ষেত্রেই আপনার সনাতন ঐশ্বরিক বেশ ছাড়িয়া একান্ত মানবিক বেশ পরিতে বাধ্য হইয়াছেন। দেবদেবী উভয়েই যেন রাজকীয় রুচির তৃপ্তির জন্য স্বর্গীয় প্রকৃতি ভুলিয়া পার্থিব প্রকৃতিতে অবতীর্ণ—শুধু পার্থিব বলিলেই হয় না, যেন নবাবী শাসনের শেষ আমলের সেই ভোগঐশ্বর্য্যময়, বিলাসময় রাজকীয় আবেষ্টনীর উপযোগী চরিত্রেই তাঁহারা আবির্ভূত।

এখন চণ্ডী ও অন্নদামঙ্গলের গ্রন্থারম্ভে দেবদেবীবন্দনায়, সৃষ্টি প্রকরণ বা

হরপার্ব্বতীর কাহিনীতে উভয় কবির এই ভিন্ন দৃষ্টির, স্বতন্ত্র মানসের প্রমাণ প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিতেছি। প্রথমতঃ, দেবদেবীর বন্দনায় দেখা যায়, মুকুন্দরাম অন্যান্য দেবদেবীর সহিত চৈতন্য বন্দনা গাহিয়াছেন, কিন্তু চৈতন্যদেবের লীলাক্ষেত্র নদীয়ায় বসিয়াও ভারতচন্দ্র তাঁহার বন্দনা প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

গ্রন্থ সূচনার পর সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনের পূর্ব্বে মুকুন্দরাম রীতিমত প্রার্থনাদি সারিয়া লইয়াছেন। এ প্রার্থনার মধ্যে কবিহৃদয়ের ঐকান্তিক দৈবে আস্থা, বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা এবং ইহারই সঙ্গে দৈবরোষের আতঙ্ক এবং ত্রাস ও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই অংশ নিতান্তই সংক্ষিপ্ত। চণ্ডিকাব্যের সঙ্গে পাশাপাশি রাখিয়া পড়িলে মনে হয়, আঁটিয়া সাঁটিয়া এত পূজা প্রার্থনা তাঁহার কাছে নিষ্প্রয়োজনই ছিল।

শিবচরিত্রের আখ্যান ক্ষেত্রে মুকুন্দরাম ব্রহ্মারপুত্র ভৃগু কর্ত্তৃক যজ্ঞ সম্পাদনের কথা বলিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যে ইহার কোন প্রসঙ্গই নাই।

পিতা দক্ষের আলয়ে যজ্ঞ দর্শনে যাইবার জন্য শিবের নিকট সতীর অনুমতি প্রার্থনায় শিব বিনা নিমন্ত্রণে যাইবার পক্ষে আপত্তি করেন বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখি, পিতার ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধা সতী সগৌরবে বৃষভারূঢ়া হইয়া সৈন্য-সামন্ত সহকারে পিতৃগৃহে গমন করিলেন এবং ভগিনীগণের সম্বর্দ্ধনা ও মাতৃপ্রদত্ত পাদ্য অর্ঘ্যাদি তাঁহার পরম পরিতৃপ্তি ঘটাইল। কিন্তু অন্নদামঙ্গলকাব্যের এই অংশে সতী ও মহাদেব উভয় চরিত্রেরই সনাতনী দৈবমহিমা একান্তই ক্ষুণ্ণ ও তিরস্কৃত। দেবাদিদেব মহাদেব, যিনি সুখ, দুঃখ, লজ্জা, ভয় সকল অনুভূতির অতীত, তিনি সতীর দশমহাবিদ্যার দুরন্তরূপ দর্শনে ভীত, ত্রস্ত। এবং সেই বীভৎস মূর্ত্তির ছলে সতী একরূপ বলপূর্ব্বকই পতির নিকট হইতে পিতৃগৃহে গমনের সম্মতি আদায় করিয়া ফেলিলেন।

> "মোহিত মহেশ মহামায়ার মায়ায়।
> যে ইচ্ছা করহ বলি দিলেন বিদায়॥
> রথ আনি দিতে শিব কহিলা নন্দীরে।
> রথে চড়ি গেলা সতী দক্ষের মন্দিরে॥"

আবার কালীবর্ণ-সতীকে দেখিয়া মাতার আতঙ্ক সৃষ্টি হইল। এখানে এই ভীত, ত্রস্ত ও হতমান মহাদেব ও ভয়ঙ্করী সতী মূর্ত্তি যে ভারতচন্দ্রের কাছে

মুকুন্দরামের ন্যায় বিপত্তারণ ও বরাভয়দাত্রী ঈশ্বর ঈশ্বরী নহেন, একথা বুঝিতে এমন কিছু একটা তীক্ষ্ণবোধ, বুদ্ধি বা বিচার শক্তির প্রয়োজন হয় না।

ইহার পর দক্ষালয়ে গিয়া সতী পিতাকে প্রণাম করিলেন, এবং পিতাও কন্যাকে দেখিয়া মনে মনে ঠিক সন্তুষ্ট হইতে না পারিলেও সম্বন্ধ সম্পর্কের গুরুত্ব অনুসারে বিধিমত হেটমুণ্ড হইয়া কন্যাকে আশীর্ব্বাদ দান করিলেন—

'দক্ষের চরণে চণ্ডী করিলা প্রণতি।
হেটমুণ্ডে আশীষ করিল প্রজাপতি ॥'

* * * *

চিরজীবী হউক স্বামী সুস্থির সুমতি ॥

কিন্তু অন্নদামঙ্গলে পিতা দক্ষকে সতীব প্রণামের প্রসঙ্গও নাই এবং পিতা কন্যার কালোবর্ণ দেখিবামাত্র রাগিয়া জ্বলিয়া শিবনিন্দায় একেবারে পঞ্চমুখ।

এ চিত্রেও দেখি ভারতচন্দ্রের চণ্ডিকার স্বতন্ত্র ধর্ম্ম। চণ্ডীগতপ্রাণ, অনন্যশরণ কবির ধ্যানের বস্তু তিনি নহেন। আবার পিতা দক্ষের প্রতি কন্যা চণ্ডিকার অভিশাপ এবং পতিনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ, উভয় কাব্যেরই বিষয়বস্তু বটে, কিন্তু এই অভিশাপ বা দেহত্যাগের প্রকৃতিগত বিভেদ বা বৈসাদৃশ্য, উভয় কবির চণ্ডীরূপচিত্রণে এই ভিন্নরূপ মনঃপ্রকৃতিরই সাক্ষ্য দিতেছে। মুকুন্দরামের সতী সোজাসুজি উগ্র রুক্ষভাবে পিতাকে অভিশাপ না দিয়া নন্দীর মারফতেই এই অপ্রিয় কার্য্য সাধন করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের সতী নন্দীর অপেক্ষা রাখেন নাই। আবার দেহত্যাগের ভূমিকাতেও মুকুন্দরাম তাঁহার চণ্ডীর দৈবী প্রকৃতি বা মর্য্যাদা যতদূর সম্ভব বজায় রাখিয়াছেন। তাই দেখি, এখানে সতী যোগাসনে দেহত্যাগ করিতেছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই যোগাসনের কোন প্রয়োজন হয় নাই। মনে হয়, কবি বা কবির সেই বিশেষ সমাজ তখন অনেকটা আপন আসনে প্রতিষ্ঠিত, অনেকটা সুস্থ ও আত্মনির্ভর, তাই দেবীর যোগাসন যোগাইবার কথা মনে জাগে নাই।

উভয় কবির দক্ষযজ্ঞনাশের চিত্রও কবি-মানসের এই সত্যের ব্যতিক্রম নহে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দক্ষযজ্ঞবিনাশে সতী বা মহাদেবের ইঙ্গিত আছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ ধ্বংসের কার্য্যে আছে পিশাচসৈন্য এবং বীরভদ্র, সতী বা মহাদেব অনেকটা দূরে বা অন্তরালে। কিন্তু অন্নদামঙ্গলে শিব স্বয়ং যজ্ঞবিনষ্টা, তাঁহার কোন অনুচর বা মাধ্যমের প্রযোজন হয় নাই।

ইহার পর হর-গৌরীর বিবাহপ্রসঙ্গ। চণ্ডীকাব্যে দেখি মহাদেব গৌরীর তপস্যালব্ধ ধন। তপস্যার জন্য হিমালয়ে আগত মহাদেবের নিকট কন্যার পাণিগ্রহণের জন্য পিতার ঐকান্তিক অনুরোধ অনুনয়ে মহাদেব গৌরীকে তপস্যার অনুমতি দান করেন। গৌরী একান্ত সাধনায় ও তপস্যার বলে যোগীশ্বর মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেন। মুকুন্দরামবর্ণিত এই বিবাহব্যাপারে হরপার্ব্বতী তপস্বী ও তপস্বিনী।

কিন্তু অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র নারদকে সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য হিমালয়ের নিকট পাঠাইয়াছেন। নারদ সোজাসুজি সকল প্রস্তাব পাড়িয়া একেবারে বিবাহের লগ্নপত্র সারিয়া যান। এই বিবাহে যোগ, ধ্যান বা তপস্যার প্রয়োজন করে নাই। কি পিতা হিমালয়, কি কন্যা উমা, কাহারও কাছে মহাদেব তেমন সাধনা আরাধনালব্ধ ধন নহে, অনেকটা না চাহিতে পাওয়ারই মত।

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের এই হরপার্ব্বতী-বিবাহপ্রসঙ্গ উভয় কবির ভিন্নরূপ মানসমূর্ত্তিরই স্পষ্ট সাক্ষ্য। ভারতচন্দ্র অঙ্কিত চরিত্রে অনেকটা লৌকিক প্রভাব এবং মুকুন্দরাম চিত্রিত চরিত্রের দৈবীরূপ দুইশতবৎসরের দুই ভিন্ন কবিমানসের চিত্রই ফুটাইয়াছে এবং এই চণ্ডী চরিত্রের রূপায়ণে দুই জন কবির উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন যে বিভিন্ন, তাহাও বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

'আমার কামনা নাথ করহ সফল।
মোর কন্যা নিত্য দিব কুশ পুষ্প জল ॥
হেমন্তের বচন শুনিয়া পশুপতি।
গৌরীকে করিতে পূজা দিল অনুমতি ॥'

(মুকুন্দরাম)

"নারদ কহিছে ভাগ্য হয়েছে তখনি।
জনক জননী ভাবে জন্মিলা যখনি ॥
(তব ঘরে উমা মাতা আস্যাছে যখনি) ॥
হিমালয় মেনকা যদ্যপি দিলা সায়।
লগ্নপত্র করিয়া নারদ মুনি যায় ॥"

(ভারতচন্দ্র)

পরে আসিল শিবের ধ্যানভঙ্গ ও কামভস্মের পালা। এ চিত্রেও উভয় কবির পরিকল্পিত শিবচরিত্র দুই ভিন্নরূপ জীবনধ্যান ও উদ্দেশ্যেরই উজ্জ্বল প্রমাণ বলিয়া

মনে হয়। মুকুন্দরামের শিবের বিবাহের প্রয়োজন অত্যাচারী তারকাসুর বধ। দেবকুল এই দুর্দ্ধর্ষ অসুরের অত্যাচারে অস্থির ও অতিষ্ঠ। শিবের পুত্র ব্যতীত এই অসুর বধ সম্ভব নয়, তাই বিপদ উদ্ধারের জন্য, জীবনের দায়েই শিববিবাহের প্রস্তাব।

"মহেশের পুত্র হবে নাম ষড়ানন।
পার্ব্বতীর গর্ভে তার হইবে জনম॥
তার রণে তারকের হইবে নিধন।
সভে মিলি শিবের বিবাহে দেহ মন॥"

ভারতচন্দ্রের 'শিবের ধ্যানভঙ্গে' বা শিববিবাহে এইরূপ কোন জৈব প্রয়োজন বা সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্য নিহিত নাই। ইহাতে দেখা যায়, দেবতাগণ শক্তিহীন শিবের বিবাহহেতুই তাঁহার তপোভঙ্গের মন্ত্রণায় রত।

'মন্ত্রণা করিয়া মদনে ডাকিয়া
সুরপতি দিলা পান।
সম্মোহন বাণ করিয়া সন্ধান
শিবের ভাঙ্গহ ধ্যান॥'

মদনবাণে শিবের ধ্যান ভাঙ্গিল, চিত্তের চাঞ্চল্যও দেখা দিল। পার্ব্বতী ঝারিহাতে পাশেই উপস্থিত। চিত্তের ঈষৎ বৈক্লব্যবশতঃ মহাদেব শুধু চারিদিকে চাহিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। মুকুন্দরামের এই ধ্যানভঙ্গের দৃশ্যে দেবাদি-দেবের মৌলিক চরিত্রের তেমন কিছু জঘন্য প্রাকৃত মনুষ্যসুলভ পরিবর্ত্তনই আমাদের চোখে পড়ে না।

"সম্মোহন বাণ বীর পুরিল সত্বরে।
ঈষৎ চঞ্চল হর হইল অন্তরে॥
ধিয়ান ভাঙ্গিয়া হর চারিদিকে চান।
সম্মুখে দেখিল চাপ-ধারী পঞ্চবাণ॥

* * * *

তপোভঙ্গ হৈলে শিব গেলা অন্যস্থান।
পর্ব্বত নন্দিনী গেলা পিতৃ সন্নিধান॥"

কিন্তু অন্নদামঙ্গলে তপস্যানিরত শিবের নিকট পার্ব্বতী সমাগমের কথা নাই এবং মহাদেবের ধ্যানভঙ্গের পরবর্ত্তী চিত্র অষ্টাদশ শতকে নবাবী শাসনের শেষ

আমলের রাজসভার রুচি ও মনঃপ্রকৃতি সম্মত চিত্রই বটে। এখানকার মহাদেব ধ্যানভঙ্গে প্রাকৃত জনের মতই কামজ্বালায় অস্থির ও বিভ্রান্ত।

"মরিল মদন তবু পঞ্চানন
মোহিত তাহার বাণে।
বিকল হইয়া নারী তপসিয়া
ফিরেন সকল স্থানে॥
কামে মত্ত হর দেখিয়া অপ্সর
কিন্নরী দেবী সকল।
যায় পলাইয়া পশ্চাত তাড়িয়া
ফিরেন শিব চঞ্চল॥"

এই কামমত্ত শিবমূর্ত্তিতে আগের দিনের সেই লজ্জাভয়-নিবারণ, বিপদবারণ দেবাদিদেব মহাদেবের ধর্ম্ম কোথায়? চণ্ডী ও অন্নদামঙ্গলের এই চিত্রাংশে একত্র যে সংযম, সঙ্গতি ও সুরুচি এবং অন্যত্র ইহার যে শোচনীয় ব্যতিক্রম—ইহাই এই সম্পূর্ণ তুই ভিন্নযুগ ও ভিন্ন সমাজজীবনে দেবচরিত্রের যথার্থ স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে।

মদন ভস্মের পর শিব হিমালয় ত্যাগ করিলেন। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে এইখানে দেখি 'গৌরীর তপস্যা'। দিনের পর দিন কঠোর হইতে কঠোরতর তপস্যার ভিতর দিয়া, আত্মশোধনের ভিতর দিয়া গৌরী মহাদেবের অনুগ্রহলাভে যত্নপর। শেষে বৃক্ষের গলিত পত্রটুকু ভোজনও ত্যাগ করিয়া 'অপর্ণা' আখ্যা লাভ করিলেন, শঙ্কর ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহাকে ছলনা করিতে আসিলেন—

"বৃক্ষের গলিত পত্র করিল ভোজন।
শিবপদ ধ্যান গৌরী করে অনুক্ষণ॥
ত্যজিল বৃক্ষের পত্র ত্যজি অন্নপান।
এই হেতু অপর্ণা হইল অভিধান॥
ছলিতে আইলা হর দ্বিজবেশধর।
জিজ্ঞাসিল শিব, গৌরী দিলেন উত্তর॥"

অন্নদামঙ্গলকাব্যে গৌরীর ধ্যান জপ তপস্যার নাম গন্ধও নাই। এখানকার গৌরীকে যেমন আরাধনায় মহাদেবকে প্রথমে পাইতে হয় নাই, এখানেও

তেমনি মদন ভস্মের পরই দেখি শিববিবাহের ধুমধাম পড়িয়া গেল। এই অংশেও দেবচরিত্র সম্বন্ধে দুই কবির দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য উপেক্ষণীয় নহে।

হর-পার্ব্বতীর বিবাহের চিত্রটিও উভয় কবির মানস প্রকৃতির এই একই সত্যের সাক্ষ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। চণ্ডীকাব্যের হিমালয় শিবের সহিত বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত। কাজেই বিবাহ আসরে তিনি জামাতা মহেশ্বরকে পরম যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত বরণ করিয়া লইলেন, একেবারে হাত ধরিয়া বরের আসনে লইয়া বসাইলেন—

"আইলা ত্রিপুরারি হেমন্ত হাথে ধরি,
বসাল্য কনক আসনে।
বসন অঙ্গুরী মালা করে করি
করিল বরের বরণে॥"

অন্নদামঙ্গলে দেখি একেবারেই ভিন্ন চিত্র। জামাতা শিব এখানে হিমালয়ের অপরিচিত। হিমালয় জামাতাকে দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন এবং দিশেহারা হইয়া সোজাসুজি বরের আসনে নিজেই গিয়া বসিলেন—

"হেনকালে বর আসি কৈলা অধিষ্ঠান।
সম্ভ্রমে উঠিয়া সবে কৈলা অভ্যুত্থান॥
বর দেখি হিমালয় হৈলা হতবুদ্ধি।
ভূতগণে দেখিয়া উড়িল ভূতশুদ্ধি॥
কহিতে না পারে দক্ষযজ্ঞ ভাবি মনে।
ভুলিয়া বসিলা গিরি বরের আসনে॥"

চণ্ডিকামঙ্গলের মেনকা জামাতা মহেশ্বরকে পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। জামাই বরণ করিতে আসিয়া অস্থি-ভস্ম-বিভূষণ-কলেবর দেখিয়া তিনি একেবারে বিরস-বদন হইয়া পড়িলেন এবং স্বাভাবিক বাৎসল্যবশতঃ অশ্রুপাত করিয়া কন্যার ঐরূপ বরলাভের জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন—

"চরণে নূপুর সাপ সাপ কটিবন্ধ।
বাঘছাল পরিধান দেখি লাগে ধন্ধ॥
অঙ্গদ-কঙ্কণ-সাপ সাপের পইতা।
চক্ষু খায়্যা হেন বরে দিলাম দুহিতা॥"

কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যের এই অংশের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যও বেশ লক্ষণীয়। কবি নারদকে উপলক্ষ করিয়া এখানকার চিত্রে বেশ খানিকটা কৌতুক বা রঙ্গরসের সৃষ্টি করিয়াছেন।

"কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।
নখে নখ বাজায়ে নারদ মুনি হাসে॥
* * * *
নারদের মন্ত্র তন্ত্র না হয় নিষ্ফল।
পরস্পর এয়োগণে বাজিল কন্দল॥"

বিবাহ আসরে এয়োগণের এই কন্দলের মারফতে ভারতচন্দ্র এই পৌরাণিক আখ্যায়িকার মধ্যে বেশ খানিকটা লৌকিক জীবনের ব্যঙ্গরস সঞ্চার করিয়াছেন এবং কবির কাব্যরচনার মুখ্য উদ্দেশ্যও যে এই জাতীয় রসসৃষ্টি, তাহা মনে হয়, এখন আর বলাই বাহুল্য।

চণ্ডী ও অন্নদামঙ্গলের এই আদি অংশে কবিদ্বয়ের মনন ও সঙ্কল্পের এইরূপ পার্থক্যের অন্তরালে যে সত্যটি আগাগোড়াই আমাদের চোখে পড়ে, তাহা হইতেছে এই যে, ভারতচন্দ্রের রচনা কাব্যরস বা সৌন্দর্য্য সৃষ্টির প্রেরণায়, দেবতুষ্টির জন্য নহে। কবি তাই সুযোগ পাইলেই এই মুখ্য উদ্দেশ্যের পথে ছুটিয়া চলিয়াছেন। গ্রন্থোৎপত্তি বর্ণনায় মুকুন্দরাম তাঁহার প্রভু রঘুনাথের পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ও অনাড়ম্বর এই বর্ণনা। পক্ষান্তরে, অন্নদা-মঙ্গলের এই অংশে ভারতচন্দ্র রচিত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার সভা, বংশ ও রাজ্যের বিস্তৃত পরিচয় কাব্যশিল্পের এক বিশেষ নিদর্শন।

ভারতচন্দ্রের দক্ষকর্তৃক শিবনিন্দায় ব্যাজস্তুতি অংশটিতে কবির মৌলিকত্বের দাবী কিছু নাই বটে, কিন্তু কাব্যাংশে ইহা একেবারেই মৌলিক সৃষ্টি, একথা অনস্বীকার্য্য।

"কহিতে উচিত কথা মনে পাছে পাও ব্যথা
যেবা ছিল কপালে লিখন।
আমার কর্ম্মের গতি স্বামী হইল বাম-পথি,
তারে যজ্ঞে আনি কি কারণ॥" —ইত্যাদি
(মুকুন্দরাম)

"সভাজন শুন জামাতার গুণ
বয়সে বাপের বড় ।
কোন গুণ নাই যেথা সেথা ঠাঁই
সিদ্ধিতে নিপুণ দড় ॥' —ইত্যাদি

(ভারতচন্দ্র)

আবার ভারতচন্দ্রের "শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা" কাব্যধর্ম্মে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। চণ্ডীকাব্যে এই অংশের পরিচয় দিবার কিছু নাই।

চণ্ডীকাব্যের 'রতির খেদ' এবং অন্নদামঙ্গলের 'রতিবিলাপ' অংশেও ভারতচন্দ্রের এই কাব্যধর্ম্মের উৎকর্ষ এবং রতির বিলাপের সুরে কবির অনেকটা ভিন্নরূপ চরিত্রসৃষ্টির মনন অতি স্পষ্ট। মুকুন্দরামের রতি পতিসোহাগিনী, পতিশোকাকুলা কুলবধূ। ভারতচন্দ্রের রতি সত্যই কামকান্তা, পতিশোকোন্মাদিনী। কামোন্মাদনায় বিহ্বলা রতি শিব হইতে অগ্নি, মলয়পবন, বসন্ত, ভ্রমর, কোকিল এবং শেষ পর্য্যন্ত ইন্দ্রকেও তিরস্কারে আত্মহারা—

"কোলে লয়ে নিজপতি কামকান্তা কান্দে রতি
ধূলায়ে ধূসর কলেবর ।
লোটায়া কুন্তলভার ত্যজে নানা অলঙ্কার
সঘনে ডাকয়ে প্রাণেশ্বর ।" ইত্যাদি ।

(মুকুন্দরাম)

"পতিশোকে রতি কাঁদে বিনাইয়া নানা ছাঁদে
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে ।
কপালে কঙ্কণ মারে রুধির বহিছে ধারে
কাম-অঙ্গভস্ম লেপে অঙ্গে ॥" —ইত্যাদি

(ভারতচন্দ্র)

কাব্যদ্বয়ের আদি অংশ ব্যতীত অন্যান্য সর্ব্বত্রও উভয় কবির রুচি ও রচনারূপের এই বৈসাদৃশ্য বিশেষরূপেই লক্ষণীয়।

দেবীর উপাখ্যানে যে যে অংশে ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামের নিকট ঋণী, এতক্ষণে তাহা মোটামুটি দেখাইয়াছি। অন্নদামঙ্গলের অন্যান্য অংশে ও বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানে ভারতচন্দ্র কতখানি মুকুন্দরামের নিকট ঋণী, এখন তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

প্রথমতঃ, "বসুন্ধরের প্রতি অন্নদার শাপ" প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র সম্ভবতঃ চণ্ডিকা-মঙ্গলের কালকেতু উপাখ্যানে "নীলাম্বরের পুষ্পচয়ন" প্রসঙ্গের ছায়া অবলম্বন করেন। কিন্তু মুকুন্দরামের বিষয়টির পরিবেষণভঙ্গী স্বতন্ত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মুকুন্দরামের কাব্যরচনার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য দেবী মাহাত্ম্যপ্রচার। তাঁহার কাব্যের পাত্রপাত্রীগণ সকলেই যেন মোটের উপর দৈবনির্দ্দেশে পরিচালিত। নীলাম্বরের প্রতি মহাদেবের কোপ হইবার কোন কারণ ছিল না—যে-কোন প্রকারে মর্ত্ত্যলোকে পাঠাইয়া দেবীর মাহাত্ম্যপ্রচার করার জন্যই তাহাকে শাপগ্রস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের বসুন্ধর ও বসুন্ধরা দেবীপূজার জন্য সংগৃহীত পুষ্পে শয্যা রচনা করিয়া ও সেই ফুলে মালা পরিয়া রতিরসে মত্ত হইয়াছিল। তাহারা এইভাবে দেবরোষের কার্য্যই করিয়াছিল, সুতরাং অন্নপূর্ণা তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। নীলাম্বর ও বসুন্ধরের এই কাহিনী-অংশে চরিত্রের মানবিক ধর্ম্ম ও সহজ রুচির প্রকাশ লক্ষণীয়।

ইহার পর বিদ্যাসুন্দর কাব্যে হীরামালিনীর হাটেগমন ও বেসাতির হিসাব প্রসঙ্গে আমরা চণ্ডিকামঙ্গলের দুর্ব্বলা চরিত্রের প্রভাব দেখিতে পাই। এই প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামের দুর্ব্বলাকে হীরার আদর্শ করিয়াছেন বটে, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী কবি কৃষ্ণরামই প্রথমে দুর্ব্বলার আদর্শে তাঁহার বিমলামালিনীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন এবং ভারতচন্দ্রের হীরামালিনীর হাটে গমন প্রসঙ্গে কৃষ্ণ-রামের এই বিমলাই মুখ্য অবলম্বন বলিয়া অনেকটা নিঃসন্দেহে ধরা যায়। কৃষ্ণ-রাম বিমলার হাটে গমনপ্রসঙ্গ বিস্তারিত করিয়া বর্ণনা করেন নাই, কেবল বেসাতির হিসাব প্রসঙ্গে মুকুন্দরামের দুর্ব্বলার উপর একটু রং ফিরাইয়াছেন মাত্র। ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামের দুর্ব্বলা চিত্র অনুসরণে হীরার হাটে গমন প্রসঙ্গ অঙ্কিত করিয়াছেন। তবে তিনি কৌশলী কবি, মুকুন্দরামের পটকে তিনি রমণীয় তৈলচিত্রে রূপায়িত করিয়াছেন। উভয় কাব্য হইতে আবশ্যক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

মুকুন্দরাম—

"দুর্ব্বলা হাটেরে যায়, পশ্চাতে কিঙ্কর ধায়
কাহন পঞ্চাশ লয়্যা কড়ি।
কপালে চন্দন চুয়া হাতে পান মুখে গুয়া
পরিধান তসরের সাড়ী॥

দুর্ব্বলা হাটেরে যায় দুআধারী লোক চায়
হের আইসে সাধু ঘরের ধাই।
বুঝিয়া এমন কাজ যার আছে ভয় লাজ
ভাল বস্তু রাখিল লুকাই॥"

ভারতচন্দ্র—

"শুনি তুষ্ট কবি রায় দশ টাকা দিলা তায়
দুটি টাকা দিলা নিজ রোজ।
টাকা পেয়ে মুঠাভরা হীরা পরধন হরা
বুঝিল এ মেনে আজবোজ॥
সে টাকা ঝাঁপিতে ভরি রাঙ্গ তামা বারি করি
* * *
বুনি পোর উপযুক্ত মাসী।"

মুকুন্দরাম দুর্ব্বলাকে ধনী সাধুর বাড়ীর ধাই করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। সে বড়লোকের দাসীর ন্যায়ই বাজার করিল, তবে দাম দিবার সময় একটু দর কষাকষি করিল মাত্র, যাহাতে তাহা হইতে উহার দু'পয়সা থাকে। আর হীরাকে ভারতচন্দ্র 'পরধনহরা' এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, স্ুতরাং সে স্ুন্দরদত্ত টাকা পেঁটরায় পুরিয়া রাঙ্গতামা অর্থাৎ মেকী টাকা লইয়া বাজারে গেল। দুর্ব্বলার ন্যায় তাহাকেও দেখিয়া বাজারের ব্যাপারীরা ত্রস্ত হয় এবং ভাল দ্রব্য লুকাইয়া ফেলে। ভারতচন্দ্র হীরাকে নিতান্ত ঠগ করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। সে ষোল আনাই ফাঁকি দিতে চায় এবং পাকেচক্রে প্রায় বিনামূল্যে সওদা করিয়া দশগুণ দাম চড়াইয়া স্ুন্দরের কাছে হিসাব দিল। এই হিসাব দেওয়ার প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র মুকুন্দরাম অপেক্ষা কৃষ্ণরামকেই অনুসরণ করিয়াছেন অধিক। কারণ মুকুন্দরামের দুর্ব্বলা কেবল বাজে খরচ দেখাইয়া অর্থ আত্মসাৎ করিবার মতলব করিয়াছে। দুর্ব্বলা তাহার প্রভুকে তাঁহার দেওয়া টাকা যে মেকী, একথা বলিতে সাহস করে নাই। কিন্তু কুটনী মালিনী বিমলা ও হীরা উভয়েই সেই কথা বলিয়াছে। ভারতচন্দ্র এই মেকী টাকার কথায় কেবল কৃষ্ণরামকেই অনুসরণ করিয়াছেন। অন্ত্যযমকপয়ারে এই অংশে ভারতচন্দ্রের অদ্ভুত কবিত্ব ও লিপিকৌশল প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ব্বকবিদ্বয়ের বর্ণনা ইহার নিকট একান্ত

ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। তিনটি কাব্য হইতে এখানে প্রাসঙ্গিক অংশের কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

মুকুন্দরাম—

"হাটের কড়ির লেখা, একে একে দিব বাপা,
চোর নহে দুর্ব্বলার প্রাণ।
লেখা পড়া নাহি জানি, কহিব হৃদয়ে গুণি
এক দণ্ড করহ বিশ্রাম ॥

* * *

ইছিয়া তোমার যশ, তারে দিলুঁ পণ দশ,
কাণা কড়ি পড়িল পণ সাত ॥
সঙ্গে ভারী দশ জন তা সভারে দশ পণ,
আমি খাইলুঁ চারি পণ কড়ি
হাটে ফিরে অনুদিন সেখ ফকীর উদাসীন
তার ব্যয় ত্রয়োদশ বুড়ি ॥" —ইত্যাদি

কৃষ্ণরাম—

"হেনকালে মাল্যানী আইল নিজ পুরী।
বোঝা তুলাইয়া কহে বচন চাতুরী ॥
পাছে বুঝ মাসি কিছু করিয়াছে চাপা।
কোথায় এমন টাকা পাইয়াছিলা বাপা ॥
মোহরে গণিয়া দশ দিলে বটে তুমি।
সিক্কা সিক্কা কাটিল মণত বাট্টা কমি ॥

গণ্ডাদশ বারো কড়ি পড়িয়াছে ভুল।
বিকালে সকল দিব বিকাইলে ফুল ॥
মুখে বড় দড়বড়ি দিলেক বুঝান।
দশের অর্দ্ধেক তঙ্কা তার জলপান ॥
সুন্দর শুনিয়া হাসে বড় কুতূহলে।
চোরের উপরে চুরি কৃষ্ণরাম বলে ॥"

ভারতচন্দ্র—

"লাভ কে করিতে চায় মূল রাখা হৈল দায়
এমন ব্যাপারে কেবা আঁটে।
পসারি গোপের নারী বসিয়াছে সারি সারি
রসের পসরা গীতনাটে॥
তোমার কথায় টাকা লয়ে গেল জানি পাকা
তামা বলি ফিরে দিল সাটে।
মুনশীব রাধা তায় তুমি মোহ পাও যায়,
ভারত কি কবে সেই ঠাটে॥

* * *

পাছে বল বুনিপোরে মাসী দেই খোঁটা।
যটি টাকা দিয়াছিলা সবগুলি খোঁটা॥" —ইত্যাদি

ইহার পর "চোররূপে ধৃত সুন্দরকে দেখিয়া নারীগণের পতিনিন্দা" প্রসঙ্গ। ভারতচন্দ্রের এ প্রসঙ্গেরও মূল মুকুন্দরামের কাব্য। চণ্ডিকামঙ্গলে শিববিবাহ ও ধনপতির বিবাহ প্রসঙ্গে এই পতিনিন্দার বর্ণনা আছে, এবং দুইটিই প্রায় অভিন্ন। তবে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের বর্ণিত নারী-চরিত্রের পার্থক্য এই যে মুকুন্দরামের নারী গ্রামবধূ, আর ভারতচন্দ্রের নারী নগরবাসিনী। আমরা উভয় কাব্য হইতে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিয়া যথাসাধ্য সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিতেছি।

মুকুন্দরাম—

"সভে বলে খুল্লনার বর মিলেছে ভালো।
মদন মোহন বরের রূপে ঘর করেছে আলো॥
এক যুবতী বলে দিদি মোর কর্ম্ম মন্দ।
অভাগিয়া পতি মোর দুই চক্ষু অন্ধ॥
কোন দেশে নাহি সই দুঃখিনী মোর পারা।
কোলের কাছে রহিতে সদাই করে হারা॥
আর যুবতী বলে পতির বর্জ্জিত দশন।
শাক সূপ ঘণ্ট বিনা না করে ভোজন॥

* * *

ঠারে ঠোরে কহি কথা দিনে পতির সনে।
রাত্রি হৈলে নিদ্রা যায় গরুড় শয়নে॥"

ভারতচন্দ্র—

"চোর দেখি রামাগণ বলে হরি হরি।
আহা মরি চোরের বালাই লয়ে মরি॥
* * *
রাজসভাসদ পতি বৈদ্যবৃত্তি করে।
ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই ঘরে॥
নাড়ী ধরি স্থানে স্থানে করয়ে ভ্রমণ।
আমি কাঁপি কামজ্বরে সে বলে উল্বণ॥
* * *
রাজসভাসদ্ পতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
না ছোঁয় তরুণী তৈল আমিষে বঞ্চিত॥
* * *
অবিজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ পতি গণক রাজার।
বারবেলা কালবেলা সদা সঙ্গে তার॥" —ইত্যাদি

মুকুন্দরাম অন্ধের স্ত্রী, রুগ্নের স্ত্রী, গোদার স্ত্রী ও কানার স্ত্রীর দুঃখের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র কেবল কালা, অন্ধ, বৃদ্ধ, ভুঁড়ো, বামন প্রভৃতি দৈহিক বিকৃতিসম্পন্ন বা অক্ষম ব্যক্তির স্ত্রীগণকে দিয়া পতিনিন্দা করাইয়া খুশী হন নাই, তিনি কর্ম্মব্যস্ত বৈদ্যাদি বৃত্তিজীবী রাজকর্ম্মচারিগণকেও বাদ দেন নাই। এই সকল অপেক্ষাকৃত অভিজাত ধনী-মানী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্ত্রীকে দিয়াও কবি মনের ঝাল মিটাইয়া পতিনিন্দা করাইয়াছেন; বাহুল্যভয়ে আমরা সে সকল অংশ উদ্ধৃত করিলাম না। মুকুন্দরামের আদর্শে এই প্রসঙ্গ রচনা করিলেও ভারতচন্দ্র রচনা-চাতুর্য্যে ইহা অত্যন্ত উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। কবির বর্ণনায় একটা নাগরিক পরিবেশের চিত্র অতি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। কবি এই অংশে অনুপ্রাস যমকাদি শব্দালঙ্কার ও নানা অর্থালঙ্কারময় বর্ণনায় সমসাময়িক নাগরিক জীবনের তথাকথিত বিদ্বৎসমাজ, কুলীনসমাজ ও অন্যান্য ভদ্রসমাজের গলদ ও গ্লানির এক ঐশ্বর্য্যময় চিত্রদানে মঙ্গলকাব্য হিসাবে ইহার প্রাচীন গ্রাম্যবেশ ছাড়াইয়া নাগরিক বেশ পরাইয়া দিয়াছেন।

পরে "শ্মশানে সুন্দরের কালীস্তুতি" প্রসঙ্গ ভারতচন্দ্র কৃষ্ণরাম বা মুকুন্দরামের আদর্শে রচনা করিয়াছেন, ইহাও সত্য। মুকুন্দরামের কাব্যের কালকেতুর চৌতিশাস্তুতিই সম্ভবতঃ কৃষ্ণরামের আদর্শ। কারণ শ্রীমন্তের চৌতিশাস্তুতি ত্রিপদী ছন্দে রচিত। ভারতচন্দ্র কৃষ্ণরামের আদর্শেই এই চৌতিশাস্তুতি রচনা করিয়াছেন। অবশ্য মুকুন্দরামের কাব্য যে কিছু সাহায্য করে নাই, তাহা মনে হয় না। এই রচনায় মুকুন্দরামের সহজ প্রাণময় ভাবকে কৃষ্ণরাম বা ভারতচন্দ্র অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ভারতচন্দ্রের কাব্যে শব্দৈশ্বর্য্য, বা বিদ্যাবৈদগ্ধ্য ফুটিয়াছে—কাব্য সরস্বতীর আরাধনা যোড়শোপচারেই ঘটিয়াছে, কিন্তু চণ্ডীদেবীর আরাধনার আয়োজন অতি নগণ্য। কবি চণ্ডীনামের সহস্র প্রতিশব্দের দ্বারা নামকীর্ত্তনই করিয়াছেন। মুকুন্দরামের কাব্যের চৌতিশাস্তুতিতেও অনেকটা অক্ষরানুক্রমিক বন্দনা বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে আছে লোকভয়, রাজভয়, দস্যুভয় বিপন্ন অসহায়ের দেবীপদে ঐকান্তিক আত্মসমর্পণ ও ভক্তিনিবেদন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে 'দুঃখ দূর কর দুর্গা দুর্গতিদলনী' বলিয়া আহ্বান থাকিলেও কথাগুলি যতটা মৌখিক ততটা আন্তরিক বলিয়া মনে হয় না। এই জন্যই মুকুন্দরামের কাব্য যে তাঁহার অন্তরের আকূতি এবং ভারতচন্দ্রের কাব্য যে তাঁহার কবিত্বশক্তির অবদান—এই সকল অংশই তাহার প্রমাণ।

মুকুন্দরাম—

ঢেকামারে একেবারে শত শত জন
ঢালিলু তোমার পদে আপন জীবন ॥
ত্রিগুণা ত্রিবীজা তারা ত্রৈলোক্য তারিণী।
শক্তিরূপিণী তুমি তরঙ্গ-নাশিনী ॥
ত্বরিতে তারহ তারা তাপিত তনয়।
ত্রাণ হেতু তুমি মাতা অন্য কেহ নয় ॥
থর থর করে প্রাণ পাথর-চাপানে।
থরহরি কাঁপে প্রাণ রাজার তাড়নে ॥"

ভারতচন্দ্র—

"অপর্ণা অপরাজিতা অচ্যুত অনুজা।
অনাদ্যা অনন্তা অন্নপূর্ণা অষ্টভুজা ॥

আদ্যা আত্মরূপা আশা পূরাহ আসিয়া।
আনিয়াছ আপনি আমারে আজ্ঞা দিয়া ॥
ইচ্ছারূপা ইন্দ্রমুখী ইন্দ্রাণী ইন্দিরা।
ইন্দীবরনয়নী ইঙ্গিতে ইচ্ছ ইরা।”—ইত্যাদি ॥

ইহার পর বিদ্যার বারো মাস বর্ণন। এই প্রসঙ্গেও মুকুন্দরামই ভারতচন্দ্রের অবলম্বন। মুকুন্দরাম সুশীলার বারমাসিয়ায় সিংহল রাজকন্যাকে দিয়া বাংলার পল্লীর বারো মাসের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। সিংহলের আবহাওয়া বা ঋতুবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা কবির ছিল না। যাহা হউক, এই চিত্রে বাংলার পল্লীর যাহা কিছু উপভোগ্য ও আনন্দ উৎসব, মুকুন্দরাম তাহার বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যে কবি বাংলার বারো মাসের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে মুকুন্দরামের ছায়া স্পষ্ট, তবে বাংলার রাজকন্যার মুখে এ বর্ণনা যতটা শোভন হইয়াছে, সিংহলের রাজকন্যার মুখে তাহা ফুটিয়া উঠে নাই। মুকুন্দরামের সুশীলা যেন পল্লীগ্রাম অঞ্চলের জমিদার দুহিতা। কিন্তু ভারতচন্দ্রের বিদ্যার বর্ণনায় নগরবাসিনী বিলাসবতী রাজদুহিতার সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মুকুন্দরাম—

“সকল নূতন শস্য অগ্রহায়ণ মাসে
ধনঢালু মৃগ মাষ পূরিব আওয়াসে ॥
রাজারে কহিয়া দিব শতেক খামার।
ধান্য চালু সরিষেতে পুরিবে হামার ॥
ধন্য অগ্রহায়ণ মাস ধন্য অগ্রহায়ণ মাস।
বিফল জনম তার নাহি যায় চাষ ॥”

ভারতচন্দ্র—

ভাদ্রমাসে দেখিবে জলের পরিপাটী।
কোশা চড়ি বেড়াবে উজান আর ভাটি ॥
ঝরঝরি জলের বায়ুর খরখরি।
শুনিব দু’জনে শুয়ে গলাগলি করি ॥
আশ্বিনে এ দেশে দুর্গাপ্রতিমা প্রচার।
কে জানে তোমার দেশে তাহার সঞ্চার ॥
নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব ॥” —ইত্যাদি।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের শেষাংশে "মানসিংহের সৈন্যে ঝড় বৃষ্টি" প্রসঙ্গে কবি কঙ্কণের চণ্ডীর "মগরার ঝড়জল বর্ণন"-এর কিছু আভাস থাকিলেও উভয় বর্ণনায় পার্থক্য যথেষ্ট। উভয় দুর্বিপাকই দেবতার কার্য্য। মুকুন্দরামের ঝড় নদীর উপর নৌকারোহী সাধু ধনপতিকে বিপন্ন করিয়াছিল ও তাঁহার ছয়খানি ডিঙ্গা ডুবাইয়া দিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের ঝড়বৃষ্টি নদীর উপরের চিত্র নয়, এ ঝড় ভূমির উপর অবস্থিত মানসিংহের সৈন্যগণকে বিব্রত করে। এই ঝড়ের উদ্দেশ্য—

"মজুন্দার ঘরে গেলা বিদায় হইয়া।
অন্নপূর্ণা যুক্তি কৈলা বিজয়া লইয়া॥
মানসিংহে আপনার মহিমা জানাই।
দুঃখ দিয়া সুখ দিলে তবে পূজা পাই॥
তবে সে জানিবে মোরে পড়িয়া সঙ্কটে।
বিনা ভয় প্রীতি নাই জয়া বলে বটে॥"

সুতরাং ইহা নিছক কবিকল্পনা। মুকুন্দরামের কাব্যের বাস্তবতা এখানে নাই। তবে ভারতচন্দ্রের বর্ণনা শব্দঝঙ্কারে ও রচনা-চাতুর্য্যে মুকুন্দরাম অপেক্ষা অধিকতর জীবন্ত ও সমৃদ্ধ।

মুকুন্দরাম—

"ঈশানে উরিল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ করে দুর দুর॥
নিমিষেকে জোড়ে মেঘ গগন মণ্ডল।"

ভারতচন্দ্র—

"দশ দিক আন্ধার করিল মেঘগণ।
দুণ হ'য়ে বহে উনপঞ্চাশ পবন॥
ঝঞ্জনার ঝঞ্জনি বিদ্যুত চকমকি।
হড়মড়ি মেঘের ভেকের মকমকি॥
ঝড়ঝড়ি ঝড়ের জলের ঝরঝরি।
চারিদিকে তরঙ্গ জলের তরতরি॥"

ইহার পর 'পদ্মমুখীর রন্ধন' প্রসঙ্গ। ইহাই মোটামুটিভাবে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের সমজাতীয় কাব্যাংশ আলোচনার শেষ প্রসঙ্গ। চণ্ডিকামঙ্গলে

এই রন্ধনের বহু বর্ণনা আছে। এই সকল বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে খুল্লনার রন্ধন প্রসঙ্গই বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং এই অংশই ভারতচন্দ্রের কাব্যের আদর্শ। মুকুন্দরাম এই প্রসঙ্গ সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন আর ভারতচন্দ্রের বর্ণনা বিস্তৃত ও ঘোরাল। উভয় কবিই রন্ধন বিষয়ে নিজ নিজ যুগের রন্ধন প্রণালীর বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামের মত ব্যঞ্জন রন্ধনের বর্ণনা ব্যতীত নানাবিধ মিষ্টান্ন পাকের বর্ণনা দিয়াছেন এবং সেইযুগের উত্তম তণ্ডুলের এক দীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন। মুকুন্দরামের বর্ণনায় আমরা কবির কাব্যের প্রয়োজন মত রন্ধনের একটা চিত্র পাই। ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় কবি যেন সখ করিয়া যতপ্রকার ব্যঞ্জনপাক ও মিষ্টান্ন পাকপ্রণালী তাঁহার জানা ছিল, সবকিছুরই একটা ফিরিস্তি দিয়াছেন এবং অনাবশ্যক হইলেও তৎকালে প্রচলিত তণ্ডুলের এক সুদীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন। মুকুন্দরামের রন্ধনে শাকসব্জি ঝাল-ঝোল ও অম্বলেরই প্রাধান্য—ইহা অনেকটা গ্রাম্য জীবনের ও স্বল্পবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত ঘরেরই চিত্র। ভারতচন্দ্রের রন্ধনে অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে লুচি, মোণ্ডা, খেচরান্ন, পরমান্ন ও নানা মেঠাই দ্রব্যের বাহুল্য লক্ষণীয়। এ রন্ধনের বর্ণনায় একটা রাজসিকতার চিত্র ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মুকুন্দরাম—

"বাইগুণ কুমড়াকড়া, কাঁচকলা দিয়া শাড়া,
বেসার পিঠালী ঘনকাঠি।
ঘৃতে সন্তোলিল তথি, হিঙ্গু জীরা দিয়া মেথি,
শুক্তা রন্ধন পরিপাটী॥
ঘৃতে ভাজে পলাকড়ি নৈটা শাকে ফুলবড়ি,
চিঙ্গড়ি কাঁটাল বিচী দিয়া।
ঘৃতে নালিতার শাক, তৈলে বাস্থক পাক,
খণ্ডে বড়ি ফেলিল ভাজিয়া॥"

ভারতচন্দ্র—

"কলাবড়া ঘিয়ড় পাপড় ভাজাপুলী।
সুধারুচি মুচমুচি লুচি কতগুলি॥
পিঠা হৈল পরে পরমান্ন আরম্ভিলা।
চালু চিনা ভুরা ঝঙ্গরার চালু দিলা॥

পরমান্ন পরে খেচরান্ন রান্ধে আর।
বিষ্ণুভোগ রান্ধিলা রান্ধনী লক্ষ্মী যার ॥
অতুলিত অগণিত রান্ধিয়া ব্যঞ্জন।
অন্ন রান্ধে রাশি রাশি অন্নদামোহন ॥
মোটা সরু ধান্যের তণ্ডুল তরতমে।
আস্থ বোরো আমন রান্ধিলা ক্রমে ক্রমে ॥
দলকচু ওড়কচু ঘিকলা পাতরা।
মেঘহাসা কালামনা রায় পানিতরা ॥”

এইভাবে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের কাব্যের পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যানভাগের তুলনায় এই সত্য আমাদের কাছে স্বতঃই ধরা পড়ে যে, মুকুন্দরামের কাব্য চণ্ডী আরাধনার, চণ্ডিকাস্তুতির জন্যই রচিত। এ কাব্যের নরনারী চরিত্রগুলি অনেকটা নিরীহ গ্রাম্য প্রকৃতির, বাহিরের জীবনের ঠাটভাব, আসবাব সৌষ্ঠব বা জাঁকজমক এখানকার জীবনে তেমন একটা লক্ষ্য করা যায় না। আবার কাব্যের আর্ট বা শিল্পের দিকটা অথবা জীবনেরও এই শিল্প ধর্ম্মটি একাব্যে বরাবরই একটু অন্তরালে পড়িয়া গিয়াছে।

কিন্তু ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের পরিচয় স্বতন্ত্র। শব্দালঙ্কারময় ছন্দশিল্পময় কাব্যসৃষ্টির প্রেরণাই এখানকার মূলকথা। দেবারাধনা বা মানবজীবনের উপর দৈবশক্তির প্রভাব অল্পবিস্তর থাকিলেও উহা যেন অপেক্ষাকৃত গৌণবস্তু।

এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ প্রয়োজন যে, মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের অর্থাৎ ষোড়শ ও অষ্টাদশ এই দুইশত বৎসর পূর্ব্বের ও পরের বাংলার সমাজ-প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট। ভারতচন্দ্রের সমাজ মুখ্যতঃ বর্দ্ধমান-কৃষ্ণনগর-চন্দননগর-মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতার নাগর সমাজ এবং বিশেষ করিয়া ক্ষয়িষ্ণু নবাবী শাসনের শেষ পর্য্যায়ের চিত্র। এই নাগরজীবন, বিশেষতঃ কৃষ্ণনগরের দরবারী জীবন একান্তই সামাজিক দায় ও দায়িত্ব হইতে মুক্ত। এ জীবনের নির্দ্বন্দ্ব ও নির্দায়িত্ব অবসর নানাপ্রকার উৎসব ও বিলাসময় আমোদ-প্রমোদে মুখর, এবং সে আমোদ-প্রমোদের রুচি ও পরিবেশ স্থূল প্রকৃতির। রাজপরিষদে থাকিয়া গোপাল ভাঁড়ের নানাপ্রকার হাস্যরস পরিবেশনের ভিতর এবং ‘হাস্যার্ণব ভাদুড়ী মহাশয়’ অথবা ‘কেনারাম মুখোপাধ্যায়’ প্রভৃতি রসিকবরের বিচিত্র রসপরিবেশনের মধ্যে, সেই দরবারী জীবনের আবহের মধ্যেই রাজ-

সভাকবি ভারতচন্দ্রের কাব্যকলার প্রকাশ। কাজেই স্বভাবতঃই সমসাময়িক সমাজ ও জীবনের রূপকল্পনায় এই দরবারী জীবনের পরিবেশ তাঁহাকে প্রভাবিত না করিয়া পারে নাই, সেই রুচি ও পরিবেশ সম্মুখে রাখিয়াই তাঁহাকে কাব্য রচনা করিতে হইয়াছে। কিন্তু মুকুন্দরাম প্রশস্ত পল্লীজীবনেই মানুষ, সেই জীবনের পরিচয় এই নাগর বা দরবারী জীবন হইতে ভিন্নরূপ। সেখানে কৃষি নির্ভর পল্লীকেন্দ্রিক জীবনের নানা সুখদুঃখ, নানা আনন্দ বেদনার সরল গ্রাম্য বিস্তার, মুকুন্দরামের কবিকল্পনা এই সহজ প্রাণময় পরিবেশের মধ্যে প্রসারিত।

যেহেতু ভারতচন্দ্রের ব্যক্তি ও সমাজজীবনের সঙ্গে সমসাময়িক বৃহত্তর সমাজ-মানসের তেমন সহজ যোগ বা ঘনিষ্ঠতা ছিল না, এবং দরবারী প্রতিবেশের মধ্যে প্রতিনিয়ত থাকায় কবি সেই প্রশস্ত জীবন ও সমাজের সঙ্গে আপন জীবনকে এক ও অভিন্ন করিয়া ভাবিতে পারেন নাই, সেইজন্য অন্নদামঙ্গলের দেব বা মানব-চরিত্র এদেশের প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারের দৃষ্টিতে কেমন বিসদৃশ মনে হয় এবং এই সকল চরিত্রের সহিত সংযুক্ত বৈষয়িক, সামাজিক বা তজ্জাতীয় নানা কাহিনীও অনেক ক্ষেত্রেই অস্বাভাবিক। ইহাদের শিল্পের দিক ফুটিলেও প্রাণের দিক ফুটিতে পারে নাই। এইজন্যই দেখি, দুর্ব্বলার কার্য্যকলাপ অবিকল হীরামালিনীর জীবনে আরোপ করিলেও ভারতচন্দ্র হীরামালিনীর চরিত্রে সঙ্গতি সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। দুর্ব্বলা দাসী। তাই বেসাতি করা বা তাহার হিসাব-প্রদান দাসী দুর্ব্বলার চরিত্রের একটি বিশেষ অঙ্গ। কাজেই বেসাতি বা হিসাব দানের দ্বারা মুকুন্দরাম দুর্ব্বলা দাসীর চরিত্রের সম্পূর্ণতাই ঘটাইয়াছেন। পক্ষান্তরে ভারতচন্দ্র সখ করিয়া হীরার চরিত্রে যমকের ছটা দ্বারা বেসাতির হিসাব দানের ভাণ করাইয়া চরিত্রের সম্পূর্ণতা ও স্বাভাবিকতার পরিবর্ত্তে উহাকে কেমন যেন অবাস্তবে পরিণত করিয়াছেন।

আবার চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে চণ্ডীর মহিষ-মর্দ্দিনীরূপ দেখিয়া ব্যাধ কালকেতুর মূর্চ্ছা একান্ত স্বাভাবিক।

"দেখিয়া চণ্ডীর রূপ ব্যাধের নন্দন।
সম্ভ্রমে পড়িল বীর হরিল চেতন॥"

কিন্তু অন্নদামঙ্গলে,

"পঞ্চমুখে সম্মুখে নাচেন অন্ন খেয়ে
ভূমে পড়ে হরিহোড় একবার চেয়ে ॥"

দেবীর এই স্নিগ্ধ মাতৃমূর্ত্তি দর্শনেও হরিহোড়ের মূর্চ্ছা একান্তই অস্বাভাবিক। হরিহোড়ের এইরূপ আচরণ তাহার চরিত্রের সহজ প্রাণবত্তার অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ইহা ছাড়া চণ্ডীকাব্যে চণ্ডীভক্ত কালকেতুর মুক্তির জন্য কলিঙ্গের হিন্দুরাজার প্রতি চণ্ডীদেবীর স্বপ্নপ্রদান অথবা তাঁহার স্বপ্নদর্শন ও পরে কালকেতুর সহিত প্রীতি-আলিঙ্গন অতি সহজ, স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম চিত্র।

কিন্তু অন্নদামঙ্গলে ভবানন্দের মুক্তির জন্য মুসলমান বাদশাহ জাহাঙ্গীরের পক্ষে জাগ্রত অবস্থায় অন্নদার এইরূপ 'মায়াপ্রপঞ্চ' বা অনৈসর্গিক ব্যাপার প্রদর্শন সহজ বিশ্বাস ও সংস্কারের অনুগামী নহে।

আবার চণ্ডীকাব্যে কোটালের শাণিত অস্ত্রের তলে প্রাণভয়ে ভীত শ্রীমন্তের চরিত্রখানি সহজ ও স্বাভাবিক, কিন্তু মশানে মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সুন্দরের 'কালীস্তুতি' প্রসঙ্গে অনুপ্রাসের ঘটাঘটার ভিতর চণ্ডীনামের সহস্র প্রতিশব্দ আবিষ্কার, কেমন যেন আমাদের সরল বিশ্বাস ও সহজ সংস্কারকে আঘাত করে।

চণ্ডী ও অন্নদামঙ্গলের পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনী এবং দেব ও মানব চরিত্রের মোটামুটি বিশ্লেষণ ও পর্য্যালোচনায় মনে হয়, ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরামের জীবন ও সাহিত্যদৃষ্টি আদৌ ভিন্ন প্রকৃতির। উভয়ের যুগ ও সমাজের বহিঃ ও অন্তঃপ্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবিদ্বয়ের অন্তঃপ্রকৃতির বিভেদ ও বৈসাদৃশ্যও বিশেষ লক্ষণীয়। মুকুন্দরাম মনেপ্রাণে তাঁহার সমাজেরই একজন। সমাজের ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভ, সকলই তাঁহার ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। কিন্তু ভারতচন্দ্র কোনদিনই আপনাকে সেই সমাজের একজন বলিয়া ভাবিতে পারেন নাই। সমাজকে তিনি দেখিয়াছেন, তাহার প্রকৃতি এবং পরিচয়ও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু তাঁহার এই জানা ও দেখা দূর হইতে, নিজেকে সেই জীবনের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া নয়, দূরে তটপ্রান্তে দাঁড়াইয়া। দূর হইতে তাহাকে দেখিতে ও বুঝিতে হয়তো তাঁহার ভুল হয় নাই, কিন্তু আপন জীবনকে সে জীবনের সঙ্গে এক ও অভিন্ন করিয়া ভারতচন্দ্র ভাবিতে পারেন নাই।

ভারতচন্দ্রের পাণ্ডিত্যপ্রতিভা-ফারসী ও হিন্দী প্রবাহ এবং ভারতচন্দ্র

ভারতচন্দ্রের জন্ম যে বংশে, কবির জীবনী হইতে পাইয়াছি, তাহা ছিল সুচিরকাল হইতে সংস্কৃত শিক্ষা-দীক্ষা ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে সমৃদ্ধ। স্বাভাবিক সংস্কারের উপর ভারতচন্দ্রের জীবনে ছিল বিশেষ শিক্ষা—সংস্কৃত, হিন্দী, বাঙ্গলা ও ফারসী। অষ্টাদশ শতকের বাংলার জীবনে ফারসী ও হিন্দী শিক্ষার প্রবাহ বিশেষ প্রবল, এবং তাহার সাক্ষ্য ভারতচন্দ্রের সাহিত্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ফারসী ও সংস্কৃত শব্দের প্রাণধর্ম্ম একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির। উভয়ের ভিতরের ঝঙ্কার বা দোলনের সাম্য নাই বলিলেই চলে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের শিল্প-নৈপুণ্যের অদ্ভুত কৃতিত্ব এই দুই ভিন্ন প্রকৃতির শব্দের অপূর্ব্ব মিলন ও সামঞ্জস্য স্থাপনে। কবির শব্দ নির্ব্বাচন এবং তাহার সুষ্ঠু প্রয়োগ-কুশলতায় তাঁহার কাব্যের প্রায় সর্ব্বত্রই এই ফারসী ও সংস্কৃত শব্দ একান্ত শ্রুতিমধুর হইয়া উঠিয়াছে।

'শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর বায়দ্‌কে গোয়দ্ কুবর
কাতর দেখে আদর কর কাহে মর রো রোয়কে।
বক্তুং বেদং চন্দ্রমা ছুঁলালা চে রেমা।
ক্রোধিত পর দেও ক্ষমা মেটিমে কাহে শোয়্‌কে॥'

অন্নদামঙ্গলের তৃতীয়াংশে ভারতচন্দ্র বিষয়বস্তুর উপযোগী আবেষ্টনী সৃজনের উদ্দেশ্যে অবলীলাক্রমে ফারসী ও হিন্দী শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

'লিখাইয়া পঞ্জা ফরমানের নকল।
নানামতে সাবধানে রাখিলা আসল॥'

ভারতচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন :

'মানসিংহ পাতশায় হৈল যে বাণী।
উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী॥
পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥' [১]

কবির পাণ্ডিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট প্রকাশ এই শব্দলীলা। বর্ণনা বিষয়ের প্রকৃতি বুঝিয়া তাহার সজীবতা সৃষ্টির জন্য কবি অনায়াসেই তদুপযোগী বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী বা ফারসী শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন।

'মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে ॥'

মহাদেবের এই তাণ্ডব নৃত্যের বর্ণনায় কবির অদ্ভুত শব্দ যোজনা যেন নৃত্যপরায়ণ রুদ্রদেবকে পাঠকের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করে। ছন্দের ধ্বনি ও তাল এবং শব্দ চয়নে যেন নৃত্যের ছন্দ কানে বাজে।

লটাপট, জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা ॥

এখানে শেষের ছত্রে ধ্বন্যাত্মক শব্দ ত্রয়ের দ্বারা কবি যথাক্রমে গঙ্গাজলের প্রবাহ, নির্মলতা এবং নিক্কণ ব্যক্ত করিয়াছেন। এই শব্দগুলি যেন প্রয়োগনৈপুণ্যে নূতন প্রাণ ও অর্থলাভ করিয়াছে।

অন্নদামঙ্গলের পৌরাণিক অংশে কবি যেমন সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ তৎসম শব্দের সমাবেশে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়াছেন, তেমনি আবার 'রাজদরবার, হাটবাজার ও সহরের আবহাওয়া ইত্যাদি বর্ণনাক্ষেত্রেও ঐ জাতীয় শব্দ একেবারে বর্জ্জন করিয়া অবিমিশ্র সহজ, সরল ও প্রাকৃতজন-বোধ্য শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

'কল কোকিল অলিকুল বকুল ফুলে।
বসিল অন্নপূর্ণা মণি দেউলে ॥'

অথবা

'তনু মোর হ'ল যন্ত্র যত শিরা তত তন্ত্র
আলাপে মাতিল মন মাতালে নাচাওনা।
ওহে পরাণবধূ যাই গীত গেয়না ॥'

এই জাতীয় শত সহস্র পদাবলীর মধ্যে ভারতচন্দ্রের এই শব্দ-মন্ত্র বা শব্দের সুনির্ব্বাচন শুধু মনোহর নয়, বিস্ময়করও বটে।

শব্দের সুনির্ব্বাচনের ন্যায় ভারতচন্দ্রের পাণ্ডিত্যের অপর বৈশিষ্ট্য তাঁহার বর্ণনারীতির সুশাসন অথবা বাক্যের সুসম পরিমিত ব্যবহার। সংক্ষিপ্ত অথচ সরস ও গভীর ভাবদ্যোতক প্রবচনের মত বাক্যগুলিই ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

'নীচ যদি উচ্চভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে।'

'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।'

'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।'

'মিছা বাণী সিঁচা পানী কতক্ষণ রয়।'

শব্দ নির্ব্বাচনের মত ছন্দ নির্ব্বাচনেও কবির পাণ্ডিত্য-প্রতিভার পরিচয় সুস্পষ্ট। যে ছন্দ যে জাতীয় বর্ণনার পক্ষে একান্ত উপযোগী, কবি বাছিয়া বাছিয়া সর্ব্বত্র সেই ছন্দ নির্ব্বাচনের কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন।

'ঊর্দ্ধ বাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য্য পাড়িছে।

লম্ফ ঝম্ফ ভূমিকম্প নাগ কূর্ম্ম লাড়িছে॥'

কবির এই তূণক ছন্দ দক্ষযজ্ঞ নাশের রুদ্রতাণ্ডবের যোগ্য ছন্দই বটে।

'মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।

ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥'

এই ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দ রুদ্রদেবের তাণ্ডবনৃত্যের যোগ্য বাহনই বটে।

ভারতচন্দ্রের ছন্দের কান ছিল একান্ত অভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত।

ছন্দের এইরূপ প্রয়োগ ব্যতীত কবিপ্রযুক্ত ছন্দের স্বরূপের মধ্যেও নানা বৈশিষ্ট্য ও অসাধারণত্ব শ্রদ্ধার সহিত লক্ষণীয়।

যে সমস্ত সংস্কৃত ছন্দ ভারতচন্দ্র বাংলায় প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাদের সবগুলিই পরবর্ত্তীকালে আমাদের ভাষায় ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। একদিকে শব্দের মাধুর্য্যে যেমন তাহারা অতুলনীয়, অন্যদিকে হিন্দীর ধন্যাত্মক কবিতার ভঙ্গী তাহাতে পরিপূর্ণরূপে মিশ্রিত। সংস্কৃত ব্যাকরণের সূক্ষ্ম নিয়ম-কানুনও কোথাও অগ্রাহ্য করা হয় নাই। এই সকল ছন্দের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিতে ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ এযুগেও বিরল।

বাংলা শব্দে লঘুগুরু উচ্চারণভেদ কোনদিন নাই। অতএব এই জাতীয় শব্দে সংস্কৃতের লঘুগুরু ছন্দকে অনুকরণ করা যে কি দুঃসাধ্য, তাহা একমাত্র অলঙ্কারশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরাই জানেন। ভারতচন্দ্র শুধু যে সংস্কৃত ছন্দগুলি নিখুঁতভাবে বাংলায় আমদানী করেন, তা নয়, সংস্কৃতে ছত্রে ছত্রে মিল দেওয়ার যে গৌরব আদৌ ছিল না, বাংলাতে ছন্দের সেই নূতন গৌরব তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার ভুজঙ্গ-প্রয়াত ও তোটকাদি ছন্দেই এ গৌরব দান করিয়াছেন।

কবি তাঁহার সমস্ত ছন্দে মিলের মহিমা যে ভাবে দেখাইয়াছেন, তাহাতে মনে

হয়, ছন্দের মিলের পাকা বুনিয়াদ তিনিই সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিদের কাব্যে লঘুগুরু ছন্দের যে শৈথিল্য দেখা যায়, তাহা যদি ভারতচন্দ্রের নিপুণ হস্তের স্পর্শে সংশোধিত না হইত, তবে এ ছন্দ সঙ্গীত-সাহিত্যে আজ যে পসার ও প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে, তাহা সম্ভব হইত বলিয়া মনে হয় না।

ভারতচন্দ্রের ছন্দে মিলের কোথাও কোনরূপ ত্রুটি বা দৈন্যের কথা দূরে থাক, আদ্যোপান্ত মিলের অদ্ভুত আতিশয্য সকলকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করে। তাঁহার এই মিলের মধ্যে কোথাও এতটুকু কষ্ট-কল্পনা দেখা যায় না। ম+ন—এ মিল তিনি কখন দিতেন না, হসন্ত বর্ণের সঙ্গে আকারান্ত শব্দের মিলও তাঁহার কাব্যের কোথাও নাই।

তাঁহার ছন্দ রচনার অপর এক বৈশিষ্ট্য, তিনি কেবল শেষাক্ষরের মিল দিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন না—শেষাক্ষরের পূর্ব্ব স্বরের মিলও তিনি অধিকাংশ স্থলেই বজায় রাখিয়াছেন। এযুগে উনশেষ স্বরধ্বনির মিলের অভাব, ছন্দের বিশেষ খুঁত বা অঙ্গহানি বলিয়া গণ্য হয় বটে, কিন্তু রায়গুণাকর সে যুগেও বর্ত্তমান যুগ-সম্মত মিল স্থাপন করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আবার এদেশে বাংলা কাব্যে ছন্দের এইরূপ মিল সম্বন্ধে অনেক শৈথিল্য দেখা যায়।

এক বিষয়ে ভারতচন্দ্র এযুগকেও অতিক্রম করিয়াছেন। এখনকার দিনে ত্রিপদীর পর্ব্বে পর্ব্বে বা তিন পর্ব্বে মিল দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। ভারতচন্দ্র ত্রিপদীর দুই পর্ব্বে সর্ব্বত্রই মিল দিয়াছেন। অনেকস্থলে তিন পর্ব্বেও মিল দিয়া গিয়াছেন।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের মধ্যে ব্রজবুলির কবিদের কথা ছাড়িয়া দিলে ভারতচন্দ্রের মত এমন ছন্দের সৌষ্ঠব, বৈচিত্র্য ও পারিপাট্য দ্বিতীয় কোন কবি দেখাইতে পারেন নাই।

সংস্কৃত ছন্দের মিলের অভাবও কবির হাতে ঘুচিয়াছে, শুধু তাই নয়, ভারতচন্দ্র তূণক ছন্দের ধরণে সংস্কৃত ছন্দেও পর্ব্বে পর্ব্বে মিল সম্ভব করিয়াছেন। কবির লেখনীর অপূর্ব্ব কৌশলে এই সকল ছন্দ রচনায় কোথাও ভাষার এতটুকু জড়তা বা আড়ষ্ট ভাব দেখা যায় না।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের অধিকাংশই পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদীতে রচিত, এবং তিনিই বাংলার পয়ার দীর্ঘ ত্রিপদীর রূপকে অবিমিশ্র অক্ষর মাত্রায় গঠন করেন।

কবির লঘুত্রিপদী ও অক্ষরমাত্রিক। লঘুত্রিপদীর পংক্তির সঙ্গে অর্দ্ধপংক্তির মিলন বৈচিত্র্য ভারতচন্দ্রের কাব্যে আছে।

দিন পতি চাহ দীনে।
তোমার মহিমা। বেদে নাহি সীমা। ক্ষমা কর গুণহীনে। ইত্যাদি

ভাটের মুখে কবি হিন্দী ভাষায় প্রাকৃতের স্বরমাত্রিক লঘুত্রিপদী ছন্দ বসাইয়াছেন।

ভূপমেতি। হারিভট্ট। কাঞ্চীপুর। যায়কে।
ভূপকোস। সাজমাঝ। রাজপুত্র। পায়কে। ইত্যাদি।

কবি সাধারণতঃ প্রাকৃত লঘুত্রিপদীর স্বরমাত্রা অনুসরণ করেন নাই। কিন্তু যেখানে যুক্তাক্ষর বর্জ্জন করিয়াছেন, সেখানে অক্ষর-মাত্রিক আপনা হইতেই স্বরমাত্রিক লঘুত্রিপদী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কত মায়া কর। কত মায়া ধর। হেরি হরি হর। হারে।
জিত জরাজর। হয় যেই নর। তুমি দয়া কর। যারে।
ইত্যাদি।

আবার লঘুত্রিপদীর শেষার্দ্ধ চরণের দুইবার প্রয়োগ করিয়া পূর্ণ চরণের সঙ্গে স্তবক গঠন করিয়াছেন।

কোটাল বলিছে। রাগি। কি বলে রে বুড়া। মাগী
ঘরে পোষে চোর। আরো করে জোর। এ বড় কুটিনী। ঘাগী।
ইত্যাদি।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে লঘুত্রিপদী অপেক্ষা লঘুচৌপদী অধিক শ্রুতিমধুর। ইহাতে কবি সাধ্যমত যুক্তাক্ষর বর্জ্জন করিয়াছেন। এইজন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও এটি স্বরমাত্রিক হইয়া উঠিয়াছে।

আহা মরে যাই। লইয়া বালাই।
কুলে দিয়া ছাই। ভজি ইহারে। ইত্যাদি।

স্বরমাত্রিক প্রাকৃত দীর্ঘচৌপদী ছন্দে কবি কয়েকটি স্তব ও গান রচনা করিয়াছেন।

জয়—শিবেশ শঙ্কর। বৃষধ্বজেশ্বর। মৃগাঙ্কশেখর।
দিগম্বর। ইত্যাদি।

কবিতায় প্রয়োগ না করিলেও গানে ও স্বরের স্তবক বন্ধনে ভারতচন্দ্র স্বর-মাত্রিক লঘুত্রিপদী ও চৌপদী রচনা করিয়াছেন।

লক লক লক ফণি বিরাজ। তক তক তক রজনীরাজ
ধক ধক ধক দহন সাজ। বিমল চপক গঙ্গিয়া। ইত্যাদি।

যুক্তাক্ষর বর্জ্জন করিয়া এবং তিন পর্ব্বে মিল রক্ষা করিয়া কবি দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে একটি বিশেষ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

শিবনাম লয়ে মুখে। তরিব সকল দুখে
দমন করিব সখে। সমনে শিবগুণ। ইত্যাদি।

যুক্তাক্ষরের অভাবে ইহা স্বরমাত্রিক রূপ গ্রহণ করিয়াছে অথচ একেবারে দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ না থাকায় ছন্দস্পন্দের সৃষ্টি হয় নাই। সেইজন্য ইহাকে প্রাকৃত দীর্ঘত্রিপদীও বলা যায়। বস্তুতঃ ইহা দুইএর মাঝামাঝি একটি সুন্দর রূপ।

বিশুদ্ধ দীর্ঘত্রিপদীর উদাহরণও আছে গানে :

খসিল বাঘের ছাল। আলু খালু হাড়মাল।
ভুলিল ডমরু শিঙ্গা। পিনাক ত্রিশূল। ইত্যাদি।

দীর্ঘচৌপদীর দৃষ্টান্তও মিলে। ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ প্রথম তিন পদে অধিকাংশ স্থলেই একই মিল থাকে।

ভারতচন্দ্রের নিপুণ হস্তে পয়ার তাহার যথাযোগ্য রূপ লাভ করিয়াছে। পয়ারের পর্ব্বে পর্ব্বেও কবি মিল দিয়াছেন। কোথাও আবার তিন পর্ব্বেও মিল রক্ষা করিয়াছেন। কবি এই পয়ারে বড় বড় সংজ্ঞাবাচক শব্দের সুবিহিত স্থান দিয়াছেন।

জামাতা কুলীন রাম গোপাল প্রথম। সদানন্দময়
নন্দ গোপাল মধ্যম। ইত্যাদি।

দশ অক্ষরে গঠিত খণ্ড পয়ারের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়।

'না জানিয়া করিয়াছি। দোষ। দয়াময়ি দূর কর। রোষ।' ইত্যাদি।

হসন্ত শব্দের ঘন প্রয়োগে কবি পয়ারের গতিকে দ্রুততর করিয়া তুলিয়াছেন।

আথর পাথর কাট্ কেটে ফেল। হাড়।
ইট্ কাট কাঠ ফাট মেদিনী। পাহাড়॥ ইত্যাদি।

কবির সৃষ্ট হিল্লোলিত পয়ারের রূপ :

কি বলিলি মালিনী লো ফিরে বল বল।
রসে তনু ডগ মগ মন টল টল॥ ইত্যাদি।

অষ্ট চরণকে দুইবার প্রয়োগ করিয়া কবি-গণের অনুসরণে এক শ্রেণীর পয়ারও সৃষ্টি করিয়াছেন :

শুন—শ্বশুর ঠাকুর শুন—শ্বশুর ঠাকুর
আমার বাপের বিদ্যার শ্বশুর।

বারো অক্ষরের মাত্রার চরণে একটি করিয়া 'গো' যোগ করিয়া কবি এক শ্রেণীর পয়ার রচিয়াছেন। যদি 'গো'-এর মিল ধর্তব্য নয়, মিল তাহার পূর্ব্বের বর্ণে। একই 'নী'-এর মিল পূর্ণ কবিতায় :

ছোটর তে হবে রাজধানী গো।
তারে ঠাকুরের আমদানী গো। ইত্যাদি।

যেখানে কবি প' পংক্তিতে দীর্ঘস্বরের দীর্ঘমাত্রা স্বীকার করিয়াছেন, সেখানে পয়ার পজ্ঝটি র পরিণত হইয়াছে।

ধাঁধাঁ। গুড় গুড়। বাজে না। গারা।
বাজে র—। বাব মৃ-। দঙ্গ দো—। তারা॥

কবি মাল ঝাঁপের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে পয়ারেরই একটি রূপ। ইহাতে প্রথম তিন পর্ব্বে মিল আছে।

কোতোয়াল। যেন কাল। খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে।
ধরিবাণ। শরশান। হান হান। হাঁকে।

ভারতচন্দ্র যে কয়টি সংস্কৃত ছন্দের বাংলায় প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহারা এ ভাষায় তাহার সুষ্ঠু রূপই লাভ করিয়াছে। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য কবির বিখ্যাত ভুজঙ্গ-প্রয়াত ছন্দ ;

মহারুদ্র বেশে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙা ঘোর বাজে। ইত্যাদি।

এ স্থলে ধ্বন্যাত্মক শব্দবিন্যাস ও ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দের মধুর সমাবেশে রুদ্রদেবের তাণ্ডবনৃত্যধ্বনি যেন আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে।

তূণক ছন্দকেও বাংলায় ব্যবহার করিয়া কবি ইহার পর্ব্বে পর্ব্বে মিল যোজনা করিয়া নিজত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

উর্দ্ধবাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য্য পাড়িছে।
লম্ফঝম্ফ ভূমিকম্প নগ কূর্ম্ম নাড়িছে। ইত্যাদি।

ইহা দক্ষযজ্ঞ নাশের রুদ্রতাণ্ডবের যোগ্য ছন্দই বটে, কিন্তু কবি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হাস্যরসিকতার বাহুল্যে শেষ পর্য্যন্ত এ ছন্দের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই।

ভার্গবের সৌষ্ঠবের দাড়ি-গোঁফ ছিণ্ডিল।
ভূতভাগ পায় লাগ লাথি কিল মারিছে। ইত্যাদি।

তোটক ছন্দটির কবি খুব সুষ্ঠু প্রয়োগ করিতে পারেন নাই;—

রতিরঙ্গরণে মজিলা দুজনে।
দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভণে॥

ভারতচন্দ্রের কাব্যে ১১ অক্ষরে রচিত একাবলী ছন্দের কয়েকটি দৃষ্টান্ত আছে। কবি ইহাদের অক্ষর মাত্রাই প্রয়োগ করিয়াছে।

পুন না কহিও আমার কাছে
যে শুনে তাহার পাতক আছে। ইত্যাদি

সাত মাত্রায় রচিত প্রাকৃত হরিগীতা ছন্দের দৃষ্টান্ত মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। তবে এই ছন্দটিকে ভারতচন্দ্র কবিকঙ্কণের মত অক্ষরমাত্রিক ধরিয়া স্বরমাত্রিকই ধরিয়াছেন,—

কত—নিশান ফর ফর নিনাদ ধর ধর কামান গর গর গাজে।
যত—জুবান রাজপুত পাঠান মজবুত কামান শরযুত গাজে।
ইত্যাদি।

তবে ভারতচন্দ্রের এই সকল ছন্দ প্রয়োগের মধ্যে সমসাময়িক সংস্কৃতির অবিকল প্রতিফলন লক্ষণীয়। নাগরিক জীবনের রাজপথে যাত্রা করিয়া ভারতচন্দ্রের মধ্যে ছিল সেই জীবন ও সংস্কৃতির কৌলীন্য ও আভিজাত্য। সে জীবনের ছন্দ এবং বেশভূষা ও বিলাস ঐশ্বর্য্যে মজিয়া কবি কেমন করিয়া কাব্যের ছন্দ প্রয়োগে উহার বিলাস ও আভিজাত্য ত্যাগ করিবেন? ভারতচন্দ্র তাই বাছিয়া বাছিয়া পূর্ব্বোদ্ধৃত ভুজঙ্গপ্রয়াত, তূণক ও তোটকাদি সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং বাংলা সংস্কৃত এবং হিন্দী ভাষারও প্রচলিত ও অপ্রচলিত অনেক ছন্দের অদ্ভুত প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু কবি বোধ হয় আত্মবিস্মরণে মাত্র একবার বাংলার ঘরোয়া ধামালী ছন্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

আই আই ওই বুড়াকি এই গৌরীর বর লো।
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগম্বর লো॥ ইত্যাদি।

ইহার উপযুক্ত বিষয়বস্তু তাঁহার কাব্যে প্রচুরই ছিল। কিন্তু এ ছন্দের প্রকৃতির মধ্যে অভাব ছিল নাগরিক রুচিবৈদগ্ধ্যের, নাগরিক ঐশ্বর্য্য ও সৌখীনতার। তাই মনে হয়, কবি সেই বিশেষ সংস্কৃতির ও রুচির মন যোগাইবার জন্যই ইহাকে সযত্নে এড়াইয়া গিয়াছেন।

এইরূপে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে ভঙ্গত্রিপদী, লঘুত্রিপদী, হীনপদত্রিপদী, দীর্ঘ ও লঘুচৌপদী, মালঝাঁপ, একাবলী, ললিত, ভঙ্গপয়ার, দিগক্ষরা, তূণক, ভুজঙ্গপ্রয়াত প্রভৃতি অনেকগুলি নূতন নূতন ছন্দ আছে। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত তিনটিই সংস্কৃত-মূলক।

ভারতচন্দ্র প্রধানতঃ নানা সংস্কৃত ছন্দের বাংলা সাহিত্যে সুন্দর সুষ্ঠু প্রয়োগ দেখাইলেও বাংলা পয়ারাদি ছন্দেরও নানা বৈচিত্র্য ও নবভঙ্গিমা সৃষ্টি করিয়াছেন। পূর্ব্বে এই জাতীয় বাংলা ছন্দের যে জড়তা বা আড়ষ্টতা ছিল, ভারতচন্দ্র তাহাদের জড়ত্ব-শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া অপেক্ষাকৃত সুন্দর ও মনোজ্ঞ রূপ দান করিয়াছেন। এদিকেও তাঁহার কৃতিত্ব ও মৌলিকতা সর্ব্বথা প্রশংসার্হ।

ছন্দের মত অলঙ্কার ব্যবহারেও ভারতচন্দ্র সুকুশলী শিল্পী। তাঁহার কাব্যের আগাগোড়াই অর্থালঙ্কার অপেক্ষা শব্দালঙ্কারেরই প্রাধান্য। কবি কাব্যের অনেক অংশেই শ্লেষ, যমক, বা অনুপ্রাস-রূপ শব্দালঙ্কারের মালা গাঁথিয়াছেন। সে যুগের সৌখীন সংস্কৃতির নিকট এইরূপ আলঙ্কারিক কলাচাতুর্য্যই ছিল উৎকৃষ্ট কবিত্বের নিদর্শন।

সে যুগের জীবন ও সংস্কৃতির মধ্যে যে গতানুগতিকতা, যে পাণ্ডিত্যচাতুর্য্য-বিলাস ছিল, কবির অলঙ্কার প্রকৃতির মধ্যেও উহা সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমসাময়িক জীবন রূপ বা প্রকৃতি যেমন ব্যঞ্জনাবিহীন ও গতানুগতিক, এই সকল অলঙ্কার সেইরূপ ব্যঞ্জনাহীন। সার্থক ও উৎকৃষ্ট কাব্যালঙ্কারের মধ্যে যে গভীর জীবন আদর্শ বা সঙ্কেত নিহিত থাকে, কবির এই সকল শব্দালঙ্কার সেই পরম ধনে একান্ত নিঃস্ব। ইহাদের বহিরঙ্গের বেশভূষা বা অঙ্গরাগ যত উৎকৃষ্টই হউক না কেন, পাঠকের মন বা কল্পনাকে কোথাও ইহারা নিকট হইতে দূরের, রূপ হইতে অরূপের সন্ধান দেয় না। অঙ্গরাগের নানা বৈচিত্র্য বা ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের

প্রায় যাবতীয় অলঙ্কারই সে যুগের সৌখীন ও অলঙ্কার-বিলাসী নাগর জীবনের মতই আন্তরিকতা ধর্ম্মে দীন।

আবার ভারতচন্দ্রের কাব্যের অনেকস্থলে অর্থান্তরন্যাস, দৃষ্টান্ত, ব্যতিরেক প্রভৃতি আভাণক জাতীয় অলঙ্কার দেখা যায়। কিন্তু এগুলি কাব্যের মূল রস বহন করে না, কাব্যের ভাবময় জীবনের সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠতা নাই বলিলেই চলে। পৃথকভাবে অর্থাৎ কাব্যের ভাবময় জীবন হইতে সরাইয়া বিচার করিলে ইহাদের কিছু কিছু শোভা-সৌন্দর্য্য আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার আত্মিক শক্তি গঠনে বা পূরণে ইহারা নিষ্প্রয়োজন। কারণ এগুলির অভাবেও কাব্যের ভাবময় জীবনের কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে না। তাই ছন্দের মত ভারতচন্দ্রের অলঙ্কার-প্রকৃতি পরিচয়ে মনে হয়, কবির কাব্য সমসাময়িক রুচি ও সংস্কৃতির ছায়া মাত্র।

ভারতচন্দ্রের শব্দালঙ্কারের মধ্যে অনুপ্রাসই প্রথম উল্লেখযোগ্য।

কুসুমে পুন পুন ভ্রমর গুণ গুণ মদন ছিল গুণ
ধনুক হুলে।
যতেক উপবন কুসুমে সুশোভন মধুমুদিত মন
ভারত ভুলে।
কমল পরিমল লয়ে শীতল জল পবনে ঢল ঢল
উছলে কূলে। ইত্যাদি

মালিনীর বেসাতির হিসাবে যমকের শ্রেণীবদ্ধ উদাহরণ মিলে।

কাল পেলে শির তোলা দিল যত শির।
দোহাই না মানে হাই কথায় কথায়।
দুই গণ্ডে গণ্ডগোল অলি মাছি তায়।

একই শব্দ একবার বাচ্যার্থে আর একবার লক্ষ্যার্থে প্রযুক্ত এইরূপ যমকের উদাহরণ :

মাটী খেয়ে এমন কৈল কাজ।
পোড়া মাটি খেতে রুচি সারিতে যে লাজ॥

শব্দ শ্লেষের দৃষ্টান্ত :

চন্দ্রমুখী চন্দ্র মুখ ঢাকহ অম্বরে।

এইরূপ শব্দ শ্লেষ ছাড়া অন্নদার আত্মপরিচয়ে শ্লেষ অলঙ্কারের চমৎকার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥ ইত্যাদি।

উপমা অলঙ্কারের দৃষ্টান্তও ভারতচন্দ্রের কাব্যে প্রচুর।

শতদল পদ্মমাঝে সূক্ষ্মদল সাজে।
বিদ্যামুখ পদ্মে দন্ত তেমতি বিরাজে।
না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ।
সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ। ইত্যাদি।

উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত:

এক চক্ষু কাতরায়ে ছোট ঘরে যায়।
আর চক্ষু রাঙা হয়ে বড় জনে চায়,
সন্ধ্যাকালে চক্রবাক্ চাহে যেন লক্ষ্যে
এক চক্ষে তরুণী তরণী আর চক্ষে।

কবি কোন কোন স্থলে লুপ্তোপমার সঙ্গে উৎপ্রেক্ষার সঙ্করও ঘটাইয়াছেন।

বদন মণ্ডল চাঁদ নিরমল ঈষৎ গোঁপের রেখা।
বিকচ কমলে যেন কুতূহলে ভ্রমর পাঁতির দেখা॥

রূপকের সঙ্গে উৎপ্রেক্ষার মিলনে নিম্নলিখিত পংক্তিতে কবি সুন্দর বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

অধর বিম্বর খাইতে মধুর চঞ্চল খঞ্জন আঁখি।
মধ্যে দিয়া থাক বাড়াইল নাক মদনের শুকপাখী॥

ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর কাব্যে রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে যে সমস্ত উপমা রূপকের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাদের কোন স্থানেই কবির মৌলিকতার পরিচয় তেমন নাই। তাহাদের সবগুলিই এ দেশীয় প্রাচীন সাহিত্যে চির প্রসিদ্ধ। কিন্তু অন্যান্য স্থানে কবির নিজত্বের চিহ্ন যথেষ্ট আছে।

প্রতাপ তপনে কীর্ত্তিপদ্ম বিকাসিয়া
রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচল করিয়া।

পরম্পরিত রূপকের ইহা উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

স্থল বিশেষে কবি প্রচলিত ঔপম্যের রূপকেও বেশ বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন।

যে দিকে নয়ন চায় ফুল বরষিয়া যায় মোহকরে
প্রেম মধু ঢালিয়া রে।
নানা তিলফুল পরে অঙ্গুলি চম্পক ধরে নয়ন কমল
কামে টালিয়া রে
দশন কুন্দের দাপে অধর বান্ধুলী চাপে ভারত
ভুলিল ভাল ভালিয়ারে।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে দক্ষের শিবনিন্দা স্থলে যে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত আছে, বাংলাকাব্যে এরূপ নির্দ্দোষ ব্যাজস্তুতির দৃষ্টান্ত খুব সুলভ নহে।

সভাজন শুন জামাতার গুণ,
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই যেথা সেথা ঠাঁই
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়।

কৈলাস পর্ব্বতের বর্ণনায় স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে।

কৈলাস ভূধর অতি মনোহর
কোটি শশী পরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর, যক্ষ বিদ্যাধর,
অপ্সরগণের বাস।
রজনী বাসর, মাস সম্বৎসর,
দুই পক্ষ সাতবার।
তন্ত্র মন্ত্র বেদ, কিছু নাহি ভেদ,
সুখ দুঃখ একাকার॥ ইত্যাদি

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের গুণ কীর্ত্তনে এবং বিদ্যার রূপ বর্ণনার স্থলে কবি ব্যতিরেক অলঙ্কারের মালা গাঁথিয়াছেন :

'চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্রে পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥
দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়
কৃষ্ণচন্দ্রের দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়॥'

বিদ্যার রূপ বর্ণনা :

কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥
কুঞ্জরগামিনী কুঞ্জবিলাসিনী,
লোচন খঞ্জন গঞ্জনী॥

পূর্ব্বে সাধারণ অনুপ্রাসের কথা বলিয়াছি। ভারতচন্দ্রের কাব্যে এক জাতীয় অনুপ্রাসও বহু পরিমাণে দেখা যায়, যেগুলি ঠিক অনুপ্রাস নয়, বা কষ্ট-কল্পিত নয়, বাক্যের মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

বাসার সুসারে হবে আশার সুসার।
হীরারে শিরোপা দিল হীরাময় হার॥
বদনে রদন নড়ে ওদনে বঞ্চিত।
যে মুখ চুম্বনে সুখ না হয় কিঞ্চিত॥

তুল্য-যোগিতার দৃষ্টান্ত :

যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন।
সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ।
তীর তারা উল্কা বায়ু শীঘ্রগামী যেবা।
বেগ শিখিবারে সঙ্গে বেগে যাবে কেবা॥

অতিশয়োক্তির দৃষ্টান্ত :

রসিয়া চতুর করে চাতুরীর সার।
অপরূপ দেখিনু বিদ্যার দরবার।
তড়িৎ ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে।
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণচাঁদে।

বিরোধ অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত :

অচক্ষু সর্ব্বত্র খান অকর্ণ শুনিতে পান অপদ সর্ব্বত্র গতায়তি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি মুখ বিনা বেদ পড়ি সবে দেন কুমতি সুমতি ॥

'বিভাবনা বিনা হেতুং কার্য্যোৎপত্তি র্নিগদ্যতে'—বিভাবনা অলঙ্কারের এই প্রকৃতি অনুসারে এখানে কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যোৎপত্তি হওয়ায় ইহাকে বিভাবনা অলঙ্কারও বলা চলে।

দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের উদাহরণ :

কপাটেতে খিল আঁটা দেখিতে কে পায়।
ডেকে ভুলাইয়া ভৃঙ্গ পদ্মমধু খায়।

বিশেষোক্তি অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত :

করি যদি বিষপান তথাপি না যায় প্রাণ,
অনলে সলিলে মৃত্যু নাই।
সাপে বাঘে যদি খায় মরণ না হবে তায়
চিরজীবী করিল গোঁসাই।

অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কারের দৃষ্টান্তও যথেষ্ট মিলে :

'অভাগা যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।
হেদে লক্ষ্মী হলো লক্ষ্মীছাড়া।'
'একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন'।

অপ্রস্তুত প্রশংসার দৃষ্টান্ত :

সুয়া যদি নিম দেয় সেও হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি ॥

সমাসোক্তি অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত :

কহে একজন যায় মোর মন এ নব রতন ভুবন মাঝে।
বিরহে জ্বলিয়া সোহাগে গলিয়া হারে মিলাইয়া পরিলে সাজে।
আর জন কয় এই মহাশয় চাঁপা ফুলময় খোঁপায় রাখি।
হলদী জিনিয়া তনু চিকনিয়া স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি।

অসঙ্গতি অলঙ্কার :

একের কপালে রহে আরের কপাল দহে
কপালের কপালে আগুন।

পরিবৃত্তি অলঙ্কার :

মনে মনে মনোমালা বদল করিয়া।
ঘরে গেল দুঁহে দুঁহে হৃদয় লইয়া।

অনুকূল অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত :

অপরাধ করিয়াছি হুজুরে হাজির আছি
ভুজ পাশে বান্ধি কর দণ্ড।
বুকে চাপ কুচ গিরি নখাঘাতে চিরি চিরি
দশনে করহ খণ্ড খণ্ড॥

বিরোধাভাস অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত :

একি মনোহর দেখিতে সুন্দর গাঁথয়ে সুন্দর মালিকা।
গাঁথে বিনা গুণে শোভে নানা গুণে কাম মধুব্রত পালিকা॥

ভারতচন্দ্রের কাব্য বা ইহার ভাষা ও ছন্দ অলঙ্কারাদির এই বিশেষ প্রকৃতির মূল কথাই সমসাময়িক নাগর ও দরবারী জীবনের রুচি ও রূপ। ভারতচন্দ্র প্রধানতঃ এই জীবনেরই প্রতিনিধি। এ জীবনের সকল আর্টই অলঙ্কার ধর্ম্মী (decorative) সৃষ্টিমূলক (বা creative) আর্টের সঙ্গে সে জীবনের পরিচয় ছিল না বলিলেই চলে। কাজেই কাব্যের আর্টও অনুরূপ। সে জীবনের মান এতই স্থূল যে সৃষ্টিমূলক বা প্রতীক-ধর্ম্মী আর্টের উদ্ভব তখন সম্ভবই ছিল না। যে সূক্ষ্ম জীবনবোধ বা মননশীলতা, ধ্যান ও কল্পনার ঐশ্বর্য্যে সেই উৎকৃষ্ট আর্টের জন্ম, অষ্টাদশ শতকের জীবনে তাহার উদ্ভবের সম্ভাবনা কোথায়? এই জন্যই ভারতচন্দ্রের কাব্যের আর্ট কবির শব্দ, ছন্দ ও অলঙ্কার—আগাগোড়াই একরূপ অলঙ্কারধর্ম্মী।

অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর কাব্যের প্রায় যাবতীয় চরিত্রই এই অলঙ্কারধর্ম্মী আর্টের বিশুদ্ধ নিদর্শন। দেব বা নর চরিত্রগুলি আগাগোড়াই যেন কবির পাণ্ডিত্য ও শিল্প চাতুর্য্যের বাহন মাত্র। চরিত্র সৃষ্টিতে কবির লক্ষ্য, মনে হয়, জীবন সৃষ্টি অপেক্ষা কলা সৃষ্টির প্রতিই অধিক। তাই অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর

কাব্য বিদ্যাবত্তা ও নানা শিল্প চাতুর্য্যের উৎকৃষ্ট চিত্র হিসাবে শ্রদ্ধা ও সম্মান পাইলেও জীবন-রসসিক্ত উৎকৃষ্ট সাহিত্যরূপে পূজার যোগ্য কিনা বিচার্য্য।

সমসাময়িক বাঙালী সমাজ, বাংলা সাহিত্য ও ভারতচন্দ্র

অষ্টাদশ শতকের মধ্যপাদের বাংলাদেশের নগরগুলিতে সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণুরূপ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। দিল্লীতক্তের মুষ্টি শিথিল, স্থানীয় নবাবী জৌলুষ স্তিমিত, বিদেশী বণিকের মানদণ্ড মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা, চন্দননগর, চুঁচুড়ায় ক্রমশঃ শক্তি সংগ্রহে তৎপর। ক্ষীয়মান রাষ্ট্রপ্রভুত্বের সঙ্গে উদীয়মান বণিকপ্রভুত্বের সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে, এবং রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের দারিদ্র্য ও দুর্ব্বলতা ক্রমশঃ প্রকট হইয়া উঠিতেছে। অথচ রাজদরবারে, দরবারী অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং সাধারণভাবে নাগরসমাজের কেন্দ্রে দরবারী দর্প ও অভিমান, চক্র ও চক্রান্ত, শূন্যগর্ভ আস্ফালন, স্থূল রুচির জাঁকজমক, স্থূল রসরসিকতা, শাঁসবিহীন ঐশ্বর্য্যবিলাসের বিদ্যুৎছটা ইত্যাদির অভাব নাই। ক্ষীয়মান দরবারী নাগর সমাজ যে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, এ সম্বন্ধে চৈতন্যের লেশমাত্র নাই। দেশের বুকের উপর যে একটি বিপর্য্যয় ঘনাইয়া আসিয়াছে, এ সম্বন্ধে যেন কাহারও কোন চেতনা নাই।

বাংলার নাগরজীবনে যখন এই অবস্থা, পল্লীজীবনে তখনও গোষ্ঠীবদ্ধ কৃষিনির্ভর জীবনের ধারা মোটামুটি অব্যাহত। সে জীবনে একদিকে যেমন সরল, সংযত, সীমিত, কৃষিসমৃদ্ধিজাত শান্তি, তৃপ্তি ও আনন্দ তখনও বহমান, অন্যদিকে তেমনই প্রথাবদ্ধ, সংস্কারপীড়িত, প্রভুত্বশোষিত ও নিপীড়িত এবং যুগান্ত-সঞ্চিত মূঢ়তায় আত্মবিস্মৃত জীবনের ধারাও সমান প্রবহমান। যে ধর্ম্ম ছিল মধ্যযুগীয় জীবনধারার বন্ধনগ্রন্থি, সে গ্রন্থি শিথিল হইয়া গিয়াছে, ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মনির্ভরতাও স্তিমিত। কিন্তু ধর্ম্মীয় সমস্ত উৎসব ও আচার অনুষ্ঠান, তাহার সমস্ত বাহ্যরূপ তখনও সক্রিয়; নাগরসমাজে এবং পল্লী-সমাজের উচ্চস্তরে তাহার জৌলুষ ক্রমবর্দ্ধমান। চিরাচরিত জীবনধারার মধ্যে একটা ক্রমাগ্রসর বিপর্য্যয়ের পদধ্বনি শুনা যাইতেছে, সমসাময়িক সামাজিক চিত্রের মধ্যে তাহার আভাস সুস্পষ্ট। এই ধরণের অবস্থার মধ্যে সমাজজীবনের নানা অনাচার ও অব্যবস্থা, নানা ফাঁক ও ফাঁকি অনিবার্য্য। এই সব অনাচার, অবিচার, ফাঁক ও ফাঁকি কাহারও চোখে ধরা পড়ে নাই, একথা

বলিবার মত সাক্ষ্যপ্রমাণ যেমন কিছু নাই, তেমনই ধরা পড়িয়াছিল, তাহা বলিবার মত সাক্ষ্যও নাই। নানা ফাঁক ও ফাঁকি, নানা অনাচার ও অবিচার, নানা ছলাকলা, নানা অভাব-অভিযোগ যেন জনসাধারণের স্বভাব ও চরিত্রের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল।

এই নাগর ও পল্লীজীবনের প্রেক্ষাপটে ভারতচন্দ্রের জীবন ও কর্ম্মকৃতি। কিন্তু ভারতচন্দ্র বিশেষভাবে নাগরিক, তাঁহার জীবনের বিভিন্ন পর্য্যায় নগর জীবনের পরিবেশের মধ্যে উদঘাটিত। অবস্থার পাকে এই নাগরজীবনের বিচিত্র তন্তুজালের সঙ্গে নিজেকেও তিনি জড়াইয়াছিলেন এবং সেই জীবনকেই ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন, যদিও দূর হইতে দেখা পল্লীসমাজের সাধারণ জীবনযাত্রাও তাঁহার একান্ত অপরিচিত ছিল না। ভারতচন্দ্রের বুদ্ধি ও প্রতিভার দৃষ্টি ও সৃষ্টির সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্যণীয় বস্তু এই যে, সেই যুগে এবং সেই পরিবেশের মধ্যে জীবনযাপন করিয়াও পল্লীসমাজের মূঢ়তা ও সংস্কারান্ধতা, দরবারী সমাজের শূন্য-গর্ভ দর্প ও জৌলুষ, নাগরসমাজের অনাচার, বিলাস ও বিভ্রমের মধ্যে তাঁহার দৃষ্টি ও বুদ্ধিকে তিনি আচ্ছন্ন হইতে দেন নাই। জীবিকার প্রয়োজনে শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায় ও দরবারী সমাজের রুচি, অহঙ্কার, অভিমান, বিলাস-লালসার ক্ষুধা তাঁহাকে মিটাইতে হইয়াছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি যখনই যাহা করিয়াছেন, সাংসারিক, ব্যবহারিক প্রয়োজনেই তাহা করিতেছেন, একথা তিনি কখনও বিস্মৃত হন নাই। 'রসাল' হইবে না, 'প্রসাদ গুণ' থাকিবে না জানিয়াও তিনি 'যাবনী মিশাল' ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, সজ্ঞানে সচেতনে তিনি কৃষ্ণচন্দ্র ও পারিষদবর্গের মনস্তুষ্টির জন্য রাজসভার ঐশ্বর্য্য বিলাসের স্তুতি গাহিয়াছেন, নানা স্থূল রসিকতার হাস্যপরিহাসে সমসাময়িক রুচির মন যোগাইয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বাপর তাঁহার তীক্ষ্ণ ও নির্ম্মোহ দৃষ্টির আচ্ছন্নতা কখনও ঘটে নাই। এই সজ্ঞান মনস্তুষ্টি সাধনের আড়ালে আড়ালে অত্যন্ত সুকৌশলে সেই জীবনের প্রতি তাঁহার সুতীক্ষ্ণ শ্লেষ ও বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। পরিপূর্ণভাবে রাজসেবায় নিয়োজিত থাকিয়াও রাজার মুখের সম্মুখেই রাজ-সেবা যে অত্যন্ত খচমচ ব্যাপার তাহাও বলিতে ভুলেন নাই;[৮] সদর দরজার ঐশ্বর্য্য বিলাসের পশ্চাতে জীবনের গভীরে যে ফাঁক ও ফাঁকি, যে অনাচার ও মিথ্যাচার তাহার প্রতি নানা ইঙ্গিতও থাকিয়া থাকিয়া নানাভাবে তাঁহার রচনার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।[৯] ধর্ম্মের ছদ্মবেশ ধরিয়া যে অধর্ম্ম

দেশব্যাপী রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিল, সুবিস্তৃত জীবনের নানাস্তরে ধর্ম্ম ও সমাজের মধ্যে যে আত্মপ্রতারণা, যে ছলনা ও বিভ্রম ক্রমশঃ জাতীয় চরিত্রকে টানিয়া নামাইতেছিল পঙ্কের মধ্যে, তাহাদের মিথ্যা স্তুতি ও মহিমাকীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে তাহাদের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রকাশ এবং ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপের সুদৃঢ় সাহস ভারতচন্দ্রই প্রথম প্রদর্শন করেন।[১০] তদানীন্তন দরবারী ও নাগরজীবনে শূন্যগর্ভ ঐশ্বর্য্য ও বিলাস ব্যসনের স্থূল ও অসংযত জীবনযাত্রার আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহার সত্য ও বস্তুনির্ভর চিত্রখানি তিনিই সর্ব্বপ্রথম উদ্ঘাটিত করেন।[১১] সমসাময়িক কালে সত্যই ভারতচন্দ্রের মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও নির্ম্মোহ দৃষ্টি বোধ হয় আর কাহারও ছিল না; থাকিলেও সাহিত্যে তাহার রূপ এমন করিয়া ধরা পড়ে নাই। যে সমাজের কথা তিনি বলিতেছেন, যাহার চিত্র তিনি উদ্ঘাটিত করিতেছেন, তাহারই মধ্যে বাস করিয়া তাহাকে জীবিকাশ্রয় জানিয়াও এই একান্ত নৈর্ব্যক্তিক নির্ম্মোহ দৃষ্টি রক্ষা করা প্রচলিত রীতিনীতি ও সংস্কারকে, ধ্যান ও ধারণাকে, মত ও বিশ্বাসকে নির্ম্মমভাবে ব্যঙ্গবিদ্রূপে লাঞ্ছিত করা এবং তাহা কুশলীকাব্যের আশ্রয়ে—এ ধরণের কবিকীর্ত্তি বৃহৎ প্রতিভার লক্ষণ, সন্দেহ নাই। ভারতচন্দ্রের কাব্য এক হিসাবে তৎকালীন নাগরজীবনের ব্যঞ্জনা ও ইঙ্গিতময় ইতিহাস এবং তাহাই যথার্থ ইতিহাস, আর একদিকে তাঁহার কাব্য এবং কবিকীর্ত্তিই সমসাময়িক জীবনের শূন্যগর্ভতা, তাহার চারিত্রিক দারিদ্র্য এবং শক্তির দীনতার বিরুদ্ধে প্রবলতম প্রতিবাদ। অবশ্য এই প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছিল শ্লেষ, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের রূপে। পলাশীর যুদ্ধ মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের অবসান ঘটাইয়াছিল, ভারতচন্দ্র মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা, মত ও বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির মূলে বিদ্রূপবাণ হানিয়া মধ্যযুগীয় সংস্কারবদ্ধ মানসের অবসান ঘটাইবার প্রথম প্রয়াস করিয়াছিলেন। ইহাই ভারতচন্দ্রের কবিকীর্ত্তির শ্রেষ্ঠ সার্থকতা।

যে প্রাগ্রসর ও তীক্ষ্ণ নির্ম্মোহ দৃষ্টি ভারতচন্দ্রের কবিকীর্ত্তির মূলে, সেই তীক্ষ্ণ ও বিশ্লেষণী রূপ ভারতচন্দ্রের কবিকর্ম্মের মধ্যেও। কিন্তু এই কবিকর্ম্ম কতখানি সৃষ্টিধর্ম্মী, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। বাংলাদেশে সমস্ত মধ্যযুগ জুড়িয়া যে কবিকুল বিস্তৃত, তাহাদের মধ্যে ভারতচন্দ্রের মত পাণ্ডিত্য ও মনীষা আর কাহারও ছিল বলিয়া মনে হয় না। একাধারে সংস্কৃত, ফারসী, হিন্দী ও উর্দ্দ ভাষায় এমন অধিকার, এমন শাস্ত্রজ্ঞান, সংস্কৃত কাব্য ও কাব্যরূপের সঙ্গে এমন

পরিচয়, অলঙ্কার ও ছন্দ শাস্ত্রের এমন সুগভীর পাণ্ডিত্য, আর কাহারও ছিল না। ভারতচন্দ্রের কবিকর্ম্মে ইহাদের স্পর্শ ও প্রভাব অত্যন্ত গভীর। সেকালের নাগর-জীবনে যেমন প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা এবং ইসলামী সংস্কৃতির ধারা, উত্তর ভারতীয় গাঙ্গেয় উপত্যকার সংস্কৃতির প্রবাহ—সমস্ত একই জীবনের মধ্যে এক মিশ্রিত রূপ গ্রহণ করিয়াছে, তেমনই তাঁহার রচনায়ও নানাভাষা, নানাছন্দ, নানা অলঙ্কার, নানা রুচি, রূপ ও রস, একত্র এক ক্ষেত্রে মিলিত হইয়া এক মিশ্ররূপ ধারণ করিয়াছে। একদিক হইতে দেখিলে মনে হয়, ভারতচন্দ্রের কবিকর্ম্ম সমসাময়িক নাগরজীবনেরই প্রতিরূপ। কিন্তু একথা বিস্মৃত হওয়া কঠিন যে, তৎকালীন নাগর ও দরবারী জীবন একান্তই অলঙ্কারধর্ম্মী, তাহার কেন্দ্রে নূতন জীবন সৃষ্টির কোন উৎস নাই, সে জীবনের গভীরে প্রাণের সমৃদ্ধ প্রবাহ অনুপস্থিত। ভারতচন্দ্রের কবিকর্ম্মও যেন কতকটা তাহাই, সে কবিকর্ম্মও প্রধানতঃ অলঙ্কারধর্ম্মী। যে সূক্ষ্ম, গভীরতর জীবনবোধ, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের ধ্যান, কল্পনা ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে, যে জীবনদর্শনের গভীরতা ও ব্যাপ্তির মধ্যে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের জন্ম, যে সাহিত্যের ভিতর হইতে নূতন জীবন সৃষ্টি লাভ করে, ভারতচন্দ্রের কবিকর্ম্মে সৃষ্টিমূলক সেই সাহিত্যের প্রেরণা যেন শিথিল। তাঁহার সৃষ্ট সমস্ত চরিত্র অলঙ্কারধর্ম্মী আর্টের বিশুদ্ধ নিদর্শন, তাহারা কবির পাণ্ডিত্য ও শিল্প চাতুর্য্যের বাহন। জীবনসৃষ্টি অপেক্ষা আর্ট সৃষ্টিই যেন জীবনের লক্ষ্য। ক্বচিৎ কখনও তিনি নূতন স্বপ্নে নূতন আদর্শে গভীরতর জীবনবোধে বিচলিত হইয়াছেন, যেমন ব্যাসের চরিত্রচিত্রণে, যেমন অন্নদার খেয়াপার হইবার চিত্রে, কিন্তু সাধারণভাবে এই গভীরতর জীবনবোধের পরিচয় ভারতচন্দ্রের রচনায় কিছুটা যেন শিথিল। জীবনের ঐশ্বর্য্যের চেয়েও অলঙ্কারের ঐশ্বর্য্যের প্রতি যেন কবির আকর্ষণ প্রবলতর।

সমসাময়িক জীবনের শূন্যগর্ভতাকে ভারতচন্দ্র তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে নির্ম্মম-ভাবে আঘাত করিয়াছেন, বোধহয় নূতন জীবন-সৃষ্টির প্রয়োজনও অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু কোন্ উৎস হইতে কোন্ মনন-কল্পনা হইতে, এই নূতন জীবনের উদ্ভব ঘটিবে তাহার ইঙ্গিত দান করেন নাই।

চতুর্থ অধ্যায়ের পাদটীকা

১। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমাংশে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২। বিস্তৃততর উদাহরণ এই অধ্যায়ের শেষাংশে দ্রষ্টব্য।

৩। বঙ্গের কবিতা—(১ম ভাগ) অনাথকৃষ্ণদেব

৪। বা. সা. ই. ১ম খণ্ড (২য় সং) পৃঃ ৮০৫,—শ্রীসুকুমার সেন

৫। বাং. ম. কাঃ. ই. ভূমিকা পৃঃ ২৮ (১ম সং)

৬। বৈষ্ণব পদাবলীর কথা বাদ দিলে পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রায় আর সব রচনাই পাঁচালী কাব্য, কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল।

বা. সা. ই. ১ম খণ্ড (২য় সং) পৃঃ ৮৪

৭। ক। নারায়ণ দেবের কাব্যের প্রকৃত নাম মনসার পাঁচালী

'নারায়ণ দেব কয় মনসার পাঁচালী'

বা. ম. কা. ই. (১ম সং) পৃঃ ১৬০

খ। বিপ্রদাস তাঁহার কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন :

'শুক্ল দশমী তিথি বৈশাখ মাসে।
শিয়রে বসিয়া পদ্মা কৈলা উপদেশে॥
পাঁচালী রচিতে পদ্মা করিলা আদেশ।
সেই যে ভরসা আর না জানি বিশেষ॥

বা. ম. কা. ই. (১ম সং) পৃঃ ১৭৬

৮। বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্দ্ধেক চাষ
রাজসেবা কত খচমচ।

অ. ম. পৃ. ৭৬
(সাঃ. প. সং)

৯। ক। দু' সতিনে কোন্দল নহিলে রস নহে।
দোষ গুণ বুঝা চাই কে কেমন কহে॥

অ. ম. পৃ. ৩৭৮
(সা. প. সং)

খ। 'এ সুখে বঞ্চিত করি রায়গুণাকর।
দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর॥'

অ. ম. পৃ. ৩৭২
(সাঃ. প. সং)

১০। ক। 'অবিজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ পতি গণক রাজার।
বারবেলা কালবেলা সদা সঙ্গে তার॥'

অ. ম. পৃ. ২৮৯

খ। মৌলিক কায়স্থ জাতি পদবীতে হোড়।
কতকষ্টে মিলে এটে নাহি মিলে থোড়॥
বায়াত্তরে কায়স্থ বলিয়া গালি আছে।
বসিতে না পান ভাল কায়স্থের কাছে॥

অ. ম. পৃ. ১৬২

১১। ক। বৎসর পনর ষোল বয়স আমার।
ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগার ভাতার॥

অ. ম. পৃ. ৩২৫

খ। পাটনি বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল॥

অ. ম. পৃ. ১৮১

পঞ্চম অধ্যায়

রামপ্রসাদ

চতুর্থ অধ্যায়ে ভারতচন্দ্র প্রসঙ্গেই বলিয়াছি, অষ্টাদশ শতকের বাংলাদেশের ভদ্র, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত স্তরে সংস্কৃতি ও বৈষয়িক ব্যাপারে সংস্কৃত ও ফারসী শিক্ষার উভয় ধারাই বহমান। সম্ভ্রান্ত ও উন্নত হিন্দুর পক্ষে, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণ-বৈষ্ঠ-কায়স্থ এই তিন শ্রেণীর বর্ণহিন্দুর কাছে, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাই ছিল কুলগত শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতির পরিচয়। কুল, আচার বা সংস্কৃতিগত জীবনের পরিচয় যেমন ছিল সংস্কৃতশিক্ষার ভিতর, তেমনই আবার নবাবী আমলের বৈষয়িক বা কর্ম্মজীবনের খাতিরে প্রয়োজন ছিল ফারসীশিক্ষার। এজন্য সমসাময়িক শিক্ষা ও কর্ম্মজীবনপ্রবাহ একই সঙ্গে সংস্কৃত ও ফারসী এই উভয় খাতেই প্রবহমান, বিশেষতঃ মুর্শিদাবাদ-নদীয়া-কৃষ্ণনগরের দরবারী অঞ্চলের চারিদিকে।

ভারতচন্দ্রের মত রামপ্রসাদও এই ফারসী—সংস্কৃতমিশ্র যুগপরিবেশেই মানুষ। তবে রামপ্রসাদের ক্ষেত্রে সংস্কৃতাশ্রয়ী যে সাধনা ও ঐতিহ্য সক্রিয়, তাহা ভারতচন্দ্র হইতে কিছুটা স্বতন্ত্র প্রকৃতির। একথা অনস্বীকার্য্য যে, রামপ্রসাদের সাহিত্যেও সংস্কৃত শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষণীয় এবং তিনিও প্রথম জীবনে কালপ্রথানুসারে বিদ্যাসুন্দর, কৃষ্ণকীর্ত্তনাদি সাহিত্য রচনা অর্থাৎ মধ্যযুগীয় সাহিত্যসাধনার ধারাই অনুসরণ করেন। কিন্তু রামপ্রসাদের কৌলিক জীবনে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃত শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব ও প্রভুত্ব ভারত-চন্দ্রের মত প্রবল ছিল না; শিক্ষাদীক্ষার নাগরিক ও রাজকীয় প্রতিবেশও ছিল না। রামপ্রসাদের জীবনের বেশীর ভাগ কাটিয়াছিল গ্রাম্য কৃষিনির্ভর জীবনের পরিবেশের মধ্যে। এজন্য রামপ্রসাদী সাহিত্যের ভাব, ভাষা বা ছন্দ ও অলঙ্কারের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতসাধনার প্রভাব তেমন অত্যুগ্র নহে। আবার রামপ্রসাদের প্রতিভার রূপও ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। ভারতচন্দ্রের মত পাণ্ডিত্যপ্রতিভা রামপ্রসাদের ছিল না। বংশানুক্রমিক যে বিদ্যাবত্তা বা পাণ্ডিত্যের ধারা ভারতচন্দ্রের প্রতিভার মধ্যে প্রবাহিত, রামপ্রসাদের মধ্যে সে ধারার প্রবাহ ক্ষীণ। প্রসাদের সাহিত্য-সাধনায় সাংস্কৃতিক পাণ্ডিত্য বা বিদ্যা

অপেক্ষা সহজ লোকায়ত সাহিত্যের প্রভাব বেশী সক্রিয়। কিন্তু প্রথমপর্ব্বের সাহিত্য-সাধনায় প্রসাদের প্রতিভার এই সহজ প্রকাশ ধরা পড়ে না। বিদ্যাসুন্দর, কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভৃতি কাব্যে প্রসাদের যে সাহিত্যবুদ্ধি ধরা দিয়াছে, তাহা একান্তই শিক্ষিত ভদ্রস্তরের যুগোচিত সাহিত্য-সাধনার মামুলীরূপ। এই কারণেই প্রসাদী বিদ্যাসুন্দর বা কৃষ্ণকীর্ত্তন এই জাতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন স্থান গ্রহণ করিতে পারে নাই; তাঁহার বিশিষ্ট প্রতিভার শীল-মোহর এই কাব্য দুটিতে নাই। ইহার শিল্প বা আর্ট সমসাময়িক, বিশেষ করিয়া ভারতচন্দ্রের কাব্যের শিল্প বা কলাচাতুর্য্যের নিকট পরাজিত ও ম্লান।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর—ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা:

সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কৃষ্ণরাম এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ উভয়েই প্রাচীন 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া কাব্যরচনা করিয়াছেন। কাব্যের মূল আখ্যানভাগ উভয়ের কাহারও নিজস্ব নহে। সম্ভবতঃ সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর কাব্যকে আশ্রয় করিয়া বাংলাভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনার সূত্রপাত হয়। কে যে বাংলার বিদ্যাসুন্দর কাব্যের প্রথম কবি, তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া বলা কঠিন। কঙ্ক, শ্রীধর কবিরাজ বা সাবিরিদ খাঁর বিদ্যাসুন্দর আমরা দেখি নাই, পত্রিকায় আলোচনা হইতে সামান্য পরিচয় পাইয়াছি মাত্র। (১) আমরা বর্ত্তমানে যে কয়টি কবির বিদ্যাসুন্দর কাব্যের সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত, তাহাদের মধ্যে গোবিন্দদাসই প্রাচীনতম। কিন্তু আমাদের আলোচ্য কাব্যদ্বয়ের আদর্শ যোগাইয়াছিল সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কৃষ্ণরামের 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর'। ইহাকে মঙ্গলকাব্য বলিয়া উল্লেখ করিলেও আমরা অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের ন্যায় দেবীর জীবনী লইয়া কোন পৌরাণিক কাহিনীর সন্ধান পাই নাই। কেবল বিদ্যাসুন্দর কাব্যখানিই আমাদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। কৃষ্ণরাম, কাব্যের কাহিনী সম্ভবতঃ প্রচলিত আখ্যান বা সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বিদ্যাসুন্দর কাব্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং মুকুন্দরামের চণ্ডিকামঙ্গল তাঁহাকে কাব্যের উপাদান সংগ্রহে যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কৃষ্ণরাম, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের কাব্য তিনটির বিষয়বস্তু তুলনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, কৃষ্ণরামের কাব্যই পরবর্ত্তী কবিদ্বয়ের আদর্শ ছিল। আমরা প্রথমে তিনটি কাব্যের বিষয়বস্তুর আলোচনা করিয়া পরে চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর কাব্যখানিকে একটি স্বতন্ত্র কাব্য হিসাবেই রচনা করিয়াছেন, কারণ কাব্যের আদিতে যে দেবদেবী বন্দনা থাকে, তাহা এই দুই কাব্যেই বর্ত্তমান এবং কৃষ্ণরাম সেইসঙ্গে আপনার বংশপরিচয়ও দিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর তাঁহার অন্নদামঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত, সুতরাং তাহাতে পৃথক্‌ভাবে দেবদেবীবন্দনা নাই।

ভারতচন্দ্রের কাব্য এইভাবে আরম্ভ হইয়াছে—বর্দ্ধমানের রাজা বীরসিংহের কন্যা পণ করিয়াছেন, তাঁহাকে যে বিদ্যায় পরাস্ত করিবে সেই তাঁহার পতি হইবে। কিন্তু কোন রাজপুত্রই বিদ্যাকে পরাস্ত করিতে পারিল না। ভারতচন্দ্র লিখিতেছেন—রাজা বীরসিংহ বিদ্যার বিবাহের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন, শেষে লোকমুখে শুনিলেন, কাঞ্চীদেশের রাজা গুণসিন্ধুরায়ের পুত্র সুন্দর 'বড় রূপগুণযুক্ত', সে বিদ্যাকে বিদ্যায় পরাস্ত করিতে পারিবে। রাজা তৎক্ষণাৎ এক ভাটকে পত্র দিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ভাট গিয়া সুন্দরকে পত্র দিল। পত্র পড়িয়া সুন্দরের বর্দ্ধমানে আসিতে বাসনা হইল এবং ভাটকে বিরলে লইয়া গিয়া বিদ্যার রূপগুণের পরিচয় লইলেন। ভাটের বর্ণনা শুনিয়া সুন্দরের কৌতূহল বর্দ্ধিত হইল। সেই অবধি,

'বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যা নাম জপ।
বিদ্যালাপ বিদ্যালাপ বিদ্যালাভ তপ।
হায় বিদ্যা কোথা বিদ্যা কবে বিদ্যা পাব।
কি বিদ্যা প্রভাবে বিদ্যা বিদ্যমানে যাব॥

এই অবস্থা হইল এবং শেষে ঠিক করিলেন—

'একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন॥'

সুন্দর কালীর আরাধনা করিলেন, দেবী আকাশবাণীতে বলিলেন:

'চল বাছা বর্দ্ধমান বিদ্যালাভ হবে।'

সুন্দর বর্দ্ধমান যাত্রার উদ্যোগ করিলেন।

রামপ্রসাদের কাব্যে একটু ভিন্নভাবে আরম্ভ হইয়াছে:

বীরসিংহ কন্যার প্রতিজ্ঞা অনুসারে পাত্র না পাইয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলে নিকটে মাধবভাট ছিল, সে বলিল কিছুদিন অপেক্ষা করিলে সে উপযুক্ত পাত্র খুঁজিয়া আনিয়া দিতে পারে। রাজা তাহাকে শিরোপা করিলেন, উপহার দিলেন ও একটা ঘোড়া দিলেন এবং এইবার উপযুক্ত বর মিলিবে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রাজকার্য্যে মন দিলেন। গোঁপে পাক দিয়া ঘোড়ায়··চড়িয়া মাধবভাট রাজকন্যার পতি অন্বেষণে বাহির হইল। বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া শেষে কাঞ্চীদেশে উপস্থিত হইয়া—

'পাঠশালে পড়ুয়া সঙ্গে সুকবি সুন্দর রঙ্গে
রূপ দেখি ভট্ট হরষিত
কোন শাস্ত্রে নাহি ত্রুটি যে যে কহে দৃঢ় কোটি
ক্ষণমাত্রে তাহার সিদ্ধান্ত
মাধব জানিল দড় ভবানীর ভক্ত বড়
নিতান্ত বিদ্যার এই কান্ত ॥'

তাহার পর বারবার পড়িল এবং স্তব ও নমস্কার করিয়া হিন্দি ভাষায় বলিল:

'বীরসিংহ নাম রাজা জাতমে হেয় বড়া তাজা
শোন্ হোঁগে ওনকা জেকের।
ওনক ঘরমে লেড়্কী এক তারিফ করোঁ মে কেওকে
রাত দেন সাদিকা ফেকের॥
কওল এত্না কি হেয়ও হজি-মৎ হি দেগায়েও
শাস্ত্রমে ওহি ওস্কা নাথ।
তোমারা হোঁ এসা জান যো কহোঁ সো কহা মান,
তোম সকোগে তাও হামারে সাথ॥'

সুন্দর তাহাকে বিরলে লইয়া গিয়া বিশেষ করিয়া সকল শুনিয়া—

'বিবাহ হইল বাই পক্ষী হৈয়া উড়ে যাই
নিবসি রমণী মণি যথা।
পিয়া বিদ্যা নামসুধা সুন্দরের গেল ক্ষুধা
রত্নাগারে করিলা শয়ন।'

রাত্রিশেষে কালী আসিয়া স্বপ্নাদেশ দিলেন এবং ভবিষ্যতে কি হইবে মোটামুটি তাহাও জানাইয়া দিলেন। কালী তাঁহাকে একা যাইতে উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। প্রভাতে উঠিয়া সুন্দর বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন।

কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গলের যে দুইটি পুঁথি (২) বর্ত্তমানে পাওয়া যায়, তাহাতে কাহিনীটি কতকটা যেন হঠাৎ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। নায়ক-নায়িকার পরিচয়, বিদ্যার প্রতিজ্ঞা, ভাটপ্রেরণ, সুন্দরের ভাটমুখে বিদ্যা-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বীরসিংহ দেশে আসিবার বাসনা—ইত্যাদি কোন কিছুরই উল্লেখ নাই। সুন্দরের বিদ্যা অন্বেষণে বহির্গত হইবার কারণ কোন পুঁথিতেই নাই। সম্ভবতঃ পুঁথি দুইটির এই অংশ খণ্ডিত। কবি পরে যে মাধবভাটকে সুন্দরের বধ্যভূমিতে উপস্থিত করাইয়াছেন, কাব্যের আদিতে তাহার নামোল্লেখও নাই। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় (৩)

রামপ্রসাদ মূলতঃ কৃষ্ণরামের বিষয়সূচী অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের জাগরণারম্ভে 'বিদ্যার পাত্রান্বেষণে মাধবভাটের কাঞ্চীপুর গমন'এর কথা আছে। আমাদের মনে হয়, এই অংশটি পুঁথি দুইটি হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষ্ণরামের কাব্য এইভাবে দ্বিতীয় প্রসঙ্গ অর্থাৎ 'সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা' হইতে আরম্ভ হইতেছে :

'সুন্দর সুন্দর নাম রাজার নন্দন।
পূজিয়া পরমদেবী করিল গমন॥
স্বপনে শিবার কথা সত্য মনে লয়ে।
পাইবে রমনী-মণি আনন্দ হৃদয়ে॥
জনকেরে না বলিল না জানে জননী।
একাকী করিল গতি কবি-শিরোমণি॥'

রামপ্রসাদের কাব্যের দ্বিতীয় প্রসঙ্গ 'সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা'ও এইভাবে আরম্ভ হইয়াছে :

'স্বপ্নে শৈলসুতা আজ্ঞা সত্য মনে বাসি।
জায়া হেতু যোগে যাত্রা করে গুণরাশি॥
বিল্বপত্র আঘ্রাণ লইলা গুণধাম।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণহেতু জপে দুর্গানাম॥'

কিন্তু সুন্দর পিতামাতাকে লুকাইয়া বিদ্যা অন্বেষণে যাত্রা করিয়াছিল কিনা রামপ্রসাদ তাহা বলেন নাই।

ভারতচন্দ্র সংক্ষেপে 'বিদ্যাসুন্দর কথারম্ভ' প্রসঙ্গে নায়ক-নায়িকার পরিচয় ও ভাটের বিদ্যার পাত্র অন্বেষণে বীরসিংহের সভায় আগমনের কথা বলিয়া দ্বিতীয় প্রসঙ্গে 'সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা' বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি দেবীর স্বপ্নাদেশের পরিবর্তে আকাশবাণীর উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিতেছেন:

'জনক জননী ভয়ে ভাটে না জানায়'।

ভারতচন্দ্রের সুন্দর নিতান্ত একাকী যাত্রা করেন নাই। পিঞ্জরসহ পড়া শুককে সঙ্গে লইয়াছিলেন।

কৃষ্ণরামকে অনুসরণ করিয়া রামপ্রসাদ সুন্দরকে দেবীর মায়ায় সৃষ্ট গভীর অরণ্য ও বেগবতী নদী পার করাইয়াছেন। ভারতচন্দ্র এইসকল মধ্যযুগসুলভ দৈবী মায়ার অবতারণা করেন নাই, সরাসর বেগবান্ অশ্বে নায়ক সুন্দরকে "কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান ছ'মাসের পথ" ছয়দিনে পৌছাইয়া দিয়াছেন। কৃষ্ণরাম দশ দিনে পাঁচমাসের পথ এবং রামপ্রসাদ ঐ সময়ে ছয় মাসের পথ অতিক্রম করাইয়াছেন। কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ দেবীর মায়ার অবতারণা করিয়াছেন, অশ্বের বা অশ্বারোহীর কৃতিত্ব কিছুই নাই, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বাস্তববাদী ভারতচন্দ্র বলিতেছেন:

'সোয়ারির অশ্ব আনে গমনে বাতাস' এবং
'অশ্বের শিক্ষায় নল বিপক্ষে অনল।
চলিল কুমার যেন কুমার অটল॥
তীর তারা উল্কা বায়ু শীঘ্রগামী যেবা।
বেগ শিখিবারে বেগে সঙ্গে যাবে কেবা॥'

এইবার আমরা বিদ্যার পিত্রালয় সম্বন্ধে আলোচনা করিব। সংস্কৃতে বিদ্যাসুন্দরের যে অংশ মুদ্রিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, তাহা অসম্পূর্ণ—নায়ক-নায়িকার পরিচয় তাহাতে নাই। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের নিকট যে পুঁথিটী আছে, তাহাতে (৪) বিদ্যার পিত্রালয় উজ্জয়িনী বলিয়া উল্লিখিত আছে। কাশীনাথের 'বিদ্যাবিলাপ' কাব্যে ও অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন কবি নিধিরামের বিদ্যাসুন্দরে ঐ উজ্জয়িনীর উল্লেখ আছে। (৫) আশ্চর্য্যের বিষয়, কৃষ্ণরামের

যে দুইটি পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে নগরের নাম নাই, কোনখানে কেবল গৌড়দেশ এবং অধিকাংশস্থলে 'বীরসিংহদেশ' বা 'বীরসিংহপুরী' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, বলরাম কবিশেখর ও দ্বিজ রাধাকান্ত ইহা বর্দ্ধমান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিজ রাধাকান্ত ভারতচন্দ্রের পরবর্ত্তী। অপর তিনজনের মধ্যে কে প্রাচীনতম তাহা লইয়া মতভেদ আছে। বলরামের 'কালিকামঙ্গলের' ভূমিকায় শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভারতচন্দ্র অপেক্ষা বলরামের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যে যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বলরামের কাব্য যে ভারতের পূর্ব্বে তাহা মনে করিবার কোন হেতু নাই। ভাষায় এমন কিছু নাই, যাহা হইতে তাহা অনেক পূর্ব্বের ভাষা বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণরাম রচিত বিদ্যাসুন্দরের তারিখ ১৫৯৮ শক অর্থাৎ ১৬৭৬—৭৭ খ্রীষ্টাব্দ (৬) ভারতচন্দ্রেব বিদ্যাসুন্দর রচনার প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে। রামপ্রসাদের ভাষা ও কৃষ্ণরামের ভাষা তুলনা করিলে আকাশ পাতাল কিছু প্রভেদ পাওয়া যায় না। কৃষ্ণরামের পূর্ব্বে যে বলরাম বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাহার উপর সুন্দরের শুকপক্ষী, বিদ্যার পিত্রালয় বর্দ্ধমান—এগুলি বলরাম, ভারতচন্দ্রেরই নিকট ধার করিয়াছেন। যাহা হউক, কোন যুক্তির দ্বারাই বলরামের ন্যায় একজন অখ্যাতনামা কবিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিকুল-চূড়ামণির পথপ্রদর্শক বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না।

এখন রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের মধ্যে কে প্রাচীনতর, তাহাই দেখা যাউক। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রামপ্রসাদকে যে ৫১ বিঘা মহাত্রাণ দান করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তাঁহার কবিরঞ্জন উপাধি ব্যবহার করেন নাই অথচ কৃষ্ণচন্দ্রই এই উপাধি দান করিয়াছিলেন এবং রামপ্রসাদ তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্যের ভণিতায় সর্ব্বত্র এই উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। পরবৎসব অর্থাৎ ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র ইহলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং যে রামপ্রসাদ নিতান্ত অনুগতের ন্যায় কৃষ্ণরামের কাব্যের বিষয়বস্তুকে অনুসরণ করিয়াছেন, (৭) তিনি যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের তুষ্টিসাধনের জন্যই ভারতচন্দ্রের অনুসরণ করিয়া বিদ্যার পিত্রালয় বর্দ্ধমানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়, তিনি একাধিকবার কৃষ্ণরামকে অনুসরণ করিতে গিয়া 'বর্দ্ধমান' না লিখিয়া 'বীরসিংহদেশ' লিখিয়াছেন। আমরা ক্রমশঃ দেখাইব, রামপ্রসাদ কি পরিমাণে ভারতচন্দ্রের নিকট ঋণী।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিত ভারতচন্দ্রের জীবনী হইতে জানা যায়, বর্দ্ধমানের মহা-রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের মাতা মহারাণী বিষ্ণুকুমারী ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণের নিকট হইতে ভারতচন্দ্রের পৈত্রিক ভিটা ভবানীপুরের গড় ও পেঁড়োরগড় বলপূর্ব্বক দখল করিয়া বহু অর্থ ও অস্থাবর সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লন। ইহার জন্য ভারতচন্দ্রের বর্দ্ধমান রাজবংশের প্রতি আক্রোশ ছিল এবং প্রবাদ যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত বর্দ্ধমান-পতির মনান্তর ছিল, সুতরাং তিনি বর্দ্ধমান রাজকুলের কলঙ্ক-সূচক এই ইতিহাসের সহিত আপনার সংস্রব রাখিবার নিমিত্ত নিজ সভাসদ্ ভারতচন্দ্রকে এই বিষয়ের এক নূতন ইতিহাস রচনা করিতে অনুমতি করেন (৮) এইভাবেই উজ্জয়িনীর পরিবর্ত্তে বর্দ্ধমানের উদ্ভব বলিয়া মনে হয়।

কৃষ্ণরাম বীরসিংহদেশের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চোখের সম্মুখে মোগলযুগের কোন শহরকেই আদর্শ রাখিয়াছেন, প্রাচীন হিন্দুরাজার রাজধানীর কোন চিহ্ন ইহাতে নাই। বীরসিংহের রাজধানী,

'রাজ্যজুড়ি গড় খাই বাঁশেও না পাই ঠাঞি
বাইয়ে ফিরান যায় কোশা'

কৃষ্ণরাম যেখানে একটিমাত্র গড়ের উল্লেখ করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র সেখানে ছয়টি গড়ের বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহা যে মোগলযুগের শেষ ও ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভের কোন শহর, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়—

'প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস।
ইংরেজ ওলন্দাজ ফিরিঙ্গি ফরাস॥
দিনামার এলেমান করে গোলন্দাজী।
সফরিয়া নানাদ্রব্য আনয়ে জাহাজী॥'

রামপ্রসাদের বর্ণনায় কৃষ্ণরাম ও ভারতচন্দ্র উভয়েরই স্পষ্ট ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়। রামপ্রসাদ সাতটি গড়ের উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতচন্দ্রের ন্যায় পৃথক বর্ণনা করেন নাই। তবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে যে বিষ, ভারত, চীন প্রভৃতি প্রাচ্যদেশে ইংরেজগণ পরিবেশন করিতে আরম্ভ করেন, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে:

'আফিঙ্গে হামেশা মস্ত হুঁসিয়ার দরবস্ত
ঘুমে আঁখি কুমারের চাক'

এবং বাঙালী রাজার প্রহরীকে দিয়া বাঙ্গালীকে গালি দেওয়াইয়া নবাবী আমলের চিত্র বর্ণনা করিয়াছেন :

'ওরে বহিনা ভুরজারি এয়সারে শ্বশুরা গারি
বাঙ্গালিরে দেখে যেন ভেড়া।'

সুন্দরের সহিত কোতোয়ালের প্রথম দর্শন এইভাবে রামপ্রসাদ বর্ণনা করিয়াছেন ::

'হাতির আমারি পিঠে বাঘাই কোটাল।
শমন সমান দর্প দুই চক্ষু লাল॥
চৌগোঁফা ম্রজাই দাড়ি খুলিয়াছে ভাল।
সফেদ পোষাকপরা কলেবর কাল॥
রক্তচন্দনের ফোঁটা বিরাজিত ভালে।
পূর্ব্বদিক প্রকাশ যেমত উষাকালে॥

* * *

নকিব ফুকারে সদা হাজারির ভুর।
সহরে সোরত পড়ে রায় বাহাদুর॥
সুন্দর হাসেন মনে, থাক দিন কত।
পাছে যাবে বুঝা পড়া বাহাদুরি যত॥'

আমরা এইখানে কৃষ্ণরামের বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি :

'সহর ভ্রমিতে তথা বাঘাই কোটাল।
খোরাসানি খঞ্জর কোমরে খরধার॥
কবিবর উপরে আমারি মাঝে বসি।
সমুখে কামান তীর ধরি রাশি রাশি॥
পাকাইয়া নয়ান যাহার পানে চায়।
চমকে অমনি তনু তরাসে কাঁপায়॥

* * *

শিঙ্গাকাড়া করতাল চোখড়ি ঘোড়ায়।
বারবধূ বার সাথে ভ্রমিয়া বেড়ায়॥
তাহা দেখি মনে করে রাজার নন্দন।
পশ্চাৎ বুঝিব ভায়া চতুর কেমন॥

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, রামপ্রসাদ কৃষ্ণরামের নিকট কতখানি ঋণী। ভারতচন্দ্র কোটালের রূপের বিশেষ বর্ণনা করেন নাই, তাহার শাসনের কঠোরতার বর্ণনা দিয়াছেন :

'কোটালের ভয়ে কেহ নাহি করে দয়া।
দেখিয়া সুন্দর ভয়ে ভাবেন অভয়া॥'

কোটালকে দেখিয়া ভারতচন্দ্রের সুন্দর ভীত হইয়াছেন। গোপনে রাজ-কন্যার প্রণয়প্রার্থী বিদেশী রাজকুমারের পক্ষে ইহা অধিকতর শোভা পাইয়াছে।

কোটালের স্থান অতিক্রম করিয়া সুন্দর সরোবর তীরে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণরাম তাঁহাকে কদম্বতলে 'যদু চাঁদের' মত বসাইলেন, কিন্তু ভারতচন্দ্র ও রাম-প্রসাদের সুন্দর বসিলেন বকুলতলায়। কৃষ্ণরাম ঘর্ম্মসিক্ত তনু রাজকুমারকে দেখিয়াই নগর কামিনীগণের

"অবশ শরীর হৃদয় অস্থির
খসি পড়ে কাঁখে কুম্ভ॥"

বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; সরোবরে সুন্দরের স্নানের কথা লিখেন নাই। রামপ্রসাদের সুন্দরও সরোবরে স্নান করেন নাই, কিন্তু ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"স্থলজ জলজ ফুল প্রফুল্ল তুলিলা।
স্নান করি শিব শিবা চরণে পূজিলা॥
সঙ্গেতে দাড়িম ছিল, ভাঙ্গিয়া কৌতুকে।
আপনি খাইলা কিছু কিছু দিলা শুকে॥
করে লয়ে এক পদ্ম লইলেন ঘ্রাণ।
এই ছলে ফুলধনু হানে ফুলবাণ॥
আকুল হইয়া বৈসে বকুলের মূলে।
দ্বিগুণ আগুন জ্বালে বকুলের ফুলে॥
হেনকালে নগরিয়া অনেক নাগরী।
স্নান করিবারে আইলা সঙ্গে সহচরী॥

কৃষ্ণরাম কুলবতীগণকে কামোন্মত্তা করেন নাই, কেবল তাহাদের চিত্ত-চাঞ্চল্যের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন এবং রূপবান্ রাজকুমার সুন্দরকে তাহারা ছদ্মবেশী দেবতা বলিয়াই মনে করিয়াছিল, তাহাই বলিতে চাহিয়াছেন। ভারত-চন্দ্রের নগর-নাগরীগণ কোন কল্পনার আশ্রয় লয় নাই, তাহারা মোগলযুগের

শেষাংশসুলভ বিলাসিনীগণের মতই রূপবান্ যুবককে দেখিয়া কামোন্মত্তা হইয়া উঠিয়াছিল। কবির লেখনীতে এই চিত্র অপূর্ব্বরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে :

'দেখিয়া সুন্দর রূপ মনোহর
স্মরে জর জর যত রমণী
করবী ভূষণ কাঁচুলী কষণ
কটির বসন খসে অমনি ॥
চলিতে না পারে দেখাইয়া ঠারে
এবলে উহারে দেখলো সই।
মদন জ্বালায় মরম গলায়
বকুল তলায় বসিয়া অই ॥
আহা মরে যাই লইয়া বালাই
কুলে দিয়ে ছাই ভজি ইহারে।
যোগিনী হইয়া ইহারে লইয়া
যাই পলাইয়া সাগরপারে ॥

সেই ভাগ্যবতী এই যার পতি
সুখে ভুঞ্জে রতি মন আবেশে।
এ মুখ চুম্বন করয়ে যখন
না জানি তখন কি করে শেষে ॥
রতি মহোৎসবে এ কর পল্লবে
কুচ ঘট যবে শোভিত হবে।
কেমন করিয়া ধৈরজ ধরিয়া
গুমানে মরিয়া গুমান রবে ॥
হেন লয় চিতে রতি বিপরীতে
সাধিতে পাড়িতে ভর না সহে।
সুজনে মিলিত সুজনে রচিত
এই সে উচিত ভারত কহে ॥"

রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের অনুকরণে চতুষ্পদী ছন্দে এই উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন

বটে, কিন্তু তাহাতে এমন কাব্য-ফুটিয়া উঠে নাই, অনুকরণের জড়তা মূর্ত্ত হইয়া আছে, বরং স্থানে স্থানে কবিত্ব অভাবে অশ্লীল হইয়া পড়িয়াছে :

'কেহ কহে আজি ওকে করে রাজী
শেষে দিয়া বাজী, না দিব ছেড়ে।
শাশুড়ী শ্বশুর নাহি পতি দূর
শূন্য মোরপুর কে দিবে তেড়ে॥
কহে কোন নারী হয় আজ্ঞাকারী
ভুলাইতে পারি এগুণ আছে।
বিধবা যেগুলা বিষম ব্যাকুলা
চক্ষে দিয়া ধূলা, লবে গো পাছে॥'

রামপ্রসাদ অধিকন্তু নাগরীগণের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং অনুকরণ বৃত্তি হেতু তাহাদের মুখ দিয়া কৃষ্ণরামের অনুকরণে সুন্দরকে দেবতা বলিয়া ভ্রম করার কথা বলাইয়াছেন।

ইহার পর সুন্দরের সহিত মালিনীর সাক্ষাৎ। কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের মালিনী বিদ্যার গৃহে ফুল যোগাইয়া ফিরিবার পথে লোকমুখে সুন্দরের কথা শুনিয়া তাহাকে দেখিতে আসিল। সুতরাং এই সাক্ষাতের সময় নিশ্চয়ই মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে। কিন্তু ভারতচন্দ্র স্পষ্ট বলাইয়াছেন :

'সূর্য্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী।
হেনকালে ওথা এক আইল মালিনী॥'

কৃষ্ণরাম মালিনীর রূপ বর্ণনা করেন নাই, রামপ্রসাদও করেন নাই, পরে তাহার পরিবর্ত্তে আভাস দিয়াছেন মাত্র এবং ভারতচন্দ্রও নামটি ধার লইয়াছেন। কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের সুন্দর-মালিনী-সাক্ষাৎ তুলনা করিলে অনুকরণের প্রমাণ সহজেই ধরা পড়ে। ভারতচন্দ্র চোখের সম্মুখে হীরাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন :

'কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজাদোলা হাস্য অবিরাম॥
গাল ভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে।
কাণে কড়ি কড়ে রাঁড়ী কত কথা ছলে॥
চূড়া বান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী।
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥

আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥
ছিটা ফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র আছে কতগুলি।
চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় চক্ষে দিয়া ঠুলি॥
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়।
পড়শী না থাকে কাছে কন্দলের দায়॥
মন্দ মন্দ গতি ঘন ঘন হাতনাড়া।
তুলিতে বৈকালে ফুল আইল সেই পাড়া॥"

কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের সুন্দর সেইখানে অকপটে মালিনীর নিকট আত্মপরিচয় দিয়া ফেলিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের সুন্দর নিজ পরিচয় না দিয়া ছলে আপন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন, মালিনী তাহা বুঝিতে পারে নাই :

'সুন্দর কহেন আসি বিদ্যা ব্যবসাই।
এসেছি নগরে আজি বাসা নাহি পাই॥
ভরসা কালীর নাম বিদ্যালাভ আশা।
ভাল ঠাঁই পাই যদি তবে করি বাসা॥'

রামপ্রসাদের সুন্দর আপন পরিচয় দিয়া ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া ভারতচন্দ্রের অনুকরণে বলিয়াছেন :

কিন্তু বিদ্যা ব্যবসাই বিদ্যা অন্বেষণে যাই
বিদ্যা হেতু বিদেশে গমন॥
অধিক কহিব কিবা বিদ্যা বিদ্যা রাত্রি দিবা
মনে মনে একান্ত ভাবনা।
সেবি বিদ্যা বিদ্যালাগি হইয়াছি দেশত্যাগী
যদি বিদ্যা পুরাণ কামনা॥'

'বিদ্যা' শব্দের বিভিন্ন অর্থের উপর বাহাদুরি দেখাইয়া রামপ্রসাদ কাব্যরচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা যে ভারতচন্দ্রের অনুকরণ মাত্র তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের মালিনী আপনা হইতে সুন্দরের সহিত 'মাসী' পাতাইয়াছে, কিন্তু ভারতচন্দ্র লিখিতেছেন:

'কিন্তু মাগী একা থাকে দেখি নষ্ট রীত।
দুর্ব্বুদ্ধি ঘটায় পাছে হিতে বিপরীত॥
মাসী বলি সম্বোধন আমি করি আগে।
নাতি বলে পাছে মাগী দেখে ভয় লাগে॥
রায় বলে বাসা দিলা হইলা হিতাশী।
আমি পুত্রসম তুমি মার সম মাসী॥'

রামপ্রসাদ মালিনীকে হাটে প্রেরণ প্রসঙ্গে হীরার হাবভাবে সুন্দরের যে ভীতির কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে ভারতচন্দ্রের এই উক্তির আভাস পাওয়া যায়। কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের মালিনী সুন্দরের সহিত সাক্ষাতের পরই তাহাকে গৃহে লইয়া যাইতে যাইতে সুন্দরের অনুরোধে বিদ্যার রূপবর্ণনা করিয়াছে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের সুন্দর পরদিন আহারাদির পর বিশ্রামকালে মালিনীকে রাজবাড়ীর পরিচয় ও বিদ্যার রূপবর্ণনা করিতে বলিয়াছেন—ইহা অধিকতর স্বাভাবিক হইয়াছে। আমরা পরে তিনজন কবির 'বিদ্যার রূপবর্ণনা' প্রসঙ্গ আলোচনা করিব।

কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের সুন্দর একরাত্রি মালিনীর গৃহে থাকিবার পর নদী-তটে শিবপূজা করিতে গেলেন, পুষ্প আহরণের জন্য মালিনীর দীর্ঘকাল শুষ্ক মালঞ্চে প্রবেশ করায় তাহা মঞ্জরিত হইয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া মালিনী বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে অসামান্য পুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিল ও স্তুতি করিল। ভারতচন্দ্র এইরূপ অলৌকিক বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন নাই; তাঁহার মালিনীর মালঞ্চ স্বভাবতঃই পুষ্পসমাকীর্ণ। বঙ্গদেশে মালিনীর, বিশেষতঃ যে মালিনী রাজ-বাটীতে ফুল সরবরাহ করে, তাহার মালঞ্চে ফুল থাকিবে না বা তাহা শুষ্ক হইয়া থাকিবে, ইহা যেন কল্পনাই করা যায় না। কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ কালীভক্তের মহিমা ব্যক্ত করিতে গিয়া স্বভাবকে ও কাব্যের পরিকল্পনাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন।

ইহার পর কৃষ্ণরাম সুন্দরকে দিয়া সেইদিনই মালা গাঁথাইয়া মালিনীর হাত দিয়া বিদ্যাকে পাঠাইয়াছেন ও বিদ্যার সন্দেহ উদ্রেক করাইয়াছেন। পরদিন মালিনী ফুল তুলিয়া আনিয়া দিলে সুন্দর মালা গাঁথিতে বসিলেন ও মালিনীকে কালীপূজার জন্য দ্রব্যাদি কিনিতে হাটে পাঠাইলেন। রামপ্রসাদ দ্বিতীয় দিনেই মালিনীকে হাটে পাঠাইয়াছেন।

শুষ্ক মালঞ্চ মঞ্জরিত হওয়ায় হীরা আনন্দে পুষ্প চয়ন করিয়া আনিয়া দিল।

'বার দিয়া বসিল বিনোদবর পাশে।
বাসনা বলিতে নারে ফিক্ ফিক হাসে॥
ভাবে কবি এ মাসী বয়সে দেখি পোড়া।
ভাবে দেখি এ প্রকার হয় নাই বুড়া॥
কটির কাপড় গানিট কতবার খোলে।
ভুজপাশ উদাস, গা ভাঙ্গে, হাই তোলে॥
হেসে হেসে আরে এসে ঘনায় নিকটে।
কি জানি কপালে মোর কোন্ খান ঘটে॥
কামাতুরা হইলে চৈতন্য থাকে কার।
বিশেষত নীচ জাতি নীচ ব্যবহার॥
ভয়ে অতি হীরাবতী প্রতি কহে হাসি।
গোটাকত টাকা নিয়া হাটে যাও মাসী॥
প্রমথপতির প্রিয়া পূজা ইচ্ছা আছে।
এঃতো বলি বারো টাকা ফেলে দিল কাছে॥'

কৃষ্ণরাম সংক্ষেপে সুন্দরের মাল্যগ্রন্থন বর্ণনা করিয়া কেতকী পুষ্পে সুন্দর কর্ত্তৃক নিজ সমাচার লিখন বর্ণনা করিয়াছেন। রামপ্রসাদ অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে মাল্যগ্রন্থন ও পরিচয়লিখন বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু পদ্মদলে অক্ষরদ্বারা পরিচয় লিখাইয়াছেন। ভারতচন্দ্রের সুন্দর মালায় কারিগরি না করিয়া কেয়াপাতার কৌটার মধ্যে পুষ্পময় রতিকাম গড়িয়া কেয়াপাতার চিত্র কাব্যে শ্লোক লিখিয়া নিজ পরিচয় দিলেন। কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ বিদ্যার সহিত বিচার প্রসঙ্গে বিদ্যাকর্ত্তৃক পরিচয় জিজ্ঞাসিত হইয়া সুন্দরের মুখ দিয়া এই শ্লোক বলাইয়াছেন।

ভারতচন্দ্র হীরার হাটে গমন ও দোকানীদের তাহাকে দেখিয়া আতঙ্ক অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা অন্য দুই কাব্যে নাই। ভারতচন্দ্র ইহা কবিকঙ্কণের চণ্ডী হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। মুকুন্দরামের দুর্ব্বলার হাটের হিসাব পরবর্ত্তী কবিত্রয়ের মালিনীর বেসাতির হিসাবের আদর্শ হইয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাতে কৃষ্ণরামের মৌলিকত্ব যথেষ্ট আছে এবং ভারতচন্দ্র তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী। ভারতচন্দ্র বিষয় বর্ণনায় মৌলিকত্ব

দেখান নাই বটে, তবে কাব্যে অন্ত্য-যমকের দ্বারা যুগ্মপংক্তির শেষ তুই পদে ভিন্নার্থদ্যোতক একই শব্দের ব্যবহার করিয়া শব্দসম্পদের প্রাচুর্য্য দেখাইয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের সুন্দর মালিনীকে পূজার দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পাঠান নাই, এমনি হাট-বাজার করিতে পাঠাইয়াছেন। সুন্দর তাহাকে বাজারের জন্য দশ টাকা ও তাহার পারিশ্রমিক হিসাবে তুই টাকা মোট বার টাকা দিয়াছেন। রামপ্রসাদ এ বিষয়েও ভারতচন্দ্রের নিকট ঋণী।

মালিনী বাজার করিয়া আনিলে সুন্দর রন্ধন করিয়া আহারাদি করিলেন। ভারতচন্দ্র তাহার পরই মালিনীর সহিত সুন্দরের কথোপকথন প্রসঙ্গে রাজপরিবারের পরিচয় ও বিদ্যার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা তিন কবির বিদ্যার রূপবর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি।

কৃষ্ণরাম—

'রামা রমা সমা শ্যামা সেবার কারণে।
জিনিল জারক বিদ্যা দশন-বসনে॥
উচ্চ হয় কুচ তুটি বিবাদ করিয়া।
দাড়িম্ব বিদরে যেন শোভা না ধরিয়া॥
দিঘল লোচন জোর কি বলিব তায়।
হরিণী হারিল আর উপমা কোথায়॥
নহে নিরমল চাঁদ বদনের তুল।
কি আর গরব করে কমলের ফুল॥
রূষিল কষিল সোণা কলেবর মাঝে।
হারিয়া সুবর্ণ নাম হারাইল লাজে॥

*   *   *

জিনি মৃগরাজ মাজা অতিশয় খিনি।
কিসের ঈশের আর ডম্বুর বাখানি॥
মহাযোগী অশনি সহিতে পারে বুকে।
তাহার কটাক্ষ বাণ বিন্ধে একটুকে॥'

রামপ্রসাদ—

'চাঁচর চিকুর জাল জলধর জিনি।
শ্রুতিযুগে পরাভব পাইল গীধিনী॥
ডুবিল কুরঙ্গ শিশু মুখেন্দু সুধায়।
লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায়॥
নয়নের চঞ্চলতা শিখিবার তরে।
অদ্যাপি খঞ্জন নিত্য কর্ম্মভোগ করে॥
অমিয়া জড়িত ভাষা নাসা তিল ফুল।
বিম্বাধর দশনে মুকুতা নহে তুল॥
পুষ্পধন্ব ধনু অণু কি ভুরু ভঙ্গিমা।
বাহু তুল নহে বিসে কিসের গরিমা॥
* * *
মন্দ মন্দ গমনে যদ্যপি বাঁকা চায়।
মনোভব পরাভব লইয়া পলায়॥
কোন্ বা বড়াই তার পঞ্চশর তূণে।
কতকোটি খরশর সে নয়নকোণে॥
পোড়াইয়া কামনাম বটে স্মরহর।
তাঁহার অসহ্য বালা হানে দৃষ্টিশর॥'

ভারতচন্দ্র—

'বিনানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥
কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥
কি ছার মিছার কাম ধনুরাগে ফুলে।
ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে॥
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়ন হিল্লোলে।
কাঁদেরে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে॥
কেবা করে কামশরে কটাক্ষের সম।
কটুতায় কোটি কোটি কালকূট কম॥

কি কাজ সিন্দুরে মাজি মুকুতার হার।
ভুলায় তর্কের পাঁতি দন্তপাঁতি তার॥
*　　*　　*
রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িত্।
কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিত্॥
বসন ভূষণপরি যদি বেশ করে।
রতি সহ কত কোটি কামাঙ্কুরে মরে॥
ভ্রমর ঝঙ্কার শিখে কাঞ্চন ঝঙ্কারে।
পড়ায় পঞ্চম স্বর ভাষে কোকিলারে॥'

এই তিনটি বর্ণনা তুলনা করিলে ভারতচন্দ্রের বর্ণনাই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারে এই বর্ণনা অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

মালিনী সুন্দরের গাঁথা মালা ও পত্রাদি লইয়া বিদ্যার ভবনে যাইলে, বিলম্ব দেখিয়া রাজকন্যা মালিনীকে তিরস্কার করিলেন। কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন, তিরস্কৃত হইয়া মালিনী চলিয়া গেলে পর বিদ্যা পুষ্পসম্ভারের মধ্যে সুন্দরের গ্রথিত মাল্য ও পত্র পাইয়া বিচলিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের হীরা তিরস্কৃত হইয়া ক্ষমা চাহিল এবং 'চিকন গাঁথনে' মালা গাঁথার জন্য বিলম্ব হইল বলিলে বিদ্যা বশ হইলেন এবং মালা দেখিয়া বলিলেন:

'বিদ্যা কহে দেখি চিকণ হার।
এ গাঁথনি আই নহে তোমার॥
পুন কি যৌবন ফিরি আইল।
কিবা কোন বঁধু শিখায়েছিল॥'

হীরার এইবার অভিমানের পালা:

'হীরা কহে তিতি আঁখির নীরে।
যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে॥
নহে ক্ষীণ মাজা কুচ কঠোর।
কি দেখিয়া বন্ধু আসিবে মোর॥
ছাড় যাইবলা জানি সকল।
গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল॥
বড়র পীরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥'

তাহার পর কৌটা খুলিয়া দেখিতে বলিলে বিদ্যা যেই কৌটা খুলিল, অমনি পুষ্পময় মদনের হাত হইতে ফুলশর তাহার বক্ষে বিদ্ধ হইল; শ্লোক পড়িয়া বিদ্যা আরো বিকল হইলেন।

কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন, মালা দেখিয়া ও লিখন পড়িয়া বিদ্যা উৎকণ্ঠিতা হইলে সখীগণ তাঁহাকে সাব্যস্ত হইতে বলিল। কৃষ্ণরাম কেবল লিখিয়াছেন:

'বিরহে হরিল জ্ঞান ঘুচিল পূজার ধ্যান
সখীগণে শুনি কুতূহল॥
বাসনা লাইজে থাই বসিতে না পারে রাই
শুইলে দ্বিগুণ বাড়ে জ্বালা॥
বিফল হইল অতি প্রভাত হইল রাতি
প্রাণ পাই দেখিলে বিমলা॥'

রামপ্রসাদ কিন্তু বিস্তৃতভাবে সখীগণের প্রবোধদানের বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র এখানে হীরাকে দিয়া প্রকৃত কৌশলী দূতীর ন্যায় নায়িকার আগ্রহ বাড়াইবার বর্ণনা করিয়াছেন। হীরা কপট অভিমান করিয়া বলিল:

'তোমার লাগিয়া নাগর রাখিয়া
গালি লাভ হৈল মোর।
যাহার লাগিয়া চুরি করে গিয়া
সেই জন কহে চোর॥'

এই বলিয়া হীরা চলিয়া যাইতেছিল, বিদ্যা তাহার আঁচল ধরিয়া মাথার কিরা দিয়া ফিরাইলেন। হীরা সুন্দরের রূপ বর্ণনা করিল। কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ পরদিন মালিনী আসিলে বিদ্যা কর্তৃক তাহার প্রতি বিনয় বচন বর্ণনা করিয়াছেন ও কৃত্রিম অভিমানের পর মালিনী সুন্দরের রূপ বর্ণনা করিয়াছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মালিনী ও বিদ্যার কথোপকথন ভারতচন্দ্র যেমন বর্ণনা করিয়াছেন, তেমন আর কোন কাব্যে ফুটিয়া উঠে নাই। ভারতচন্দ্রের রচনা বাস্তবতায় এবং কাব্য-শিল্প ও সৌন্দর্যে নিঃসন্দেহেই রামপ্রসাদ ও কৃষ্ণরামের কাব্যকে তিরস্কৃত করে।

কৃষ্ণরামের কাব্যে বিদ্যা যখন সুন্দরকে তাঁহার গৃহে আনিতে মালিনীকে অনুরোধ করিলেন, তখন সে ভীত হইয়া পড়িল এবং রাজাকে বলিয়া প্রকাশ্যে বিবাহের আয়োজন করিতে বলিল। মালিনী বলিল, রাজকন্যার পক্ষে এরূপ

গোপন মিলন শোভন নহে। ইহার উত্তরে বিদ্যা বিমলাকে উষা-অনিরুদ্ধের কাহিনী শুনাইল এবং মালিনী দূতীগিরি করিতে রাজী হইল।

রামপ্রসাদের বিদ্যা মালিনীকে স্নানছলে সুন্দরকে দেখাইতে অনুরোধ করিল। ভারতচন্দ্রের বিদ্যা বলেন :

'মোর বালাখানার সমুখে রথ আছে।
দাঁড়াইতে তাঁহারে কহিবে তার কাছে ॥
তুমি আসি আমাকে কহিবে সমাচার।
সেই ছলে দরশন করিব তাঁহার ॥'

কৃষ্ণরাম বিদ্যাসুন্দর দর্শন-প্রসঙ্গ বর্ণনা করেন নাই। ভারতচন্দ্রের দেখাদেখি রামপ্রসাদ সম্ভবতঃ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু রাজঅন্তঃপুর মধ্যের সরোবরে সুন্দরকে স্নান করাইতে লইয়া যাওয়া একান্ত অশোভন হইয়াছে, এবং অতদূর হইতে পরস্পরের দর্শন television ছাড়া সম্ভব নহে। রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দরের পরস্পর দর্শনপ্রসঙ্গ একটু বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন— 'সুন্দরদর্শনে বিদ্যার সখী প্রতি উক্তি' ও 'বিদ্যাদর্শনে সুন্দরের মোহ'—এই দুইটি অতিরিক্ত প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যা যখন সুন্দরকে রথতলায় আনিতে মালিনীকে উপদেশ দিলেন, সেই সময়ে একটি চিত্র-কাব্যে আপন পরিচয় লিখিয়াছিলেন, এই শ্লোকটি অপর দুইটি কাব্যে অথবা সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরেও নাই; ইহা সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্রের নিজস্ব রচনা।

কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র তিনজনেই মালিনীকে দিয়া বিদ্যার উৎকণ্ঠার কথা সুন্দরকে বলাইয়াছেন এবং বিদ্যাকে দিয়া দেবীর আরাধনা করাইয়াছেন। আকাশবাণীতে দেবী সুন্দরকেই বিদ্যার ভাবী স্বামী বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র একটু বিশেষত্ব করিয়াছেন :

'এইরূপে মালিনীরে করিয়া বিদায়।
বড় ভক্তিভাবে বিদ্যা বসিলা পূজায় ॥
পূজা না হইতে মাগে আগে ভাগে বর।
দেবীরে করিতে ধ্যান দেখয়ে সুন্দর ॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন আসন ভূষণ।
. . . . দেবীরে অর্পিতে করে বরে সমর্পণ ॥

স্থগন্ধ স্থগন্ধি মালা দেবী গলে দিতে।
বরের গলায় দিনু এই লয় চিতে ॥
দেবী প্রদক্ষিণে বুঝে বর প্রদক্ষিণ।
আকুল হইল পূজা হয় অঙ্গহীন ॥'

এই অপূর্ব্ব তন্ময়তার বর্ণনা অন্য দুইটি কাব্যে নাই।

কৃষ্ণরামের স্থন্দর সিদ্ধিমন্ত্র জপ করায় ও রামপ্রসাদের স্থন্দর দেবীর আরাধনা করায় দেবীর মায়ায় অকস্মাৎ স্থড়ঙ্গ স্থষ্টি হইল। কিন্তু ভারতচন্দ্রের স্থন্দর কিরূপে বিদ্যার গৃহে যাইবেন, তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া দেবীর আরাধনা করিলেন। দেবী সিঁধকাটি ও তাম্রপট্টে মন্ত্র লিখিয়া ফেলিয়া দিলেন। স্থন্দর সেই সিঁধকাটি দিয়া মন্ত্রবলে স্বহস্তে মালিনীর গৃহ হইতে বিদ্যার গৃহ পর্য্যন্ত সিঁধ কাটিয়া ফেলিলেন।

ইহার পর উৎকণ্ঠিতা বিদ্যার গৃহে স্থন্দরের উপস্থিতি। কৃষ্ণরামের বর্ণনায় ইহার কোন বিশেষত্ব নাই; রামপ্রসাদ উৎকণ্ঠিতা বিদ্যার বর্ণনা সংক্ষেপে সারিয়াছেন:

'গগনেতে মেঘ দেখি আনন্দ অপার শিখী
মন্দ মন্দ মলয় সমীর।
স্থচারু কুস্থম ঘ্রাণ স্মরশরে দহে প্রাণ
বিদ্যা-বিনোদিনী নহে স্থির ॥
রস-মই কহে সই কহ সে নাগর কই
তাহা বই মনে নাহি আর।
নাহি স্থখ একটুক মহাদুঃখে ফাটে বুক
প্রায় বুঝি মোর প্রাণ যায় ॥'

ভারতচন্দ্রের উৎকণ্ঠিতা-বর্ণনা বিস্তারিত ও চমৎকার:

'চাঁদের মণ্ডল বরিষে গরল
চন্দন আগুন-কণা।
কর্পূর তাম্বূল লাগে যেন শূল
গীত নাট ঝন্‌ঝনা ॥
ফুলের মালায় স্থচের জ্বালায়
তনু হৈল জরজর।

মন্দ মন্দ বায়　　　　বজ্জরের ঘায়
অঙ্গ কাঁপে থর থর ॥
কোকিল হুঙ্কারে　　　　ভ্রমর ঝঙ্কারে
কানে হানে যেন তীর।
যত অলঙ্কার　　　　জ্বলন্ত অঙ্গার
পোড়ায় মোর শরীর ॥
এ নীল কাপড়　　　　হানিছে কামড়
যেমন কোন সাপিনী।
শয্যা হৈল শাল　　　　সজ্জা হৈল কাল
কেমনে জীবে পাপিনী।
রজনী বাড়িছে　　　　যে পোড়া পুড়িছে
কি ছার বিছার জ্বালা।
বৎসর তিলেকে　　　　প্রলয় পলকে
কেমনে বাঁচিবে বালা ॥
ক্ষণেক শয্যায়　　　　ক্ষণেক ধরায়
ক্ষণেক সখীর কোলে।
ক্ষণে মোহ যায়　　　　সখীরা জাগায়
বঁধু এল এই বোলে ॥'

ভারতচন্দ্রের সুন্দর সখীগণের নিকট অকপটে সকল কথা বলিয়া ও নিজ পরিচয় দিয়া তাহাদের বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের কাব্যে বিচারকালে সখী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া চিত্রকাব্যে সুন্দর আপনার নাম বলিলেন মাত্র, পরিচয় দিলেন না। ভারতচন্দ্রের সখীগণের সহিত সুন্দরের আলাপ অন্য কাব্যদ্বয়ে নাই।

এই সময় ময়ূরনাদ উপলক্ষ্য করিয়া বিদ্যাসুন্দরের বিচার আরম্ভ হইল। কৃষ্ণরাম লিখিয়াছেন: "গিরিমাঝে দৈবযোগে ময়ুর ডাকিল হেনকালে।" রামপ্রসাদও লিখিয়াছেন: "হেনকালে পর্ব্বতশিখরে শিখী ডাকে।" উভয়েই সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের "গিরৌ সমাকর্ণ্য ময়ূরনাদং" ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখেন নাই, গৌড়দেশে অথবা পর্ব্বতশিখরে ময়ূরনাদ সম্ভব কিনা। ভারতচন্দ্র এই ত্রুটি সংশোধন করিয়াছেন। "হেনকালে ময়ূর ডাকিল গৃহপাশে"—এ উক্তির

দ্বারা গৃহপালিত ময়ূরের কথা বলিয়াছেন। সংস্কৃতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ভারতচন্দ্র যে ভাবে শ্লোক দুইটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ তাহা পারেন নাই।

কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ এই দুইটি শ্লোকের ব্যাখ্যাতে এবং সুন্দরের পরিচয়-জ্ঞাপক তৃতীয় শ্লোকে বিচার শেষ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র তাহার বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন—ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্য, নাটক, দর্শন ইত্যাদির বিচারের কথা বলিয়া শেষে—

"অন্য শাস্ত্র যে সব সে সব কাঁটাবন।
তত্ত্বস্তু বাদরায়ণে প্রমাণ লিখন॥
রায় বলে এক আত্মা তবে তুমি আমি।
বিদ্যা বলে হারিলাম তুমি মোর স্বামী॥"

ইহার পর গান্ধর্ব্ব বিবাহ। কৃষ্ণরাম স্বতন্ত্র কোন প্রসঙ্গ করেন নাই, বিদ্যাসুন্দরের বিচার প্রসঙ্গেই গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। গান্ধর্ব্ব বিবাহে কেবল মালাবদল করিলেই বা কৌমার্য্যহরণ করিলেই বিবাহ সিদ্ধ হয় না। বাৎসায়ন বলিতেছেন: "প্রতিপন্নামাভিপ্রেতাবকাশবর্ত্তিনীং নায়কঃ শ্রোত্রিয়াগারাদগ্নিমানায্য কুশানাস্তীর্য্য যথাস্মৃতি হুত্বা চ ত্রিঃ পরিক্রমেত।" (কাঃ সূঃ ৩।৫।১১)। এই শ্লোকটি ভারতচন্দ্র পুষ্পময় কামরতি পাঠাইবার সময় সুন্দরকে দিয়া লিখাইয়াছেন। রামপ্রসাদ সুন্দরকে দিয়া বিদ্যাকে সিন্দুরদান করাইয়াছেন, কিন্তু ভাবিয়া দেখেন নাই অনূঢ়া রাজকন্যার সীমন্তে সিন্দুরচিহ্ন দেখিলে রাজবাড়ীতে কোন কথা গোপন রহিবে না। ভারতচন্দ্র সংক্ষেপে মালাবদল করিয়া গান্ধর্ব্ব বিবাহ সারিয়াছেন। কৃষ্ণরামই কেবলমাত্র অগ্নিসাক্ষী করার কথা লিখিয়াছেন, রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্র লিখেন নাই। ভারতচন্দ্র রূপকে বিবাহ বর্ণনা করিয়াছেন:

"বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার।
তার পূর্ব্ব বিবাহ হৈল মনে আঁখিঠার॥
কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা বরকর্ত্তা বর।
পুরোহিত ভট্টাচার্য্য হৈল পঞ্চশর॥
কন্যাযাত্র বরযাত্র ঋতু ছয় জন।
বাদ্যকরে বাদ্যকর কিঙ্কিণী কঙ্কণ॥

নৃত্য করে বেশরে, নৃপুর গীত গায়।
আপনি আসিয়া রতি এয়ো হৈলা তায় ॥
ধিক ধিক অধিক আছিল সখী তায়।
নিশ্বাস আতসবাজি উত্তাপে পলায় ॥
নয়ন অধর কর জঘন চরণ ;
দুহার কুটুম্ব সুখে করিছে ভোজন ॥”

দেখাদেখি রামপ্রসাদও এই প্রচ্ছন্ন বিহার বর্ণনা করিয়াছেন

“সুশীতল মরুত মলয় মন্দ বহে।
স্মরহানে থরশর ভর কত সহে ॥
মাস মধু ডাকে মধুকরবধূচয়।
কুলবধূ কামবধূ ইচ্ছা অতিশয় ॥
উত্তম ঘটক সুন্দরের গাঁথা হার।
বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তা চিত্ত দোঁহাকার ॥
পুরোহিত হইলেন আপনি মদন।
বিদ্যালাপছলে বুঝি পড়ালা বচন ॥
উলু দিছে ঘন ঘন পিকসীমন্তিনী।
নয়ন চকোরী সুখে নাচিছে নাচনী ॥
বরযাত্র মলয় পবন বিধুবর।
মধুকর নিকর হইল বাদ্যকর ॥
কান্তাকুচে জলদগ্নি বিচারিয়া কবি।
করপদ্মে করে হোম স্নেহ করি হবি ॥
উভয়ত কুটুম্ব রসনা ওষ্ঠাধর।
পরস্পর ভুঞ্জে সুধা মুখেন্দু উপর ॥
যুগল নিতম্ব উরু জালালি ফকির।
বিজাতীয় শব্দ করে কাঁখায়ে মঞ্জীর ॥
নূপুর কিঙ্কিণীজালে নানা শব্দ হয়।
দুই দলে দ্বন্দ্ব যেন চন্দনসময় ॥
পুনরপি শুন বিবাহের সমাচার।
কামিনীর করুণা ভাটের রায়বার ॥

সস্ত্রীক আইলা কাম দেখিতে কৌতুক ॥
দম্পতিকে পঞ্চশর দিলেন যৌতুক ॥
দম্পতিরে তুষ্ট করে দম্পতি চলিল।
দক্ষিণা পশ্চাতে হবে সম্প্রতি রহিল ॥'

রামপ্রসাদের বর্ণনায় যে ভারতচন্দ্রের অনুকরণের স্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে এইখানে সখীগণ কর্তৃক সঙ্গীতাদির পরে সুন্দরের বীণা-সংযোগে গীত শুনিয়া বিদ্যা মোহিত হইল, তাহার পর বিহারারম্ভ।

কৃষ্ণরাম বিদ্যাসুন্দরের বিহার আরম্ভ প্রসঙ্গে প্রথমে নায়িকার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন মৈথিলী ভাষায়, তাহার পর ত্রিপদীতে বিহারারম্ভ বর্ণনা করিয়াছেন, সেইরূপ বিহার প্রসঙ্গে প্রথমে বাংলা ত্রিপদী পরে মৈথিলী ত্রিপদীতে এবং শেষে পয়ারে শেষ করিয়াছেন। কৃষ্ণরামের বিহার বর্ণনা অতি সাধারণ হইয়াছে।

রামপ্রসাদ শৃঙ্গার উপক্রমে বিদ্যার বিনয় প্রসঙ্গটি তোটক ছন্দে বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের বিহারারম্ভ উদ্ধৃত করিতেছি।

রামপ্রসাদ—

রমণীমণি নাগররাজ কবি।
রতিনাথ-বিনিন্দিত চারুছবি ॥
ধনি মুখ-চিবুক ধরে যতনে।
মুখ চুম্বতি সুন্দর হৃষ্টমনে ॥
নাগরী রসিকা রসিকপ্রবীণা।
যুবতী সময়ে হৃদয়ে কঠিনা ॥
কুচপদ্ম-কলি করপদ্মে ধরে।
তনু লোমাঞ্চিত রস-রঙ্গভরে ॥
চমকি চমকি কহে কি করহে।
নখ-ঘাতন-যাতন খেদ কহে ॥

*   *   *

শুন আলি ও কালি কুগালি দিবে।
প্রভু চোর হবে কি তবে ছাড়িবে ॥

মরিহে মরিহে ধরিহে চরণে।
রমণে এমনে জানিহে কেমনে ॥
রসিকঃ সুজনঃ প্রভুহে চতুর।
মরি বালজনে কেন হে নিঠুর ॥
বলে মুহু মুহু মুখে উলু উলু।
যথা কোকিল কূজিত কুহু কুহু ॥
নয়নযুগলে সলিল গলিত।
কনক-মুকুরে মুকুতা রচিত ॥
মদন-জ্বর না কর ছাটফটী।
কবিরাজ কহে কবিরাজ বটী ॥
কুচ মর্দ্দনালিঙ্গন চুম্বন লো।
শুন এই ত্রিদোষজ-ভঞ্জন লো ॥
যদি রোগ সুসম্যক সাম্য নহে।
রসনারস পানে কি রোগ রহে ॥
শ্রমনীরে শরীর সমস্ত ভাসে।
করি ধীর সমীর সুধীর ভাষে ॥”

ভারতচন্দ্র—

“নৃপনন্দন কামরসে রসিয়া।
পরিধান ধুতি পড়িছে খসিয়া ॥
তরুণী ধরিয়া হৃদয়ে লইল।
নলিনী যেন মত্ত করী ধরিল ॥
মুখ চুম্বই চাঁদ চকোর হয়ে।
ধনি বারই অঞ্চল ঝাঁপি লয়ে ॥
কুচপদ্ম কলি কবিরাজ করে।
ধরিতে তরুণী পুলকে শিহরে ॥
নৃপনন্দন পিন্ধনবাস হরে।
রমণী অমনি প্রিয়হাত ধরে ॥
বিনয়ে করপদ্ম করে ধরিয়া।
কহিছে তরুণী করুণা করিয়া ॥

ক্ষম হে পতি হে বঁধু হে প্রিয় হে।
নবযৌবন জোরের যোগ্য নহে ॥

তুহি পঙ্কজিনী মুহি ভাস্কর লো।
ভয় না কর না কর না কর লো ॥
কুচশম্ভুশিরে নখ চন্দ্রকলা।
বড় শোভিল ছাড়হ ঠাট ছলা ॥
কুচ হেম-ঘটে নখরক্ত-ছটা।
বলিহারি সুরঙ্গপ্রবাল ঘটা ॥
ভয় না টুটিবে ভয় না তুড়িলে।
রস ইক্ষু কি দেই দয়া করিলে ॥
বলিয়া ছলিয়া সহলে সহলে।
রসিয়া পশিলা ভ্রমরা কমলে ॥”

তুলনা করিলে বুঝা যায়, রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রকে অনুকরণ করিয়াছেন এবং বহুস্থানে ভাব ও ভাষাও ঋণ লইয়াছেন। ভারতের তোটক প্রায় নির্ভুল কিন্তু রামপ্রসাদ বহুস্থানে ছন্দ রাখিতে পারেন নাই, কাব্যও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পর রামপ্রসাদ “শৃঙ্গারে পরস্পর উক্তি” ও “শৃঙ্গারে সখীদিগের ব্যঙ্গোক্তি” এই দুইটি প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমটি ব্রজবুলিতে এবং দ্বিতীয়টি বাংলা পয়ারে; রামপ্রসাদ বিহার বর্ণনা করেন নাই, সখীদিগের কথার মধ্য দিয়া আভাসে বুঝাইয়াছেন। কিন্তু সখীদিগের আলাপ নর্ম্মভাষণ হইলেও একটু গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের বিহার বর্ণনা ব্রজবুলির অনুকরণে রচিত হইলেও এত সংস্কৃত শব্দপ্রধান যে, মৈথিলী ভাষার ছাপ তাহাতে কমই পাওয়া যায় এবং বর্ত্তমানকালে তাহা অশ্লীল বলিয়া মনে হইলেও অপূর্ব্ব আদি-রসাত্মক কাব্য-রসের তরঙ্গে অশ্লীলত্ব ভাসিয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ প্রথমদিনেই নায়ক-নায়িকার বিপরীত শৃঙ্গার বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত অশোভন হইয়াছে। নবোঢ়া নায়িকার পক্ষে প্রথম মিলন-রাত্রেই এইরূপ প্রগলভতা রসশাস্ত্র-বিরোধী বর্ণনা। ভারতচন্দ্র পরদিন

বিপরীতবিহার বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের মালিনী বিদ্যাসুন্দরের মিলনের বিষয় জ্ঞাত ছিল। কৃষ্ণরাম লিখিতেছেন:

"মালিনী কৌতুক বড় সুন্দর দেখিয়া।
শুনিল সকল কথা বিরলে বসিয়া॥"

রামপ্রসাদও বলিতেছেন:

"সুকবি সুন্দর গেলা মালিনীর বাসে।
কহিলা সকল কথা বসি তার পাশে॥"

পরদিন মালিনী বিদ্যার গৃহে গিয়া সুন্দরের কথা লইয়া রহস্যালাপ করিয়া পুরস্কার লইয়া আসিল।

ভারতচন্দ্র এখানে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, সুন্দরকে দিয়া তাঁহার গোপন মিলন গুপ্ত রাখাইয়া। মালিনীর গৃহে আপন কক্ষ অর্গল বদ্ধ করিয়া সুন্দর সুড়ঙ্গপথে যাতায়াত করিতেন, মালিনী তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিত না। সুন্দর এদিকে বিদ্যার সহিত তাঁহার মিলন করাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতেন ও অক্ষমতার জন্য অনুযোগ করিতেন।

দ্বিতীয় দিনের বিপরীত বিহারারম্ভের পূর্ব্বে কয়েকটি পুঁথিতে যে চারি পংক্তি আছে, তাহা সাহিত্য-পরিষদের সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, তাহা পরিত্যাগ করা ঠিক হয় নাই, ইহাতে কাব্যের কাহিনীকে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। কামশাস্ত্রবিৎ মাত্রই জানেন যে, নবোঢ়া নায়িকার নিকট বিপরীত রতি প্রার্থনা করিতে হইলে প্রথম সঙ্গমে তাহা সম্ভব নয়, একবার সঙ্গমের পর নারীর দ্বিতীয় সঙ্গমকালে উত্তেজনা বর্দ্ধিত হয় এবং তাহাই বিপরীত-বিহার-প্রার্থনার প্রশস্ত সুযোগ। সুতরাং,

"পূর্ব্বমত কামহোম করি সমাপন।
সুরতান্তে শান্ত হইয়া বসিলা দুজন॥
বিহারে মদনরসে অধিক করিয়া।
ধীরে ধীরে কহে ধীর অধীর হইয়া॥"

এই পরিভ্রষ্ট অংশটি নিশ্চয়ই মূলে ছিল। ভারতচন্দ্র এইরূপ ভুল করিতে

পারেন না। সুন্দর কর্ত্তৃক ছলে বিপরীত বিহার প্রার্থনায় ভারতচন্দ্র অপূর্ব্ব কবিত্ব দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণরাম বিদ্যার মুখে,

"রমণী এমন কাজ করে নাকি কভু।
ছাড়হ গোঁয়ারপণা নিদারুণ প্রভু॥
কে তোমারে শিখাইল এমন বন্ধান।
আমি তো না জানি কভু ইহার সন্ধান॥"

এই উক্তির দ্বারা বিদ্যাকে জ্ঞাতরতিরসা প্রগলভা যুবতীর ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন এবং রামপ্রসাদের বিদ্যা—

"নেকা ঢঙ্গ হয়্যে রামা কহে সেই কি।
প্রকার শুনিয়া লাজে দাঁতে কাটে জি॥"

ইহাও সবেমাত্র রতিরসাস্বাদিতা নবোঢ়ার বর্ণনা নহে। ভারতচন্দ্র এস্থলে বিদ্যাসুন্দরের উক্তি-প্রত্যুক্তি যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে সত্যসত্যই নবোঢ়ার উক্তি ও ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের কাব্যে পরবর্ত্তী প্রসঙ্গ বিদ্যার মানভঞ্জন। কৃষ্ণরামের নায়ক একদিন বিদ্যার গৃহে গিয়া কোনমতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিতে না পারিয়া মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া আসিলেন এবং তিনদিন তিনরাত্রি বিদ্যার গৃহে গমন করিলেন না। পরে চতুর্থ দিনে নায়ক আসিলে মানবতী বিদ্যা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। কিছুতেই মানভঞ্জন করিতে না পারিয়া সুন্দর,

"চাতুরী কতেক আছে নাক বাচালিয়া হাঁচে
কামিনী শুনিয়া অচিরাৎ
না বলিয়া 'জীব জীব' চিন্তিয়া কান্তের শিব
কানে দিল কনকের পাত॥"

তাহার পর সুন্দর মানিনীর মুখবাস সরাইয়া মানভঞ্জন করিলেন। রামপ্রসাদের সুন্দর উদাস্যভাবে একদিন বিদ্যার ভবনে না যাওয়ায় তাহার মান হইয়াছিল। মান ভাঙ্গিতে না পারিয়া সুন্দর নাকে তৃণ দিয়া হাঁচিলেন। বিদ্যা তাড়ঙ্ক দোলাইয়া কান্তের মঙ্গল চিন্তা করিলেন। পরে সুন্দর বাক্‌ছলে মানভঞ্জন করিলেন।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, অন্যান্য বাকচাতুরীর মধ্যে ভারতচন্দ্রের

কাব্যে বিপরীত বিহার প্রার্থনার শেষভাগে তিনি যে বাক্‌কৌশলের অবতারণা করিয়াছিলেন :

"রায় বলে পুন পুন সাধিলে যদি না শুন
অরণ্যে রোদন কিবা ফল।
কথায় বুঝিনু কাজ আমা হৈতে প্রিয় লাজ
লাজ লয়ে করহ কৌশল ॥
দিয়াছি যে আলিঙ্গন করিয়াছি যে চুম্বন
সে সব ফিরিয়া মোরে দেহ।
কল্যাণ করুণকালী নাহি দিও গালাগালি
দেশে যাই মনে রেখ স্নেহ ॥"

রামপ্রসাদ তাহাই ঘুরাইয়া বলিয়াছেন :

"ক্রোধে প্রিয়তমে তব তবে কিবা কাজ।
আহারে ও ব্যবহারে কার আছে লাজ ॥
ফিরা দেহ মদর্পিত চুম্ব আলিঙ্গন।
আর কেন জানা গেল চরিত্র যেমন ॥"

ভারতচন্দ্রের মানভঙ্গ-প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ অন্য কাহিনী। একদিন দিবাভাগে নিদ্রিতা বিদ্যাকে কক্ষ মধ্যে একাকিনী পাইয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ না করাইয়া তাহার সহিত রতি উপভোগ করিলেন। নিদ্রাভঙ্গে বিদ্যা আপনাকে অপমানিতা মনে করিয়া মনোদুঃখে মানিনী হইলেন। এখানে সুন্দর বিদ্যার মানভঙ্গ করিতে এই যে বাকচাতুরী করিয়াছেন :

"অপরাধ করিয়াছি হুজুরে হাজির আছি
ভুজপাশে বান্ধি কর দণ্ড।
বুকে চাপ কুচগিরি নখাঘাত চিরিচিরি
দশনে করহ খণ্ড খণ্ড ॥"

তাহা জয়দেবের—

"ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখজাতম্ ॥"

অথবা,

"মুগ্ধে বিধেহি ময়ি নির্দয়-দন্ত-দংশ—
দোর্বল্লি-বন্ধ-নিবিড়-স্তন-পীড়নানি॥"

এই কাব্যঝঙ্কার স্মরণ করাইয়া দেয়।

ভারতচন্দ্রও সুন্দরকে নাকে কাঠি দিয়া হাঁচাইয়াছেন এবং বিদ্যা—

"জীব বুঝাবার তরে আপন আয়তি ধরে
তুলি পরে কনককুণ্ডল।"

বিদ্যার এই ক্রিয়া-বৈদগ্ধ্য তিনজন কবিই চৌরপঞ্চাশিকা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন—

"অদ্যাপি তন্মুখশশী পরিবর্ত্ততে মে
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপাল পুত্র্যা।
জীবেতি মঙ্গল বচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ
কর্ণে কৃতং কনকপত্রমণালপন্ত্যা॥"

ভারতচন্দ্র ইহার পর নায়ক-নায়িকার নানাবিধ কৌতুক বর্ণনা করিয়াছেন— একদিন সুন্দর বিদ্যাকে সুড়ঙ্গপথে মালিনীর গৃহে লইয়া গিয়া বিদ্যার সারীর সহিত আপন শুকের বিবাহ দিলেন ও মালিনীর অজ্ঞাতে প্রেমলীলা চালাইতে লাগিলেন। অন্য একদিন বিদ্যা নিদ্রিত সুন্দরের মুখচুম্বন করিয়া তাঁহার ললাটে সিন্দূর চন্দন চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়া কপট-খণ্ডিতা হইয়া রহস্য করিলেন। এই সকল প্রসঙ্গ অপর দুই কাব্যে নাই।

ইহার পর বিদ্যা ঋতুমতী হইলেন ও পরে গর্ভবতী হইলেন। কৃষ্ণরাম ও ভারতচন্দ্র গর্ভবতী বিদ্যার বর্ণনা করিয়াছেন, রামপ্রসাদ করেন নাই, কেবল সখীমুখে আভাসমাত্র দিয়াছেন।

কৃষ্ণরাম—

"মুখখানি কমলফুল পাণ্ডুর বরণ।
শরীরে উঠিল শির গর্ভের লক্ষণ॥
জিহ্বার বিরতি নাই মুখে উঠে জল।
বসন পাতিয়া নিদ্রা যায় ক্ষিতিতল॥
আঁটিয়া পরিতে নারে খসিল বসন।
সাদে সাদে করে পোড়া মৃত্তিকাভক্ষণ॥

উপরে পড়িল ভেলা উচ কুচদ্বন্দ্ব।
সাতকুম্ভ কুম্ভমুখে নীল অরবিন্দ॥
হইল পঞ্চম মাস গুরুউরুভার।
অধিক আলসে নাই শকতি তাহার॥
উদর ডাগর নাভি উলটিতে চাহে।
ক্ষীণ মাজা ঘুচিল যৌবন দূরে যায়ে॥"

ভারতচন্দ্র—

"উদর আকাশে সুত চাঁদের উদয়।
কমল মুদিল মুখ রজঃ দূর হয়॥
ক্ষীণ মাজা দিন পেয়ে দিনে দিনে উচ।
অভিমানে কালামুখ নম্রমুখ কুচ॥
স্তনে ক্ষীর দেখি নীর হইল রুধির।
কাল পেয়ে শির তোলা দিল যত শির॥
হরিদ্রা তড়িৎ চাঁপা সুবর্ণের শাপে।
বরণ পাণ্ডুর বুঝি সম তার তাপে॥
দোহাই না মানে হাই কথা নাই তায়।
উদরে কি হইল বলি দেখাইতে চায়॥
অধর বান্ধুলি মুখ কমল আশায়।
দুই গণ্ডে গণ্ডগোল অলি মাছি তায়॥
সর্ব্বদা ওয়াক ছর্দ্দি মুখে উঠে জল।
কত সাধ খেতে সাদ সুস্বাদু অম্বল॥
মাটি খেয়ে যেমন এমন কৈল কাজ।
পোড়ামাটি খেতে রুচি সারিতে সে লাজ॥
জাগিয়া জাগিয়া যত হয়েছে বিহার।
অবিরত নিদ্রা বুঝি শুধিতে সে ধার॥
নিদ্রা না হইত পূর্ব্বে অপূর্ব্ব শয্যায়।
আঁচল পাতিয়া নিদ্রা আনন্দে ধরায়॥
বসিলে উঠিতে নারে সর্ব্বদা অলস।
শরীরে সামর্থ্য নাহি মুখে নাহি রস॥"

কৃষ্ণরামের কাব্যের সাধারণ বর্ণনাকে ভারতচন্দ্র অলঙ্কার সংযোগে অপরূপ করিয়া তুলিয়াছেন।

রাণী কর্ত্তৃক বিদ্যাকে তিরস্কার ও বিদ্যার বাক্ছল তিনজন কবিই যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণরাম রাণীকে দিয়া বিদ্যাকে পরীক্ষা করাইয়াছেন, যেমন এরূপ ক্ষেত্রে সকল মা-ই করিয়া থাকেন :

"কালিমা কুচের আগে দুগ্ধ দেখে চাপি।
নিশ্চয় জানিল গর্ভে সন্ধে নাহি ভাবি ॥
নখের আঁচড় দেখি পয়োধর বেড়ি।
নাসায় অঙ্গুলি দিলে তনু যায় ছাড়ি ॥"

ভারতচন্দ্র কেবল চোখে দেখিয়া গর্ভ লক্ষণ বুঝাইয়াছেন। তিনজন কবিই মাতৃদর্শনে বিদ্যাকর্ত্তৃক পিতামাতার অবহেলার কথা বলাইয়াছেন—পূর্ব্ব হইতে গর্ভ চাপিবার জন্য রোগের হিসাবে। কৃষ্ণরাম লিখিতেছেন—"শুনিয়া কন্যার কথা অতি দুঃখে হাসে।" কৃষ্ণরামের 'রাণী-বিদ্যাসংবাদ' প্রসঙ্গে বাস্তবতার ও স্নেহশীলা মাতার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে অধিকতর। কৃষ্ণরাম মাতার মুখ দিয়া যে সকল খেদোক্তি করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র হুবহু সেইগুলি কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়া বলিয়াছেন, যথা—

কৃষ্ণরাম—

"মর গিয়া আগ বিদ্যা আঘাটে উলিয়া।
গলায় বাঁধিয়া ঘট কারে না বলিয়া ॥

*   *   *

অবলা হইয়া হেন নাহিল নিশঙ্ক।
নির্ম্মল রাজার কুলে করিলি কলঙ্ক ॥
বিদ্যার জননী মোরে কেহ যদি বলে।
তখনি মরিব আমি কাতি দিয়া গলে ॥
হায় হায় কি বলিব নৃপতির ঠাঁই।
পৃথিবী বিদার দেহ তোমাতে সাঁধাই ॥"

ভারতচন্দ্র—

"না মিলিল দড়ি না মিলিল কড়ি
কলসী কিনিতে তোরে।
আই মা কি লাজ কেমনে এ কাজ
করিলি খাইয়া মোরে॥
রাজা মহারাজ তাঁরে দিলি লাজ
কলঙ্ক দেশে বিদেশে।
কি ছাই পড়িলি কি পণ করিলি
প্রমাদ পাড়িলি শেষে॥
বিদ্যার মা ছলে যদি কেহ বলে
তখনি খাইব বিষ।
প্রবেশিব জলে কাতি দিব গলে
পৃথিবী বিদায় দিস্॥"

রামপ্রসাদ এই কথাই বলিয়াছেন এবং আরো বলিয়াছেন, কুলত্যাগিনী হইলেও দুঃখ ছিল না।

"রাণী বলে পাপীয়সি প্রাণ ছাড় নীরে পশি
কিম্বা বিদ্যা খা লো তুই বিষ।
নহে খড়্গে কর ভর এই ক্ষণে মর মর।
কলঙ্কিণি কোন্ সুখে জিস্॥
নির্ম্মল রাজার কুল তুই কলঙ্কের মূল
জন্মিলি আমার গর্ভে আলো।
এই রাজ্য ত্যজ্য করে যদ্যপি ভাতার ধরে
বেরুতিস সেও ছিল ভালো॥"

কৃষ্ণরামের রাণী স্নেহশীলা বাঙ্গালী গৃহস্থের মাতা। ভারতচন্দ্রের রাণী রাজরাণী—কন্যার এ অবস্থায় তাহার প্রতি স্নেহের ভাব দেখাইতে পারেন নাই, এবং কলঙ্কভয়ে ভীতা ও ক্রুদ্ধা। রামপ্রসাদের রাণী নিতান্ত সাধারণ অল্পশিক্ষিতা বা অশিক্ষিতা নারী। রাণী ও বিদ্যার বাক্‌ছল প্রাকৃতজনোচিত কোন্দল হইয়াছে।

রাণীর নৃপতি সমীপে বিদ্যার গর্ভবার্ত্তা দিতে গমন প্রসঙ্গে রামপ্রসাদ অনুপ্রাসের ছটা দেখাইয়াছেন, কিন্তু কাব্য ফুটে নাই। কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের নৃপতি ক্রোধভরে কোটালকে বিদ্যার গর্ভের জন্য দায়ী করায় নিতান্ত গ্রাম্যতা দোষ ঘটিয়াছে :

"আপাদ পর্য্যন্ত অগ্নি শিখা যেন দহে।
কোটালের কর্ম্ম এই আর কারু নহে।।"

(রামপ্রসাদ)

কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের কোটাল প্রকৃত ব্যাপার জানিত না, বিদ্যার ভবনে চুরি হইয়াছে, এইমাত্র বুঝিয়াছিল। কৃষ্ণরামের কোটাল পাঁচ ছয় দিন চোর ধরিয়া দিতে সময় চাহিলে রাজা ছয়দিন সময় দিলেন। রামপ্রসাদের রাজা স্বয়ং তাহাকে সাতদিনের সময় দিলেন। ইতিমধ্যে কোটালের স্ত্রী রাজবতী আসিয়া প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিয়া গেল। কোটাল শুনিয়া—

"কানে হাথ কোটাল স্মরণে ধর্ম্ম ধর্ম্ম।
কেমনে বলিল রাজা ইহা মোর কর্ম্ম॥"

(কৃষ্ণরাম)

রামপ্রসাদের "কোটালের ভূপতিনিন্দাপ্রসঙ্গে" রাজভৃত্যের পক্ষে এইরূপ উক্তিতে নিতান্ত মুঘলযুগের শেষভাগের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহা প্রাচীনকালের রাজকর্ম্মচারীর উক্তি নহে।

ভারতচন্দ্রের রাজাই কোটালকে ইঙ্গিতে ব্যাপার বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং কোটাল চোর ধরিয়া দিতে সাতদিন সময় চাহিয়াছে। কোটাল রাজার উদ্দেশ্যে কোনরূপ অসম্ভ্রমসূচক উক্তি করে নাই। কোটাল সেইদিনই বিদ্যার কক্ষে গিয়া সুড়ঙ্গ বাহির করিল। কিন্তু রামপ্রসাদ ও কৃষ্ণরামের কোটাল মালিনীর গৃহে খানাতল্লাসী করিতে গিয়া সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইল। কোটাল কেন যে বিদ্যার কক্ষ তল্লাস করিল না, বা তল্লাস করিয়া সুড়ঙ্গের সন্ধান পাইল না, তাহা এই কবিদ্বয় বলেন নাই। কোন সূত্র না পাইয়াই নগরবাসিগর্ণকে উৎপীড়িত করার বর্ণনায় রামপ্রসাদ কোটালের বুদ্ধি ও বৃত্তির অসম্মান করিয়াছেন। কৃষ্ণরামের কোটাল ও তাহার অনুচরগণ গোপনে বিদ্যার গৃহ পাহারা দিয়া চোর ধরার চেষ্টা করিল। রামপ্রসাদ কোটালগণের ছদ্মবেশে চোর অন্বেষণ প্রসঙ্গে মনের ঝাল মিটাইয়া বৈষ্ণব নিন্দা করিয়াছেন। কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দর পুঁথি আবিষ্কারের পূর্ব্বে সাহিত্যিকগণের

ধারণা ছিল, বিদু ব্রাহ্মণী রামপ্রসাদের সৃষ্টি, কিন্তু এখন স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণরামের কলাবতী নাম বদলাইয়া রামপ্রসাদের কাব্যে 'বিদু' হইয়াছেন। কলাবতী কর্ত্তৃক বিদ্যার নিকট হইতে ছলে চোরের নাম বাহির করিবার চেষ্টা ও বিদ্যার সখীগণের হস্তে তাহার লাঞ্ছনার চিত্র কৃষ্ণরাম রামপ্রসাদ অপেক্ষা অধিকতর নৈপুণ্যের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন, রামপ্রসাদের বর্ণনায় কেবল অনুকরণের দোষই হইয়াছে।

কৃষ্ণরাম কোটালের ভ্রাতার পরামর্শ অনুসারে কোটাল কর্ত্তৃক বিদ্যার সকল বস্ত্র সিন্দুর রঞ্জিত করিয়া চোর ধরিবার যে কৌশল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসম্ভব ও খেলো হইয়াছে। সম্ভবতঃ গোবিন্দদাসের কাব্য হইতে কৃষ্ণরাম এবিষয়ে প্রেরণা পাইয়াছেন। কিন্তু গোবিন্দদাস যাহা বলিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সহজ।

কোটালের এক অনুচর দিবাকর অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। সে বলিল, রাজকন্যা সিন্দূর ও কজ্জলে প্রসাধন করেন, তাঁহার প্রণয়ী তাঁহার সহিত সম্ভোগ-কালে অসতর্কভাবে আলিঙ্গন করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার বস্ত্রে সিন্দূর বা কজ্জলের চিহ্ন থাকিবে। যদি কোন ব্যক্তির বস্ত্রে পুনঃপুনঃ ঐ চিহ্ন দেখা যায়, তাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিলে নিতান্ত ভুল হইবে না। দিবাকর তাহার এক মিত্র রজককে ডাকিল। কোটাল তাহাকে দিয়া সকল রজককে এ বিষয়ে লক্ষ্য করিতে ও সন্ধান দিতে আদেশ করিল। দিবাকর স্বয়ং গিয়া প্রতি রজকের গৃহে ধুইবার জন্য বস্ত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া একটি বস্ত্রে সিন্দূর ও কজ্জলের চিহ্ন পাইল। সেই রজক বলিল যে, ঐ বস্ত্র এক মালিনী তাহাকে কাচিতে দিয়াছে, তাহার পতি বা পুত্র নাই। কোটালগণ মালিনীর গৃহে গিয়া চড়াও হইল। সুন্দর তাহাদিগকে দেখিয়া সুড়ঙ্গে আত্মগোপন করিলেন। কোটালগণ সুড়ঙ্গের সন্ধান পাইল। গোবিন্দদাসের এই কাহিনী অবলম্বনে কৃষ্ণরাম কোটাল কর্ত্তৃক বিদ্যার বস্ত্রে সিন্দূর লেপন করাইয়াছেন। রামপ্রসাদ তাহা আরও ফলাও করিয়া পঞ্চাশ মণ সিন্দূর আনিয়া বিদ্যার গৃহ, খাট, যা কিছু ছিল, সব সিন্দূর রঞ্জিত করাইয়া এক বীভৎসতার সৃষ্টি করাইয়াছেন। এরূপ প্রকাশ্যভাবে কি সুন্দরের মত চতুর চোরকে ধরা সম্ভব? বিদ্যা তাহাকে কি সাবধান করিয়া দিতে পারেন নাই?

ভারতচন্দ্র বিদু ব্রাহ্মণী বা সিন্দুর লেপন প্রসঙ্গ বর্ণনা করেন নাই। বিদ্যার গৃহে সুড়ঙ্গ দৃষ্টি, কোটালের ভ্রাতৃগণের নারীর ছদ্মবেশে ও বিদ্যাকে সেইস্থান হইতে সরাইয়া তাহার ছদ্মবেশে অসতর্ক সুন্দরকে ধরাইয়া কাব্যের স্বাভাবিকতা ও রোমান্স সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই ব্যাপারে অপর কবিদ্বয় সিন্দুর লেপনেই ক্ষান্ত হন নাই। মালিনীর গৃহ হইতে সুড়ঙ্গ অনুসরণে বিদ্যার গৃহ পর্য্যন্ত খন্দক কাটাইয়া একটা হুলস্থুল ও লোক জানাজানির ব্যাপার করিয়া ফেলিয়াছেন। শেষে বিদ্যার সখীগণের মধ্যে নারী-বেশে লুক্কায়িত সুন্দরকে খন্দক লঙ্ঘন করার সময় বামপদের পূর্ব্বে দক্ষিণপদ অগ্রসর করিতে দেখিয়া চোর বলিয়া কোটাল কর্ত্তৃক ধৃত করাইয়াছেন। ইহাও নিতান্ত কৌশল-বর্জ্জিত পরিকল্পনা। কৃষ্ণরাম সুন্দরকে দিয়া ইচ্ছা করিয়া দক্ষিণ পদে খন্দক লঙ্ঘন করাইয়াছেন, যাহাতে কোটালকে চোর ধরিয়া দেওয়ায় সবংশে নিহত হইতে না হয়। রামপ্রসাদ কৃষ্ণরামকে হুবহু অনুকরণ করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের কোটাল সদলে সুড়ঙ্গপথে গমন করিয়া মালিনীর গৃহে উপস্থিত হইল ও হীরাকে পীড়ন করিতে লাগিল। ভারতচন্দ্রের হীরা সত্য-সত্যই কিছু জানিত না। কোটাল যখন তাহাকে সুড়ঙ্গ দেখাইল, সে অবাক্ হইয়া গেল :

"মালিনী বুঝিল মর্ম্ম কোটালে জানায় ধর্ম্ম
হোম কুণ্ড বলি বুঝি মোরে ছলি
সুন্দরের এই কর্ম্ম।"

কোটাল মালিনীকে সুন্দরের নিকট লইয়া গেল। সুন্দর তাহাকে মাসি বলিয়া সম্বোধন করিতেই হীরা তেলে বেগুনে জ্বলিয়া গেল, সুন্দরকে গালাগালি দিয়া বলিল :

"অরে বাছা ধূমকেতু মা বাপের পুণ্য হেতু
কেটে ফেল চোরে ছাড়ি দেহ মোরে
ধর্ম্মের বাঁধহ সেতু।"

কোটাল উভয়কে রাজার নিকট লইয়া গেল।

কৃষ্ণরাম এই প্রসঙ্গে সুন্দরের বন্ধন দৃষ্টে বিদ্যাকে দিয়া আক্ষেপ করাইয়াছেন ও পরে সুন্দরকে ছাড়িয়া দিবার জন্য কোটালের নিকট মিনতি করাইয়াছেন। রামপ্রসাদ এই দুই প্রসঙ্গ পৃথক্ ও বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং কাব্য অপেক্ষা

ছন্দের চাতুর্য্যের প্রতিই অধিক লক্ষ্য দিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যার আক্ষেপের ছন্দ, ভাব ও ভাষা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বেরই প্রমাণ দিয়াছে:

"কাঁদে বিদ্যা আকুল কুন্তলে
ধরা তিতে নয়নের জলে।
কপালে কঙ্কণ হানে অধীর রুধির বাণে
কি হৈল কি হৈল ঘন বলে॥
হায়রে বিধাতা নিদারুণ
কোন্ দোষে হইলি বিগুণ।
আগে দিয়া নানাদুখ মধ্যে দিন কত সুখ
শেষে দুখ বাড়ালি দ্বিগুণ॥

*   *   *

কাঁদে বিদ্যা বিনিয়া বিনিয়া
শ্বাস বহে অনল জিনিয়া।
ইহা কব কার কাছে এখনো পরাণ আছে
বঁধূয়ার বন্ধন শুনিয়া।"

কৃষ্ণরামের রাণীর চোর দেখিয়া হৃদয় বিকল হইল:

"দেখিয়া সুন্দর চোর মনোহর
হৃদয় বিফলমতি।
কেবা আনি দিল কোথায় পাইল
এ হেন সুন্দর পতি॥
ভাবিলে কি হয় আর কিছু নয়
কেননা কহিলা আগে।
রাজা ক্রোধ মন করয়ে কেমন
মোর বড় দুঃখ লাগে॥
বিদ্যা করি কোলে আপন আঁচলে
মুছিল বদন তার।
নিদারুণ বিধি দুঃখের অবধি
পাপ কপাল তোমার॥

কারো না কহিয়া আপনা যাইয়া
বিভা কৈলে সুবদনী।
গণ্ডগোল তবে এত কেন হবে
আমি যদি ইহা জানি॥"

ভারতচন্দ্রের রাণীও আক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কন্যার প্রতি এমন স্নেহ ফুটিয়া উঠে নাই:

"কি কহিব বিদ্যার কপাল
পেয়েছিল মনোমত ভাল।
আপনার মাথা খেয়ে মোরে না কহিলা মেয়ে
তবে কেন হইবে জঞ্জাল॥
হায় হায় হায়রে গোঁসাই
পেয়ে ছিনু সুন্দর জামাই।
রাজার হয়েছে ক্রোধ না মানিবে উপরোধ
এ মরিলে বিদ্যা জীবে নাই॥"

রামপ্রসাদের রাণী নিতান্ত সাধারণ নারীর ন্যায় সুন্দরের রূপের প্রশংসা করিয়াছেন:

"বিদ্যাবতী মুখে মুখ দিয়া দুঃখে
ডুকরিয়া কান্দে রাণী।
জন্মে জন্মে পাপ হেন মনস্তাপ
ভুঞ্জিব স্বপ্নে না জানি॥
কি বিদগ্ধ বিধি রসময় নিধি
নিরমিল তোর লাগি।
অনেক যতনে লভ্য এ রতনে
হারালি ছি ছি অভাগী॥

* * *

কিবা কব তোরে না কহিলি মোরে
গুপ্তে কণ্ঠে দিলি মালা।
বিধির লিখন না হয় খণ্ডন
এখন কে পায় জ্বালা॥

ভূপতি দুর্ব্বার নাহিক নিস্তার
নিতান্ত কাটিবে চোরে।
হয়ে থাক রাঁড়ী পোড়াইতে নাড়ী
এতেক দুষ্কর্ম্ম তোরে ॥"

কৃষ্ণরাম লিখিয়াছেন, সুন্দর ধরা পড়ায় বিদ্যা কাঁদিলেন, রাণী আক্ষেপ করিলেন, সহচরীগণ কাঁদিল, আর:

যতেক যুবতী দুঃখ ভাবে অতি
দেখিয়া চোরের তনু।
কাঁপে কলেবর সবে জর জর
করয়ে কুসুম ধনু ॥

তাহার পর কৃষ্ণরাম সুন্দরকে দেখিয়া নারীগণের আক্ষেপ প্রসঙ্গে নারীগণের বাৎসল্যভাবেরই পরিচয় দিয়াছেন।

রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন:

"ধরা গেল চোর সোর পড়িল নগরে।
বাল বৃদ্ধ যুবা ধায় নাহি রয় ঘরে ॥
স্তনপান করে শিশু কোলে যে ধনীর।
মৃত্তিকায় ফেলি ধায় হৃদয় অস্থির ॥"

রামপ্রসাদ সংক্ষেপে লিখিয়াছেন, চোরের রূপ দেখিয়া কুলবধূর মদনে অঙ্গ দহিতে লাগিল। সে চিত্রার্পিতের মত চাহিয়া রহিল; কেহ বলিল—'আমাকে কাটুক রাজা চোরের বদলে', কেহ বলিল—এরূপ দেখিলে রাজা কাটিতে পারিবেন না। আর হীরা "আছড়ি পাছাড়ি মহী" কাঁদিতে লাগিল।

ভারতচন্দ্রের হীরা তো নিজের প্রাণ রক্ষায় ব্যস্ত, চোরকে কোটাল কাটিয়া ফেলুক, তাহাতে তাহার কোন দুঃখ নাই। ভারতচন্দ্র চোরকে দেখিয়া নগর রমণীগণের পতিনিন্দা বর্ণনা করিয়াছেন। রসরচনা হিসাবে এই বর্ণনাটি অতি সুন্দর, কিন্তু কুলবধূর মুখ দিয়া প্রতিবেশিনীগণের নিকট এইরূপ পতিনিন্দা, বর্ত্তমান রুচির পক্ষে হজম করা কিছু কঠিন। ভারতচন্দ্র এ বিষয়েও মুকুন্দরামের চণ্ডী হইতে ধনপতিকে দেখিয়া বামাগণের পতিনিন্দারই ছায়া লইয়াছেন।

কৃষ্ণরাম ইহার পর "বিদ্যার দেবী আরাধনা ও বরলাভ প্রসঙ্গ" বর্ণনা করিয়াছেন। রামপ্রসাদ "চোর দর্শনে নাগরিকগণের খেদ" প্রসঙ্গের পূর্ব্বেই তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র এ প্রসঙ্গ বর্ণনাই করেন নাই।

কৃষ্ণরাম লিখিতেছেন, কোটাল চোরকে রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিলে :

"আড় আঁখি জামাতা দেখিল নরপতি।
নিশ্চয় জানিল রাজা রাজার সন্ততি ॥
পাত্রমিত্র সভাজন করে অনুমান।
পরমপুরুষ চোর কভু নহে আন ॥
কিবা মূর্খ কিবা ধীর জানিতে কারণ।
রাজা বলে কাট নিয়া দক্ষিণ মশান ॥
নয়ন ঠারয়ে পুন কোটাল বুঝিল।
এই লইয়া যাই বলি ক্ষণেক রহিল ॥"

ভারতচন্দ্র বলিতেছেন, রাজসভায় চোরকে কোটাল লইয়া আসিলে :

"হেটমুখে আড় চোখে চোর দেখে রায়।
রাজপুত্র হবে রূপ লক্ষণে জানায় ॥
বাছিয়া দিয়াছে বিধি কন্যাযোগ্য বর।
কিন্তু চুরি করিয়াছে শুনিতে দুষ্কর ॥
কাটিতে উচিত কিন্তু কেমনে কাটিব।
কলঙ্ক করিতে দূর কলঙ্ক করিব ॥
সহসা করিতে কর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে মানা।
যে হয় করিব পিছে আগে যাউক জানা ॥
হীরারে জিজ্ঞাসে চক্ষু করিয়া পাকল।
এটা কেটা কার বেটা সত্য করি বল ॥"

কৃষ্ণরাম প্রথমে রাজাকে দিয়া চোরের পরিচয় সম্বন্ধে তল্লাস করান নাই। যে মালিনীর বাড়ী সুন্দর আশ্রয় লইয়াছিল, রাজা তাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই। রাজা চোরকে কাটিতে বলিলে সুন্দর বলিলেন, "বিদ্যা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যে তাহাকে বিচারে পরাজিত করিবে, সে তাহাকেই বিবাহ করিবে। আমি তাহাকে বিচারে পরাজিত করিয়া বিবাহ করিয়াছি, এখন

আপনি রুষ্ট হইতেছেন কেন? পূর্ব্বে কন্যাকে এইরূপ পণ করিতে তো নিষেধ করিলে পারিতেন।" তাহার পরই কবি সুন্দরের মুখ দিয়া চৌরপঞ্চাশতের কয়েকটি শ্লোক বলাইয়াছেন। ইহার পর রাজার আদেশে পাত্র সুন্দরকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সুন্দর বলিলেন, "পরিচয়ে কি আবশ্যক। পণে জিতিয়াছি, সুতরাং আমি বিদ্যার স্বামী, পণে তো জাতি সম্বন্ধে কোন সর্ত্ত ছিল না।" ইহার পর রাজা তাহাকে মশানে লইয়া গিয়া ভয় দেখাইতে কোটালকে আদেশ করিলেন।

ভারতচন্দ্র এইখানে রাজাকে দিয়া হীরাকে প্রশ্ন করিয়া সুন্দরের পরিচয় জানিয়াছেন, কিন্তু সন্দেহভঞ্জনের জন্য কর্ম্মচারিগণের দ্বারা চোরকে প্রশ্ন করিয়াও কোন সদুত্তর না পাইয়া স্বয়ং তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সুন্দর এখানে বাক্ছলে উত্তর দিতেছেন :

"আমি রাজার কুমার আমি রাজার কুমার
কহিলে প্রত্যয় কেন হইবে তোমার।
বিদ্যাপতি মোর নাম বিদ্যাপতি মোর নাম
বিদ্যাধর জাতি বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম॥
শুন শ্বশুর ঠাকুর শুন শ্বশুর ঠাকুর।
আমার বাপের নাম বিদ্যার শ্বশুর॥
তুমি ধর্ম্ম অবতার তুমি ধর্ম্ম অবতার
অবিচারে চোর বল এ কোন বিচার॥
বিদ্যা করেছিল পণ বিদ্যা করেছিল পণ।
সেই পতি বিচারে জিনিবে যেই জন॥
পণে জাতি কেবা চায় পণে জাতি কেবা চায়
প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়ে যায়॥"

রাজকুমার বলিলেন, আমি পণে জিতিয়াছি, বিদ্যাকে ছাড়িব না। আমার হস্তে বিদ্যাকে দাও, তুমি জাতি লইয়া থাক। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কাটিতে বলিলেন, তথাপি সুন্দর বলিয়া যাইতে লাগিলেন—আমি সন্ন্যাসী হইয়া বিদ্যার পাণি প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তুমি প্রত্যহ আমাকে ভুলাইয়া ফিরাইয়াছ, আমি তাই সুড়ঙ্গ কাটিয়া গিয়াছিলাম। সভাসদগণ তাহাকে সেই সন্ন্যাসী বলিয়া

চিনিলেন। কোটাল কাটিতে চাহিলে, 'নয়ন ঠারিয়া মানা করে মহীপাল।' ইহার পর বিদ্যার বর্ণনা করিয়া সুন্দর কয়েকটি চৌরপঞ্চাশতের শ্লোক পড়িলেন।

রামপ্রসাদের কাব্যে কোটাল চোরকে রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিলে :

"ধন্যা কন্যা অন্বেষণে মিলাইল পতি।
বররূপে কোন দেব ভ্রমে বসুমতি॥
রেবতী রমণ কিম্বা কিম্বা বৃষকেতু।
কিম্বা নারায়ণ নিজে রামরম্ভা হেতু॥
কেমন পণ্ডিত বাপা জানা কিন্তু চাই।
রাজা বলে কাট চোরে মশানে বাঘাই॥
আঁখি ঠারে আরবার করে নিবারণ।
মিছামিছি করে কত তর্জ্জন গর্জ্জন॥"

ইহার পর সুন্দর কয়েকটি চৌরপঞ্চাশতের শ্লোক পড়িলেন। তাহার পর রাজাকে চিন্তান্বিত দেখিয়া পাত্র সুন্দরকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। সুন্দর তাহার যে উত্তর দিলেন, তাহাতে তাঁহার অভিজাত বংশোচিত রুচির পরিচয় নাই :

"কহে গুণ রাশি হাসি পাত্র! তুমি মূঢ়।
খাও হে বাপের কলা দিয়া ঝোলা গুড়॥
দাড়ি ভুঁড়ি সার, কোন জ্ঞান নাহি মাত্র।
হবচন্দ্র রাজা যেন গবচন্দ্র পাত্র॥
বনপশু বুঝেছি, বলিয়াছেন তুড়ি।
রাঙ্গা বট, যেন সার, কাঁঠালের গুঁড়ি॥
ছয় মাস গতে কর্ম্ম, সুধাও কি জাতি।
কেন না হইবে তুমি নিজে হও কাতি॥
তব চর্য্যা চর্চ্চিলাম আলাপে ক্ষণেক।
দ্বিপাদ পশুর মধ্যে তুমি হে জনেক॥
কদাচিৎ মিলে যদি তোমার দোসর।
চামার পরশ পায় তুনা বাড়ে দর॥"

ভারতচন্দ্র সভাসদগণের প্রশ্নে সুন্দরকে দিয়া ভদ্রভাবে বাক্‌কৌশলে প্রশ্ন এড়াইবার বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু রামপ্রসাদ তাঁহাকে দিয়া অভদ্রোচিত গালি

দেওয়াইয়াছেন। তাহার পর রাজার আদেশে কোটাল সুন্দরকে মশানে ভয় দেখাইতে লইয়া গেল।

চৌরপঞ্চাশতের শ্লোকের মধ্যে কৃষ্ণরাম নয়টি, ভারতচন্দ্র তিনটি এবং রামপ্রসাদ পাঁচটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে ভারতচন্দ্রের উদ্ধৃত শ্লোক তিনটিই কৃষ্ণরামের কাব্যে আছে এবং তাহার একটি রামপ্রসাদের কাব্যে নাই। রামপ্রসাদের উদ্ধৃত শ্লোক পাঁচটির মধ্যে তিনটি মাত্র কৃষ্ণরামের কাব্যে আছে। কৃষ্ণরাম ও ভারতচন্দ্র শ্লোকগুলির যথাসম্ভব আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু রামপ্রসাদ তাহা করেন নাই। এই শ্লোকগুলির মধ্যে শেষ শ্লোকটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

'অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কাল কূটং
কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং খলু পৃষ্টকেন।
অম্ভোনিধির্ব্বহতি দুর্ব্বহবাড়বাগ্নি
মঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি ॥'

ইহাতে সুন্দর রাজাকে আপন অঙ্গীকার পালন করিবার ইঙ্গিত করিলে তিনি লজ্জায় হেটমুখ হইয়া রহিলেন। ভারতচন্দ্র, কোটাল সুন্দরকে মশানে লইয়া যাইবার পর পক্ষমুখে চোরের পরিচয় দেওয়াইয়াছেন। এখানে শুকপক্ষীকে জ্ঞানবুদ্ধিশালী মানুষের মতই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা অবশ্য তাঁহার উপর মধ্যযুগীয় প্রভাবের ফল।

শুকের মুখে সুন্দরের পরিচয় শুনিয়া রাজার সন্দেহ বাড়িয়া গেল—

"মালিনী কহিল যাহা শুকপক্ষী বলে তাহা
চোর বুঝি গুণসিন্ধুসুত।"

রাজা শুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুন্দর যে গুণসিন্ধুর পুত্র, তাহার প্রত্যয় কিরূপে হইবে? জিজ্ঞাসা করিলে পরিচয় দেয় না। শুক বলিল—রাজপুত্র কখন নিজপরিচয় দেয় না, ভাটে পরিচয় দেয়, ঘটকে কুল বলে, ইহাই বড় মানুষের রীতি। আপনি তো ভাট পাঠাইয়াছিলেন, তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন। রাজা ভাটকে আনিতে দূত পাঠাইলেন। এদিকে সুন্দরকে কোটাল মশানে লইয়া গিয়া ভয় দেখাইলে সুন্দর কালিকার স্তুতি করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণরাম বা রামপ্রসাদ তাঁহাদের কাব্যে শুককে আনেন নাই, সুতরাং শুকমুখে সুন্দরের পরিচয়-প্রসঙ্গ তাঁহারা বর্ণনা করেন নাই।

সুন্দরের স্তবে দেবী তাঁহাকে অভয় দিলেন। কৃষ্ণরাম ঠিক এই সময়ে মাধবভট্টকে সুন্দরের পিত্রালয় হইতে দেশে ফিরাইয়াছেন। রামপ্রসাদ তাহাকে শ্মশানে আনিয়াছেন বটে, তবে তিনি বলেন নাই যে, মাধবভট্ট ঠিক সেই সময় দেশে ফিরিয়াছিল কিনা। সুন্দর-বধোদ্যত কোটালকে নিরস্ত হইতে বলিয়া মাধবভট্ট তাহাকে কটূক্তি করিল, কোটালও জবাব দিল। ভারতচন্দ্র কোটালের সহিত ভা'টর সাক্ষাৎ বর্ণনা করেন নাই।

কৃষ্ণরাম লিখিয়াছেন, ক্রুদ্ধ মাধবভট্ট রাজার নিকট গিয়া রাজাকে বামহস্তে 'মজুরা' করিলে রাজা যখন ক্রুদ্ধ হইলেন তখন সে বলিল, আমার কোন অপরাধ নাই, দুঃখে মন দগ্ধ হইতেছে—গুণসিন্ধু রাজার পুত্র সুন্দরের বন্ধনদশা দেখিয়া আমার দক্ষিণ হস্ত অবশ হইয়া গিয়াছে। রাজা ভাটের কথা শুনিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও উপহার দিলেন এবং পদব্রজে মশানে আসিয়া সুন্দরের নিকট ক্ষমা চাহিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। রামপ্রসাদ মাধবভট্টকে সোজাসুজি রাজার নিকট গিয়া সুন্দরের পরিচয় দেওয়াইয়াছেন, বাম হস্তে মজুরা করার কথা লিখেন নাই।

ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন, ভাট রাজার নিকট নীত হইলে রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তোমাকে গুণসিন্ধু রাজার পুত্রকে আনিতে পাঠাইয়াছিলাম, তুমি ফিরিয়া আসিয়া কোন সংবাদ দেও নাই যে, তিনি কেন আসিলেন না। উত্তরে ভাট জানাইল—"দীর্ঘকাল বিদেশে থাকার পর ফিরিয়া আসিয়া ইতিমধ্যে মাতৃপিতৃবিয়োগ হইয়াছে শুনিয়া আমার চিত্ত বিকল হইয়াছিল; সেইজন্য পাঁচমাস শোকসন্তপ্ত চিত্তে নিজগ্রামে কাটাইয়া বর্দ্ধমানে আসিয়া আমি দেওয়ানজীকে ও বকসীকে জানাইয়াছিলাম।" সকল কথা বুঝিয়া রাজা সুন্দরকে চিনিবার জন্য ভট্টকে মশানে পাঠাইলেন। চোরকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া ভট্ট আসিয়া রাজাকে সংবাদ দিলে রাজা:

"কুঠার বাঁধিয়া গলে আপনি মশানে চলে
পাত্র মিত্রগণ সব সাথী।"

এদিকে কালিকার সঙ্গিনী ডাকিনী যোগিনী ও ভূতগণ কোটালকে সদলবলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। রাজা সুন্দরের নিকট ক্ষমা চাহিলেন এবং কোটালের মুক্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলে সুন্দর কালীপূজা করিতে বলিলেন। রাজা

কালীপূজা করিলে কোটাল মুক্ত হইল। কোটালের বন্ধন ও মুক্তির প্রসঙ্গ কৃষ্ণরাম বা রামপ্রসাদ বর্ণনা করেন নাই।

তিন জন কবিই রাজা কর্ত্তৃক সুন্দরের নিকট বিনয় প্রসঙ্গটিকে এমনভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, যেন রাজাই অপরাধী এবং সুন্দরই বিচারক। কৃষ্ণরাম রাজাকে দিয়া সুন্দরকে এই বলিয়া প্রবোধ দিয়াছেন যে, বিধিলিপি অলঙ্ঘ্য; তোমার অদৃষ্টে বন্ধনযোগ ছিল, তাই তুমি কষ্ট পাইলে, তোমার মত জামাই পাইয়া আমি ধন্য হইলাম। সুন্দরও বিনীতভাবে বলিলেন—আপনি পূজনীয় ব্যক্তি, আপনার এরূপ বিনয়ের কি প্রয়োজন, আমি চোরের মত ব্যবহার করিয়াছিলাম, কোটাল আমাকে ধরিয়া আনিয়াছে, দেবীর কৃপায় প্রাণরক্ষা হইয়াছে। রামপ্রসাদ ইহাই নিজের ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণরাম লিখিয়াছেন, সুন্দরের বন্ধন-মুক্তি ও রাজা কর্ত্তৃক প্রসাদনের কথা সুলোচনা গিয়া বিদ্যাকে জানাইল, বিদ্যার জননীও একথা শুনিলেন ও কন্যার নিকট ক্ষমা চাহিলেন। কিন্তু রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন—বিদ্যার সখীগণ গিয়া এ সংবাদ রাণীকে দিলে তিনি গিয়া বিদ্যাকে জানাইয়া তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

ভারতচন্দ্র কালী মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য সুন্দরকে দিয়া রাজার দিব্যদৃষ্টি দিয়াছেন ও কালীদর্শন করাইয়াছেন। এ যেন মঙ্গল কাব্যপর্য্যায়ভুক্ত করিবার জন্য কাব্যের শেষে একটি সংশোধনের প্রচেষ্টা। রাজা মশান হইতে সুন্দরকে নিজ প্রাসাদে লইয়া গিয়া:

"সিংহাসনে বসাইয়া বসন ভূষণ দিয়া
বিদ্যা আনি কৈল সমর্পণ
বিস্তর করিল স্তব নানা মত মহোৎসব
হুলাহুলি দেই বামাগণ॥"

কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন, রাজা বিদ্যাসুন্দরের প্রকাশ্য বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়া পুরোহিত বা পণ্ডিতগণকে বিধি জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন—গান্ধর্ব্ব বিবাহ শাস্ত্রমতসিদ্ধ, তাহার পর আর অন্য প্রকার বিবাহের আবশ্যক নাই। কৃষ্ণরাম লিখিয়াছেন:

"শুনিয়া মানসে ভায় বীরসিংহ নৃপরায়
আনাইল নরপতিগণ।

বিদ্যাসুন্দরের বিহা যতনে জানাইল ইহা
দিয়া রত্ন বসন ভূষণ ॥"

রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন—পণ্ডিতগণ বলিলেন, ব্রাহ্মণকে রত্নদান করিলেই জামাতার মানরক্ষা হইবে ও "ঘুষিবেক কীৰ্ত্তি চিরকাল"। রাজা তাহাই করিলেন। ভারতচন্দ্র এসব কিছু লিখেন নাই। কৃষ্ণরাম ইহার পর লিখিয়াছেন, বিদ্যাকে লইয়া—

"পাশরিয়া পিতামাতা সুকবি সুন্দর।
রহিলা মহিলা লৈয়া শ্বশুরের ঘর॥

কালিকা নিজ মূৰ্ত্তিতে দর্শন দিয়া সুন্দরকে বলিলেন, তুমি পিতামাতাকে ভুলিয়া, দেশ ভুলিয়া স্ত্রী লইয়া পড়িয়া আছ, প্রভাতে উঠিয়া দেশে ফিরিয়া যাও। সুন্দর গৃহে ফিরিতে সঙ্কল্প করিলেন।

রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন:

"শ্বশুর বাসেতে রহে কবি যুবরাজ।
ভাবেন ভুবনমাতা ভাল এই কাজ॥
শাপভ্রষ্ট জন্ম ধরা আমার সুন্দর।
মম পূজা প্রকাশিতে পৃথিবী ভিতর॥
কামিনী পাইয়া সুখে ভুলিলা কুমার।
তবেত আমার পূজা হবে না প্রচার॥"

কালিকা সুন্দরের মাতৃবেশে দেখা দিয়া তিরস্কার করিলে সুন্দর গৃহে ফিরিতে সঙ্কল্প করিলেন। রামপ্রসাদ এবং সম্ভবতঃ কৃষ্ণরামও এস্থলে মুকুন্দরামের চণ্ডীর শ্রীমন্ত উপাখ্যান হইতে প্রেরণা পাইয়াছেন।

ইহার পর সুন্দরের স্বদেশ গমনের ইচ্ছাপ্রকাশে বিদ্যার উক্তি। কৃষ্ণরাম বিদ্যাকে দিয়া বলাইয়াছেন:

"পুত্র কোলে করি যাব নিজ পুরী
এ বড় সাধ আমার।"

সুতরাং সুন্দর মুক্তিলাভের অল্পকাল পরেই গৃহে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এবং বিদ্যা শ্বশুরালয়ে পুত্র প্রসব করিয়াছেন। রামপ্রসাদও নূতনত্ব কিছুই করেন নাই। কিন্তু ভারতচন্দ্র লিখিতেছেন :

"সুন্দর বিদ্যারে লয়ে চোর ছিলা সাধু হয়ে
কতদিন বিহারে রইলা।
পূর্ণ হইল দশমাস শুভদিন পরকাশ
বিদ্যামতী পুত্র প্রসবিলা॥
ষষ্ঠীপূজা সমাপিয়া ছয় মাসে অন্ন দিলা
বৎসরের হইল তনয়।
সুন্দর বিদ্যারে কন যাব আমি নিকেতন
ভারত কহিছে যুক্তি হয়॥"

তিনজন কবিই বিদ্যার বারমাসী বর্ণনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ মুকুন্দরামের "সুশীলার বারমাসিয়া" হইতেই কৃষ্ণরাম বিদ্যার বারমাসী বর্ণনা করিবার প্রেরণা পাইয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র এই প্রসঙ্গকে মধুরতর করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণরাম চৈত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ফাল্গুনে শেষ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া চৈত্রে শেষ করিয়াছেন এবং রামপ্রসাদ রাশি হিসাবে মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া মীনে শেষ করিয়াছেন। আমরা কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, প্রত্যেক কবির বর্ণনা কৌশল কিরূপ—

কৃষ্ণরাম—

রতিপতি বাটপাড় বরিসা বিশিখ আড়
আষাঢ় মাসের শুন বোল।
যুবক যুবতী সঙ্গ কদাচিত হয় ভঙ্গ
পলকে প্রলয় গণ্ডগোল॥
গগনে গহন ঘন গুরু গুরু গরজন
নবশির অশ্রফলীর মুখ।
মউরে পেকম ধরে চাতকের মান হরে
কোলাহল ভেকের কৌতুক॥
আইলে সায়ন মাস যেথা যায় পরবাস
পরবাসি পুরুষ অধম॥

কাসের কুসুম শরে কাতর কেমন করে
কালে রাখে পরম উৎক্রম ॥
ছয় রিতু সুখে জয় বিশেষত বরিষয়
ডেকে করে ভাগ্য ধর কত।
সুখ দুখ সর্ব্বকারণ ইহাতে অধিক আর
পুণ্যশূন্য জন্য পাপ যতো ॥”

রামপ্রসাদ—

“মিথুনে মিথুনে যেই ধন্য পুণ্যবন্ত সেই
অন্য কেবা সেজন সমান।
বিরহিনী কুলদারা যারা তারা দেবে তারা
প্রায় মরা কণ্ঠাগত প্রাণ ॥
ঘন ঘন ঘন বর অবশ শরীর সব
মনোভব নিতান্ত দুরন্ত।
কদম্ব কুসুম ফুটে বনতটে মন ছুটে
দুঃখ শান্ত কান্ত কি কৃতান্ত ॥
কর্কটে বরিষা বাড়ে পক্ষী নাহি বাসা ছাড়ে
যাতায়াতে সকলে রহিত।
ঘরছাড়া পতি যার অভাগ্য কপাল তার
ধীরে ধীর বিধি বিড়ম্বিত ॥
ধরাধর গুরু গর্জ্জে যে বুঝি মদন তর্জ্জে
আটনি দামনি বাহুলাড়া।
দেবরাজ দণ্ডে মর্ম্ম দেখ কি অনীত কর্ম্ম
মরার উপরে হানে খাঁড়া ॥”

ভারতচন্দ্র—

“আষাঢ়ে নবীন মেঘে গভীর গর্জ্জন।
বিয়োগীর যম সংযোগীর প্রাণধন ॥
ক্রোধে কান্তা যদি কান্তে পিঠ দিয়া থাকে।
জড়াইয়া ধরে ডরে জলদের ডাকে ॥

শ্রাবণে রজনী দিনে এক উপক্রম।
কমল কুমুদ গন্ধে কেবল নিয়ম॥
ঝঞ্চনার ঝঞ্চনী বিদ্যুত চকমকি।
দেখিবে শিখীর নাদ ভেক মকমকি॥"

আমরা এইস্থানে চণ্ডী হইতে সুশীলার বারমাসিয়ার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি :

'আষাঢ়ে গর্জ্জয়ে মেঘ নাচয়ে ময়ূর।
নব জল মদে মত্ত ডাকয়ে দাদূর॥
শালি অন্ন দধিখণ্ড ভুঞ্জাব প্রচুর।
আমার বচন শুন না চলিহ দূর॥
আষাঢ় সুখ হেতু আষাঢ় সুখ হেতু।
নিদাঘ বরিষা হিম একে তিন ঋতু॥
সঙ্কট সময় বড় ধারার শ্রাবণ।
সাধ লাগে অঙ্গে দিতে রবির কিরণ॥
জলধারা বরিষয়ে আটদিগে ধায়।
বিনোদ মন্দিরে যাক না চলিহ রায়॥
পূরাব অভিলাষ পূরাব অভিলাষ।
শুষান মন্দিরে নাথ করাইব বাস॥"

উপরি উদ্ধৃত যাবতীয় বর্ণনার মধ্যে কাব্য সৌন্দর্য্য বা ঐশ্বর্য্যগুণে ভারতচন্দ্রের কাব্যই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে। ইহার পর সুন্দর যখন কিছুতেই শুনিলেন না, তখন বিদ্যা পিতামাতার নিকট বিদায় লইয়া স্বামীর সহিত শ্বশুরালয়ে যাইতে মনস্থ করিলেন। রাজা ও রাণী বিস্তর বুঝাইলেন, কিন্তু সুন্দর টলিলেন না। অগত্যা বিদ্যা শ্বশুরালয়ে গমন করিল। কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন, গুণসিন্ধু ও তাঁহার মহিষী পুত্র ও পুত্রবধূকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রত্যুদগমন করিলেন। ভারতচন্দ্র এ বিষয়ের উল্লেখ করেন নাই। ভারতচন্দ্র এখানেই কাব্য শেষ করিয়াছেন এবং সংক্ষেপে বলিয়াছেন, গুণসিন্ধু পুত্রকে রাজ্যভার

দিলেন। সুন্দর কালীর পূজা দিলেন। কালী মূর্ত্তিমতী হইয়া দম্পতিকে জানাইলেন ঃ

"তোরা মোর দাসদাসী শাপেতে ভূতলে আসি
আমার মঙ্গল প্রকাশিলা।
ব্রত হৈল পরকাশ এবে চল স্বর্গবাস
নানামতে আমারে তুষিলা॥"

অবশেষে দিব্যজ্ঞান পাইয়া তাঁহারা সকল বুঝিতে পারিলেন। বাপমাকে বুঝাইয়া পুত্রে রাজ্যভার দিয়া দেবীর সঙ্গে স্বর্গে চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণরামও সুন্দরের গৃহে আগমনের পর রাজা কর্ত্তৃক পুত্রকে রাজ্যভার দান করিয়া গুণসিন্ধুর সস্ত্রীক বানপ্রস্থ গমনের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর বিদ্যা পুত্র প্রসব করিলে তাহার নাম হইল পদ্মনাভ। সে বড় হইল, তাহার বিবাহ হইল, এমন সময় দেবী স্বপ্নে সুন্দরকে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইলেন। সুন্দর প্রভাতে উঠিয়া পুত্রকে রাজ্যভার দিলেন। শিব পার্ব্বতী মহাকাল পাঠাইলেন তাঁহাদের সেবক দম্পতীকে আনিবার জন্য। শাপান্তে বিদ্যাসুন্দরকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

রামপ্রসাদ সবই একটু অধিক বর্ণনা করিয়াছেন। সুন্দর বধূ লইয়া আসিলে নগরের নারীগণ বধূ দেখিতে আসিয়া গর্ভবতী বিদ্যাকে লইয়া রহস্য করিল। তাহার পর সুন্দরের রাজ্যাভিষেক প্রসঙ্গ ও সুন্দরের দক্ষিণ কালিকামূর্ত্তি সংস্থাপন, শবসাধন ও দেবী পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিলে পুত্র পদ্মনাভকে রাজ্য দিয়া সুন্দর ও বিদ্যা যোগাসনে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। ইহার পর কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ উভয়েই দেবীর পৌরাণিক লীলা বর্ণনা করিয়া "অষ্ট মঙ্গলা" গাহিয়াছেন এবং সেই প্রসঙ্গে বিদ্যাসুন্দরের পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণরাম সর্ব্বশেষে গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম ও ফলশ্রুতি বর্ণনা করিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। রামপ্রসাদ অষ্টমঙ্গলাতেই গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন।

কাব্য তিনটির বিষয়বস্তুর বর্ণনায় যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার তুলনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, কবিত্রয় যে যে পরিবেশের মধ্যে মানুষ হইয়াছিলেন, অলক্ষ্যে তাঁহাদের লেখনী তাঁহাদের দ্বারা সেই চিত্রই ফুটাইতে সাহায্য করিয়াছে। কৃষ্ণরামের আর্থিক অবস্থা রামপ্রসাদ অপেক্ষা স্বচ্ছল ছিল; সুতরাং কৃষ্ণরামের নায়ক-নায়িকা রাজপুত্র রাজকন্যা হইলেও সম্পন্ন গৃহস্থ বাঙালী ঘরের দুইটি যুবক-যুবতীর চিত্রই তাঁহার কাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিদ্যার

মাতা যেন স্নেহশীলা গৃহিণী, কন্যার অনূঢ়া অবস্থায় গর্ভ সংবাদে যেমন লোকাপবাদভয়ে ভীতা, তেমনি কন্যার কল্যাণ কামনায় উৎকণ্ঠিতা। কৃষ্ণরাম রাজধানী, গড় ইত্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন, যেমন মুঘলযুগের সমৃদ্ধ নগরী দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন, তেমনি। মুঘলযুগের অন্তঃপুরের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না, সুতরাং যখন রাজপ্রাসাদের অধিবাসী অধিবাসিনীদের বর্ণনা করিতে গিয়াছেন, তখন যুগসুলভ আভিজাত্য রক্ষা না করিয়া আপন গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থঘরের বা জমিদার ঘরের চিত্র বর্ণনা করিয়াছেন।

রামপ্রসাদ অপেক্ষাকৃত আধুনিকযুগের লোক। রাজধানী বা রাজপ্রাসাদ বর্ণনায় তিনি বাস্তবচিত্র অঙ্কন করেন নাই, কতকটা কৃষ্ণরামের অনুকরণ এবং কতকটা কলিকাতার তদানীন্তন চিত্র মিশাইয়া একটা বর্ণনা করিয়াছেন। নায়ক-নায়িকা ও অন্যান্য পাত্রপাত্রী বর্ণনায় তিনি একান্ত সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের চিত্রই ফুটাইতে পারিয়াছেন—তাঁহার বর্ণিত রাজধানী বা রাজপ্রাসাদের মধ্যে তাহাদিগকে যেন ঠিক স্থান দেওয়া যায় না। ভারতচন্দ্র মুঘলযুগের শেষ অবস্থার জমিদার পরিবারের সন্তান। পিতা নরেন্দ্র রায় সুবিখ্যাত ভূম্যধিকারী ছিলেন। সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে সম্মানপূর্ব্বক রাজা বলিয়া অভিহিত করিত। সেই যুগের রাজবংশের ও নবাব-কুলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। সুতরাং তাঁহার কাব্যে আমরা একটা রাজকীয় পরিবেশের চিত্র দেখিতে পাই। ভারতচন্দ্রের গড়বর্ণন ও পুরবর্ণন অপর দুই কবি অপেক্ষা অধিকতর রাজসিক। সুন্দরের ভাবভঙ্গী সমস্তই আভিজাত্য-পূর্ণ। বিদ্যাসুন্দরের দর্শন প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র যে আভিজাত্য দেখাইয়াছেন, রাম-প্রসাদের কাব্যে তাহার চিহ্ন নাই—অনুকরণেও সে ভাব ফুটিয়া উঠে নাই। বিদ্যাসুন্দরের প্রথম মিলন বা কৌতুকারম্ভ প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র যে অভিজাত—জনো-চিত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন, রামপ্রসাদের কাব্যে তাহা ফুটিয়া উঠে নাই। মালিনীর নিকট হইতে বিদ্যার সহিত মিলনের কথা গোপন করিয়া ভারতচন্দ্র সুন্দরের আভিজাত্য বজায় রাখিয়াছেন। কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ সামান্য লম্পটের কুটনীর সহিত আলাপের ন্যায় বিদ্যাসমাগম ব্যাপারে মালিনীর সহিত সুন্দরের আলাপ বর্ণনা করিয়াছেন। সুন্দরের সন্ন্যাসীবেশে রাজসভায় আগমন প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া ভারতচন্দ্র রাজার মনের ভাবে আভিজাত্যের একটা সুন্দর চিত্র দিয়াছেন। আবার বিদ্যার গর্ভের সংবাদে রাণী বিদ্যার সহিত দেখা করিতে আসিলে কন্যা ও মাতার যে আলাপ হইয়াছিল, তাহাতে রামপ্রসাদ গ্রাম্য সাধারণ

নারীর কোন্দলই বর্ণনা করিয়াছেন। অথচ ভারতচন্দ্র সেই প্রসঙ্গে যথেষ্ট আভিজাত্যের সহিত বাক্‌সংযমের চিত্র ফুটাইয়াছেন—ভারতচন্দ্রের রাণী একান্তই রাজরাণী। কোটালের সহিত রাজার আলাপ এবং কোটালের রাজা সম্বন্ধে মনোভাবে রাম-প্রসাদ যতদূর সম্ভব প্রাকৃত জনোচিত প্রতিবেশই সৃষ্টি করিয়াছেন, আর ভারত-চন্দ্রের বর্ণনা পড়িলে প্রকৃত রাজসভার চিত্রই মনে পড়ে। এইরূপ সর্ব্বত্রই ভারতচন্দ্র একটা রাজকীয় পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়াছেন। সুন্দরকে দেখিয়া নারীগণের পতিনিন্দা প্রসঙ্গে কালা, অন্ধ, বৃদ্ধ, স্থূলকায়, বামন প্রভৃতি দৈহিক দোষ-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের স্ত্রীগণ ব্যতীত যে সকল ব্যক্তির স্ত্রীদিগের উক্তি ভারতচন্দ্র বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা সকলেই রাজসভাসদ্‌বৃন্দের স্ত্রী। নগরের গণ্যমান্য ব্যক্তিমাত্রই রাজকর্ম্মচারী। এখানেও ভারতচন্দ্রের রাজকীয় পরিবেশ সৃষ্টিরই মনোভাব পাওয়া যায়। রাজসভায় সুন্দরকে আনান প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র মুঘলযুগের শেষাংশের বাদসাহ বা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব নাজিমের সভার একটা চিত্র দিয়াছেন। শুক মুখে চোরের পরিচয় প্রসঙ্গেও সুন্দরের আভিজাত্যের প্রমাণ-স্বরূপ শুককে দিয়া বলাইয়াছেন :

"শুক বলে মহাশয় আপনার পরিচয়
রাজপুত্র কেবা কোথা দেয়।
ভাটে দেয় পরিচয় ঘটকেরা কুল কয়
বড় মানুষের রীত এই ॥"

বারমাস বর্ণনায় বিদ্যা বলিতেছেন :

"ভাদ্রমাসে দেখিবে জলের পরিপাটি।
কোশা চড়ি বেড়াবে উজান আর ভাটি ॥"

* * *

'নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড় আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব ॥"

ইহা রাজকন্যা ভিন্ন কে বলিতে পারে?

এই সকল চরিত্রচিত্রণ ও আনুষঙ্গিক অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি দেখিয়া এই সত্য স্পষ্টই অনুভব করা যায় যে, ভারতচন্দ্র মঙ্গল কাব্যের ঐশ্বর্য্যময় যুগেরই স্রষ্টা। গ্রাম্য সুরের এবং গ্রাম্য ভাব ও ভাষার কাব্যের মধ্যে কবি এক নাগরিক সৌখীন ও বিলাস-প্রবণ প্রাণের সঞ্চার করিয়া ইহার এক নূতন অভিজাত মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন।

বিদ্যাসুন্দর কাব্য

পাদটীকা

১। 'কবিকঙ্কের করুণ কাহিনী'—'সৌরভ' ১৩২৪ (কার্ত্তিক) পৃ. ১৫-১৬,
'সৌরভ'—১৩২৫-২৬, পৃ. ১২, ৫২, ১০৫, ১২৯, ১৪৭।
'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'—সংস্করণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—৪৪।২২-৪
দৌলত কাজীর 'লোর চন্দ্রানী' কাব্যে 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনীর উল্লেখ আছে—"চন্দ্রানীর তোমার মিলন মনোরম। বিদ্যাসঙ্গে সুন্দরের যেন সমাগম॥' আলাওলও তাঁহার 'পদ্মাবৎ' কাব্যে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন।

২। একটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ও অপরটি Royal Asiatic Society of Bengalএর পুঁথিশালায় রক্ষিত আছে।

৩। পরিশিষ্টে তুলনামূলক বিষয়সূচী দ্রষ্টব্য।

৪। 'The Long lost Sanskrit Vidyasundar', *Proceedings of the Second Oriental Conference.* pp. 215-20.

৫। পরিশিষ্টে তুলনামূলক তালিকা দ্রষ্টব্য।

৬। সা. প. প. ৫০ পৃ. ৬৪।

৭। পরিশিষ্টে তুলনামূলক বিষয়সূচী দ্রষ্টব্য।

৮। নন্দলাল দত্ত প্রণীত 'কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহ' পুস্তকের ভূমিকা পৃ. ||৵০।

বিদ্যাসুন্দর কাব্যের ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কার—সাহিত্যমূল্য

বিদ্যাসুন্দর প্রসাদী জীবনের সর্ব্বপ্রথম রচনা বলিয়া মনে হয়। ইহার মধ্যে প্রসাদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে বটে, কিন্তু এ পাণ্ডিত্যের সহজ প্রকাশ নাই। তাঁহার কাব্যে যুগোচিত ভাষা ব্যবহারের নীতি ও প্রকৃতি অনুসারে বাংলা ও সংস্কৃতের বহুল মিশ্রণ আছে সত্য, সংস্কৃত ছন্দ ও অলঙ্কারের প্রয়োগও যথেষ্ট। কিন্তু অভাব ইহাদের অনাড়ষ্ট ও অকৃত্রিম মিশ্রণের। ভারতচন্দ্র যেমন তাঁহার কাব্যে বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী ও ফারসী শব্দের অবাধ ও চমকপ্রদ মিশ্রণ ঘটাইয়াছেন, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর কাব্য পড়িলে মনে হয়, তখনও কবি

সংস্কৃত ও বাংলার মিশ্রণ-প্রকৃতি তেমন করিয়া আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। পাণ্ডিত্য তখনও তাঁহার সহজ ভাব ও প্রকৃতির অনুগামী নহে।

'পূর্ণচন্দ্র শোভা যেন পিবতি চকোর।
ক্ষেপ করে দশদিক্ষু লোষ্ট্র বিবর্দ্ধনে॥' [১]

অথবা,

'সহজে কলঙ্কী সে তবাস্য সম নহে'। [২] এই সকল অংশের সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত পদগুলি বাংলা পদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক সমগ্ররূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই। পাণ্ডিত্য বা ভাষাজ্ঞানকে যেন তখনও তিনি সাহিত্যের প্রকাশপ্রকৃতি দান করিতে পারেন নাই। তাই স্থান বা অবসর নির্ব্বিচারে প্রসাদ কতকটা সাজাইয়া গুছাইয়া আড়ম্বরের সঙ্গেই তাহার ব্যবহার করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের মত প্রসাদী বিদ্যাসুন্দরেরও যমক অনুপ্রাসাদি সংস্কৃত অলংকার ও নানা ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু এ কাব্যে এ সকল অলঙ্কার একান্ত ছাঁচে ঢালা, প্রসাদী সঙ্গীতের অলঙ্কারের মত ইহাদের মধ্যে কবির সহজ প্রাণবত্তা বা গভীর ব্যঞ্জনা নাই, অর্থাৎ প্রসাদ তখনও সাহিত্যের ছন্দ ও অলঙ্কারাদির প্রয়োগে আপন প্রকৃতিকে খুঁজিয়া পান নাই।

বিদ্যাসুন্দর কাব্যে প্রসাদী ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কার প্রকৃতির এই দৈন্যের একটি কারণ যেমন মনে হয়, কবিজীবনের অপরিণতি বা রচনার বাল্যাবস্থা, কাব্য-প্রকৃতিও ইহার অন্যতম বিশেষ কারণ বলিয়া মনে হয়। বিদ্যাসুন্দর কাব্যটি প্রধানতঃ কাহিনীমূলক বা বস্তুধর্ম্মী। কিন্তু শাক্ত সঙ্গীতরচনায় প্রসাদের ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কারগত অপূর্ব্ব প্রতিভা দেখিয়া মনে হয়, প্রসাদের প্রতিভা একান্তই ভাবধর্ম্মী। ভাব যেখানে কাব্যের প্রাণ, প্রসাদী সাহিত্য সেখানেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত এবং সাবলীল। আবার কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন ও বিশেষ করিয়া অজস্র শাক্তসঙ্গীতরূপ খণ্ডকাব্য রচনায় প্রসাদের দক্ষতা দেখিলে মনে হয়, বিদ্যাসুন্দরের মত বিপুলায়তন ও বিষয়ধর্ম্মী কাব্যরচনা প্রসাদী প্রতিভার স্বধর্ম্ম নহে; খণ্ডকাব্য রচনাতেই তাঁহার প্রতিভা স্বপ্রতিষ্ঠ।

তবে, প্রসাদী বিদ্যাসুন্দরে সরস ও উপভোগ্য বর্ণনা আদৌ নাই, একথাও সত্য নয়। ভারতচন্দ্রের মত অমন সূক্ষ্ম ও নিখুঁত শিল্পকৌশলের পরিচয় না থাকিলেও তাঁহারও কাব্যের কোন কোন অংশ রসিকজনের উপভোগ্য, সন্দেহ

নাই। সাধারণ লোকের গুজবপ্রিয়তা অথবা ভণ্ড সাধুসন্ন্যাসীর বর্ণনায় ও প্রাকৃত রসসৃষ্টিতে রামপ্রসাদের রচনা সরস ও বস্তুধর্ম্মী।

শহরে গুজব উঠে একে একশত
গল্প ঝাড়ে বড়ই আঠার মেসে যত।
দরজায় বস্তে কেহ মণ্ডলের ঠাট
পথের মানুষ ডেকে লাগাইছে হাট।[৩]

এই জাতীয় বর্ণনায় প্রসাদের ভাষা সহজ ও সরস এবং প্রাকৃত-জনপ্রিয়।

যাহা হউক, মোটের উপর বিদ্যাসুন্দরকাব্য প্রসাদের সহজ প্রতিভার পরিচয় নহে। এজন্য সাহিত্য হিসাবে ইহার স্থান খুব উল্লেখযোগ্য নহে।

কালীকীর্ত্তন

যতদূর জানা বা অনুমান করা যায়, তাহাতে মনে হয়, বিদ্যাসুন্দরের পরই রামপ্রসাদ কালীকীর্ত্তন বা কৃষ্ণকীর্ত্তন রচনা করেন, অর্থাৎ এগুলি তাঁহার প্রাথমিক রচনা। ইহারও ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কারাদি দেখিয়া মনে হয় এখানেও রামপ্রসাদ ঠিক আত্মপ্রকাশের স্বকীয় ধর্ম্মের সন্ধান লাভ করেন নাই। বিদ্যাসুন্দরের মত এখানেও তাঁহার সংস্কৃত ও বাংলাভাষার সমন্বয় অনেক স্থলেই প্রয়াসকল্পিত। মনে হয়, কবি যেন সংস্কৃতভাষার রূপ ও প্রকৃতি কতকটা জোর করিয়া, কিছুটা কাল ও শ্রেণী ধর্ম্মবশে বাংলাভাষার উপর চাপাইয়া দিতেছেন।

'উদয়তি দিনকৃতি নলিনী বিকসতি এবমুচিতমধুনা তব নহি।
সুত মাগধ বন্দি কৃতাঞ্জলি কথয়তি নিদ্রাং জহিহি।
গাত্রোত্থানং কুরু করুণাময়ি সকরুণ দৃষ্টি ময়ি দেহি॥'[১]

বিদ্যাসুন্দর কাব্যের অনেক অংশের মত এখানেও বাংলা ও সংস্কৃতের মিলন আদৌ সহজ বা অবাধ নহে। ভাষা, ছন্দ বা ইহার অলঙ্কার প্রকৃতির বিচারে কালী-কীর্ত্তন বিদ্যাসুন্দরেরই পরবর্ত্তী রচনা। তবে, যেহেতু ইহার বিষয়বস্তুটি বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা অনেকটা গীত ও ভাবধর্ম্মী এবং খণ্ডপ্রকৃতির, সেইজন্য পূর্ব্বাপেক্ষা এ কাব্যে প্রসাদী প্রতিভার কিছু কিছু রূপ কোন কোন অংশে ধরা পড়ে।

সুচারু বকুল মালে কবরী বান্ধিল ভালে হরিচন্দনের বিন্দু দিল।
তার উপরে সিন্দূর বিন্দু রবিকোলে যেন ইন্দু হেরি হেরি নিমিষ তেজিল॥

দোথরি মুকুতা হার কোন সহচরী আর গেঁথে দিল উমার কপালে।
অনুমানে বুঝি হেন চাঁদ বেড়া তারা যেন উদয় করেছে মেঘের কোলে॥

কালীকীর্ত্তনের এই সকল অংশ অপেক্ষাকৃত সরস ও সহজ কবিকীর্ত্তির পরিচয়।

যাহা হউক, ভাষা বা সাহিত্যবিচারে বিদ্যাসুন্দরের মত কালীকীর্ত্তনও তেমন উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি না হইলেও প্রসাদের কালীকীর্ত্তনকাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য্য। প্রথমতঃ, কালীকীর্ত্তন প্রাচীনতর পালাকীর্ত্তন গানের নূতন পাঁচালীরূপ। সেকালের পালাকীর্ত্তনের ধরণ বা পদ্ধতিকে ভাঙ্গিয়া প্রসাদ ইহাকে প্রাচীন বা গতানুগতিক পাঁচালীর রূপ হইতে এক ভিন্ন মূর্ত্তিতে গঠন করিয়াছেন। এই নবীন পাঁচালীর নিদর্শন হিসাবে ইহার মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দ্বিতীয়তঃ, কালীকীর্ত্তনের দেবীলীলা ব্রজলীলারই নূতন রূপান্তর; পৃথক্ বিষয়বস্তু ও স্বতন্ত্র ভাবধর্ম্মকে মধ্যযুগীয় একই আঙ্গিকের আধারে ঢালিয়া প্রসাদ কালী ও চণ্ডীমাহাত্ম্যকে এক নূতন রূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্ত্তে প্রসাদ তাঁহার শক্তিদেবীকে দিয়া রাসলীলা, গোষ্ঠলীলা ইত্যাদি যাবতীয় লীলাই সাধন করাইয়াছেন। শক্তিমূর্ত্তির মধ্যে এইরূপ বৈষ্ণবী ভাব ও লীলার সৃষ্টি, বাংলাসাহিত্যে প্রসাদের অভিনব সৃষ্টি এবং এইদিক দিয়া ইহার একটি ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য্য। চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যেও চণ্ডী বা উমারূপিণী শক্তির নানা রূপ ও মাহাত্ম্য বর্ণনা আছে সত্য, কিন্তু সেখানে নানা বিভিন্ন বিষয়বস্তু মাধ্যমেই উমা বা চণ্ডী অথবা কালীর বিভিন্ন জীবনপর্য্যায় চিত্রিত; কিন্তু প্রসাদের এই কালীকীর্ত্তনে উমা বা শক্তির আদ্যোপান্ত বর্ণনের মধ্যে কোনরূপ বিষয়ের উপলক্ষ্য নাই; এই দেবলীলা ব্রজলীলারই হুবহু রূপান্তর। এই রূপান্তরের মধ্যে প্রসাদের ধর্ম্মাদর্শ ও মনোধর্ম্ম যতটা প্রত্যক্ষ, অষ্টাদশ শতকে বৈষ্ণব ও শাক্ত সমাজের পরস্পর সম্বন্ধ, দ্বন্দ্ব ও মিলনের সম্বন্ধও ততটাই প্রত্যক্ষ। যে কীর্ত্তনের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া বৈষ্ণবসমাজ সমস্ত দেশকে ভাববন্যায় ভাসাইতেছিলেন, রামপ্রসাদ তাঁহার দেবীকে এবং তাঁহার জীবনলীলাকে সেই আঙ্গিকের এবং বিষয়বস্তুর কাঠামোর ভিতর ফেলিয়া সেই ভাববন্যাকে অন্য খাতে বহাইবার প্রয়াস হয়তো করিয়াছিলেন, এমন কথা বলিলে বোধহয় অনৈতিহাসিক কিছু বলা হয় না। তাহা ছাড়া, রামপ্রসাদের মনোধর্ম্মের প্রকৃতিও ছিল কতকটা সমন্বয়ধর্ম্মী। মনোধর্ম্মও সক্রিয় ছিল না, এমন বলা যায় না।

বাংলাদেশে তন্ত্রের ধারা—সাধনায় ও সাহিত্যে

প্রসাদের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের স্বরূপ ও প্রকৃতি আলোচনাপ্রসঙ্গে তাঁহার তন্ত্রধর্ম্মগত আদর্শের কিছুটা পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যে তন্ত্রধর্ম্ম প্রসাদী জীবন ও কাব্যের, তাঁহার যাবতীয় ধ্যান ও কল্পনাব মূলসূত্র, রামপ্রসাদের কাব্য বা সঙ্গীতের প্রকৃত পরিচয়প্রসঙ্গে তাহার উৎস ও প্রবাহের সহিত আমাদের পরিচয় অনেকটা অপরিহার্য্য। বাংলাদেশের সকল সাধনপদ্ধতিরই মূলকথা—মানুষই চরম ও পরম সত্য, মানবদেহের মধ্যেই বিশ্বের যাবতীয় সত্য, সকল রহস্য নিহিত। বাংলার বাউল, বাংলার নাথ ও মহাযান ধর্ম্ম, বাংলার তন্ত্র অথবা বৌদ্ধ-সহজিয়া—সর্ব্বত্রই এই একই ধ্যান ও আদর্শ সক্রিয়। এই হিসাবে তান্ত্রিকসাধন এদেশের সকল ধর্ম্ম, সকল সাধনরীতির সহিত অঙ্গাঙ্গী জড়িত, এমন কি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মেরও। নানা দর্শন, নানা মত, নানা পথের মধ্যে মতদ্বৈধ যতই থাকুক না কেন, তন্ত্র-শাস্ত্রোক্ত কায়সাধন সকল মত, পথ ও দর্শনেই স্বীকৃত ও অনুসৃত। বস্তুতঃ, কায়সাধন ও শুদ্ধিসম্বন্ধে শৈব, শাক্ত বা বৈষ্ণব, বৌদ্ধ সহজিয়া বা বৌদ্ধতান্ত্রিক—কাহারও কোথাও দ্বিমত নাই। এজন্য এদেশের অধ্যাত্ম সাধনার মূল কথাই তন্ত্র বা তান্ত্রিক যোগসাধন।[৪]

ইতিহাসের দিক হইতে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম্মের উৎপত্তি যাহাই হউক, ভাব ও তত্ত্বের দিক্ হইতে ইহা সূক্ষ্ম যৌগিক ধর্ম্ম বা তান্ত্রিক যোগসাধন ছাড়া আর কিছুই নহে। এই সহজিয়া যৌগিকসাধনা বা সহজসাধনাই কালক্রমে শৈব বা শাক্ত ধর্ম্মের সঙ্গে যুক্ত হইয়া শৈব শাক্ত তন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাই আবার কালক্রমে বৌদ্ধতন্ত্র বা বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্ম্মের উৎপত্তির মূল। অতএব দেখা যায়, তান্ত্রিক সাধনা বা এই কায়সাধন হিন্দু ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধধর্ম্মের যাবতীয় রূপ ও প্রকৃতির সঙ্গেই ঐকান্তিকভাবে জড়িত।

বাংলাদেশের জীবন ও সাধনার নিগূঢ় রহস্য যেমন তন্ত্রাশ্রয়ী, মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যেও তেমনই এই তন্ত্রধর্ম্ম ও তান্ত্রিক শক্তিপূজার প্রভাব একান্ত প্রবল। কারণ মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্য পুরাপুরিই ধর্ম্মাশ্রয়ী। ধর্ম্মই এ সাহিত্যের আশ্রয়, এবং যেহেতু বাংলার ধর্ম্ম বলিতে মূলতঃ তন্ত্রধর্ম্মকেই বুঝায়, সেইজন্য মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্যের জীবনে এই তন্ত্রধর্ম্ম ও শক্তিপূজার প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

এদেশের সাধনা ও সাহিত্যের, বিশেষ করিয়া মধ্যযুগীয় সাহিত্যের মত, সমগ্র বাংলার জীবনপ্রবাহের ভিতরেই এই তন্ত্রসাধনার ধারা প্রবহমান। বাংলার মধ্যযুগে তন্ত্রধর্ম্ম ও তান্ত্রিক সাধনার প্রসার নানাভাবেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রথমতঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বহুসংখ্যক পীঠস্থানগুলি শক্তিপূজা বা তন্ত্রধর্ম্মের বহু বিস্তৃতি ও প্রসারেরই প্রমাণ।

দ্বিতীয়তঃ, এ দেশের বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান, নাথধর্ম্ম, অবধূতমার্গ, কাপালিক প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় ও জীবনধারার মধ্যে এই শক্তিসাধনা এবং তন্ত্রধর্ম্মের পরিচয়ও সুস্পষ্ট। এমন কি চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব সহজগীতি বা পদাবলীর ভিতরেও এই তন্ত্রসাধনের ধারা প্রবাহিত। বস্তুতঃ, বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠসাধন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং সহজসাধনও মূলতঃ তান্ত্রিক।

তৃতীয়তঃ, এ দেশের মধ্যযুগীয় 'কাম্যমন্ত্রোদ্ধার', 'তন্ত্রসার', মহানির্ব্বাণতন্ত্র' প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্রের পুঁথিও একই সত্যের সমর্থক। এ সকল নিদর্শন ছাড়া, এদেশের কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় পরিব্রাজকাচার্য্য ইত্যাদি তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া রামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত, সকলের জীবনেই এই তন্ত্রধর্ম্ম ও শাস্ত্রের গভীর প্রভাব লক্ষণীয়।

রামপ্রসাদের সাধনপ্রকৃতি

সাহিত্যসাধন ও অধ্যাত্মসাধন উভয় দিক্ হইতেই রামপ্রসাদের সর্ব্বোত্তম সৃষ্টি তাঁহার শাক্তপদাবলী। কালীকীর্ত্তনের খণ্ডিত গানে তাহার প্রথম পরিচয় কুঁড়িরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, পূর্ণ প্রস্ফুটিতরূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাঁহার বিচ্ছিন্ন অসংখ্য গীতধর্ম্মী রচনাবলীতে। ইহারা যেন তাঁহার মানসপদ্মের সহস্রদল। রামপ্রসাদের প্রতিভা ইহাদের মধ্যে প্রতিবিম্বিত।

এ তথ্য সর্ব্বজনবিদিত যে, রামপ্রসাদের এই গানগুলি তাঁহার সাহিত্য-মানসের প্রকাশ নয়, একান্তই অধ্যাত্ম ধ্যান, সাধন ও উপলব্ধির আনন্দবেদনাময় স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ। এই গান তাঁহার অধ্যাত্মসাধনার অঙ্গ, ধ্যানযোগের ছন্দ, কাজেই সাহিত্য বা সাহিত্যমানসের দিক্ হইতে ইহারা বিচার্য্য নহে। এ তথ্যের যুক্তি অনস্বীকার্য্য। তবু একথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিতে হয় যে, মানুষের গভীরতর ধ্যান ও কল্পনা যেখানে গানের সুরে ও ছন্দে ব্যক্ত হইয়াছে,

সেখানে তাহার সাহিত্যমূল্যও তুচ্ছ করিবার মতন নহে। কারণ সেই ধ্যান ও কল্পনা সুর ও ছন্দই তো শ্রোতার সঙ্গে সহিতবোধ জন্মায় এবং তাহারই বলে শ্রোতা চিত্তের মধ্যে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব রস উপভোগ করে এবং তাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়।

এই মাত্র বলিলাম, রামপ্রসাদের এই গানগুলি অধ্যাত্মসাধনার আনন্দ-বেদনাময় উপলব্ধির স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ। এই অধ্যাত্মসাধনার মূলে আছে, কোন একটি বিশেষ অধ্যাত্মধ্যান ও চিন্তার রূপ ও রহস্য এবং এই ধ্যান, চিন্তা ও কল্পনার রূপ ও রহস্য একান্তই তন্ত্রাশ্রিত। রামপ্রসাদের অসংখ্য গানে যে ভাষায়, যে যোগরূঢ় শব্দাবলীতে তাঁহার ধ্যান ও কল্পনা প্রকাশ পাইয়াছে, সে ভাষা ও শব্দ, সে ধ্যান ও কল্পনা, সমস্তই শাক্ত ও শৈব-তন্ত্রের নিগূঢ় রূপ ও রহস্যের মধ্যে বিধৃত। তন্ত্রোক্ত শক্তিকে মাতৃরূপে পরিকল্পনার মধ্যে, বিভিন্ন গানে, সাধনার বিচিত্র স্তরের পরিচয়ের মধ্যে মানবদেহকে সমস্ত সুপ্ত শক্তির আধার এবং সেই সুপ্ত শক্তিকে জাগাইবার মধ্যেই আধ্যাত্মিক সাধনার বিস্তার ও লক্ষ্য—ইত্যাদি পরিচয়ের মধ্যে রামপ্রসাদের তান্ত্রিক মানস একান্ত সুস্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িতেছে। এই তান্ত্রিক মানসের মধ্যে মধ্যযুগীয় বাংলার চণ্ডী, অন্নদা, কালিকা, ইত্যাদি দেবীর রূপ, কল্পনা ও ধ্যান, জনমানসে শক্তিপূজা ও শক্তিসাধনার যে লোকায়ত রূপান্তর, তাহাও উত্তরাধিকার সূত্রে ধরা দিয়াছে। রামপ্রসাদের অধ্যাত্মধ্যানে সেইহেতু একই সঙ্গে শাস্ত্রোক্ত তান্ত্রিক ধ্যান ও কল্পনা এবং লোকায়ত শক্তিধর্ম্মের ধ্যান ও কল্পনা উভয়ই সমভাবে বিধৃত।

অতএব বাংলার তন্ত্রোক্ত অধ্যাত্মসাধনা এবং লোকায়ত শক্তিসাধনার কিছুটা পরিচয় এক্ষেত্রে অপরিহার্য্য।

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় তন্ত্রেরই মূলকথা—কায়সাধন। এই ভৌতিক কায় মৃত বা শব, কিন্তু তাহারই অভ্যন্তরে যে শক্তির বাস, তিনি জীবন্ত, তিনিই প্রাণ, তিনিই চৈতন্য। মানুষ কায়রূপ শবকে আপন শক্তিবলে চালনা করিয়া, নিয়ন্ত্রিত করিয়া, নিয়মিত করিয়া, কুণ্ডলাকারে সুপ্তশক্তিকে জাগাইয়া উর্দ্ধগামী করিতে পারে। এই শক্তি জাগানই জীবন ও সাধনার চরম লক্ষ্য। এই শক্তি জাগিলে শব শিবে রূপান্তরিত হন এবং তখনই শিব ও শক্তির পূর্ণ-মিলন ঘটে। সুপ্তি হইতে পূর্ণজাগরণের মধ্যে বিভিন্ন স্তরপর্য্যায়, প্রত্যেকটি

স্তরের বিভিন্ন রহস্য, সাধনপদ্ধতির বিভিন্ন ক্রম, এই সব বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন ক্রমের, বিভিন্ন সন্ধির, বিভিন্ন যোগরূঢ় নাম। রামপ্রসাদের গানের অসংখ্য স্থানেই এই কায়সাধনের ধ্যান ও কল্পনা, সাধনোপায়ের বিচিত্র স্তর ও ক্রম, ইহাদের নানা ইঙ্গিত, বিচিত্র উপমা ও ব্যঞ্জনায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ইহাদের গূঢ় অর্থ না জানিলে এই সব গানের অধ্যাত্মরস বা সাহিত্যরস কোনটিই পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না।

'আমার মনে বাসনা জননি।
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে, হ, ল, ক্ষ, ব্রহ্মরূপিণী॥
মূলে পৃথ্বী ব, স, অন্তে চারি পত্রে মায়া ডাকিনী।
সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে শিরে ঘেরে কুণ্ডলিনী॥'[৫]
... ... —ইত্যাদি

'কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী তারা তুমি আছ গো অন্তরে,
মা আছ গো অন্তরে
এক স্থান মূলাধার, আর স্থান সহস্রার,
আর স্থান চিন্তামণি পুরে।'[৬]
... ... —ইত্যাদি

এই সব উদ্ধৃতির মধ্যে যে ধ্যান ও কল্পনা বিধৃত, যে ভাষা, শব্দ, উপমা ও ব্যঞ্জনা প্রকাশিত, রামপ্রসাদ তাহা সমস্তই আহরণ করিয়াছেন, শাস্ত্রোক্ত তন্ত্রধর্ম্মের সাধনা হইতে, এবং গুহ্যতান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে যাঁহার পরিচয় নাই, তাঁহার পক্ষে এই সব গানের গূঢ় রহস্য সুস্পষ্ট অনুধাবন করা কষ্টকর। কিছুদিন আগে পর্য্যন্তও এই সব যোগরূঢ় শব্দ, নানা উপমা ও ব্যঞ্জনা একান্ত সাধারণ লোকের কাছেও যতটা সহজে বোধগম্য ছিল, যত সহজে এই সব শব্দ ইত্যাদি তাহারা ব্যবহার করিত, আজ আর তাহা নাই। অথচ একথা অস্বীকার করা যায় না যে, অষ্টাদশ শতকের এবং উনবিংশ শতকের প্রথম, দ্বিতীয় পাদ পর্য্যন্তও তন্ত্রাশ্রিত বাঙালীমানসে তন্ত্রের সাঙ্কেতিক ভাষা, যোগরূঢ় শব্দ, উপমা ও ব্যঞ্জনা ইত্যাদি বহুল এবং সহজ প্রচলিত ছিল। তাহা নহিলে রামপ্রসাদের এই সব গান এত জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারিত না। তাহা ছাড়া তান্ত্রিক সাধনাপদ্ধতির প্রসারও যে যথেষ্টই ছিল, তাহার সাক্ষ্যও অপ্রতুল নহে—তাহা বাঙ্গালীর শাক্তধর্ম্মেই হউক, বা বৈষ্ণবধর্ম্মেই হউক। বৈষ্ণব সহজ সাধনার

কেন্দ্র রাঢ়দেশের তান্ত্রিক পীঠস্থানগুলির দিকে তাকাইলে এ কথার সত্যতা অস্বীকার করা যায় না।

তন্ত্রের গূঢ়তম রহস্য হইতেছে, নারীরূপিণী শক্তির উদ্বোধন। এই শক্তিই তান্ত্রিকের একমাত্র আরাধ্যা দেবী। এই শক্তিরূপিণী দেবীই কখনও কল্যাণময়ী আপন জায়া, কখনও ভৈরবীরূপিণী পরনারী, কখনও গৌরীরূপিণী কন্যা, কখনও নারায়ণীরূপিণী জননী। বিভিন্ন সাধক গুরু নির্দ্ধারিত আপন 'কুল' অনুযায়ী বিভিন্নরূপে এই শক্তির সাধনা করেন। রামপ্রসাদ এই শক্তিরূপিণীর সাধনা করিয়াছেন, জননীরূপে। কুণ্ডলিনী শক্তিই তাঁহার মাতা এবং মা—মা বলিয়া ডাকিয়াই তিনি তাঁহাকে জাগাইতে প্রয়াস করিয়াছেন। রামপ্রসাদের শক্তি-সাধনা জননী-সাধনা। তাঁহার এই মাতৃকা সাধনের মূল উপাদান শিশুসন্তানের অকপট ভক্তি ও ভালবাসা, জীবনের নানা দুঃখ ও বেদনা, নানা অতৃপ্তি, অস্বস্তি ও অপূর্ণতার জন্য দুরন্ত দাবী অথবা আকুল ক্রন্দন। জননীর বাৎসল্যরস ও সন্তানের জননী আকর্ষণ, এই দুই বস্তুই রামপ্রসাদের গানের পরম আকর্ষণ এবং এই আকর্ষণে টানিয়াই রামপ্রসাদ বাঙ্গালীর মন ভুলাইয়াছেন, প্রাণ কাঁদাইয়াছেন।

বাঙালীর এই মাতৃকাসাধনের ইতিহাস প্রাচীন, এবং রামপ্রসাদ যে শক্তি-রূপিণীকে জননী বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন, এই তথ্যের মধ্যে বাঙালীর ঐতিহ্যইঙ্গিত অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। বাঙালীর ইতিহাসের আদিপর্ব্বেই দেখিতেছি, দেবতাদের চেয়ে দেবীদের সমাদর ও প্রতিষ্ঠা বেশী এবং নারীকে শক্তিস্বরূপিণী বলিয়া দেখা ও ভাবা, সৃষ্টিরহস্যের মূল বলিয়া কল্পনা করা, যেন বাঙালীর স্বধর্ম্ম, এ ইঙ্গিতও সুস্পষ্ট। এই ধ্যান-কল্পনা আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজের দান, সন্দেহ নাই; আর্য্যব্রাহ্মণ্য পুরুষ-প্রকৃতির ধ্যান সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর সেই আদিম মাতৃকাতন্ত্রের দেবীরা প্রকৃতি, বা শক্তিরূপিণী নারীকে জননীরূপে কল্পনা, এ ইঙ্গিতও যেন আদিপর্ব্বেই ধরা পড়িয়াছিল। দশম হইতে দ্বাদশ শতকের প্রস্তর শিল্পসাক্ষ্যে তাহা কতকটা সুস্পষ্ট। কিন্তু মধ্যযুগেই এই ধ্যান-কল্পনা বাঙালীর চিত্তকে আরও গভীরভাবে আশ্রয় করে।

কৃষ্ণের বাল্যলীলার মধ্যে, উমার অন্নপূর্ণা রূপের মধ্যে, চৈতন্যের বাল্যলীলার মধ্যে, বাঙালীর চিত্তের প্রসার ও আবেগময়তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বাঙালীর আগমনী ও বিজয়া গানের মধ্যেও এই একই ইঙ্গিত। রামপ্রসাদ তাঁহার

তন্ত্রোক্ত শক্তিসাধনায় এই ইঙ্গিতকেই আশ্রয় করিবেন, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। এই মাতৃকাপূজা ও সাধনেরই ইঙ্গিত মধ্যযুগীয় মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলিতেও; সেখানেও মনসা এবং চণ্ডী বা অন্নদা বা দুর্গা, সকলেই শক্তিরূপিণী জননীরূপে কল্পিতা। তবে শেষোক্ত কাব্যগুলিতে রামপ্রসাদসুলভ ভাবগভীরতার এবং ভাবাবেগের স্পর্শ বিরল। তাহার কারণ, এই কাব্যগুলি বিষয়াশ্রিত কাহিনী-কাব্য, আর রামপ্রসাদের পদাবলী ভক্তিরসাশ্রিত, ভাবাবেগসমৃদ্ধ অধ্যাত্মজীবনের বেদনানন্দময় উপলব্ধির গান।

রামপ্রসাদ যে ভাবরস ও ইন্দ্রিয়াবেগকেই একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহার কারণও বাঙালীর ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত।

'প্রাচীন বাঙালীর হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতার ইঙ্গিত তাহার প্রতিমাশিল্পে এবং দেবদেবীর রূপকল্পনায় ধরা পড়িয়াছে। মধ্যযুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে, সহজিয়া সাধনায়, বাউলদের সাধনায় যে বিশুদ্ধ ভক্তিরস ও হৃদয়াবেগের প্রসার, তাহার সূচনা দেখা গিয়াছিল আদি পর্ব্বেই এবং তাহা শুধু বৌদ্ধ বজ্রযানী সহজ-যানীদের মধ্যেই নয়, তান্ত্রিক শক্তিসাধনার মধ্যেই নয়, বৈষ্ণবসাধনায়ও বটে। এই হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতা যে বহুলাংশে আদিম নরগোষ্ঠীর দান, তাহা আজিকার সাঁওতাল, শবর, প্রভৃতিদের জীবনযাত্রা, পূজানুষ্ঠান, সামাজিক আচার, স্বপ্নকল্পনা, ভয়-ভাবনার দিকে তাকাইলে আর সন্দেহ থাকে না। আর্য্য-ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ ও জৈন সাধনাদর্শে কিন্তু এই ঐকান্তিক হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালু-তার এতটা স্থান নাই। সেখানে ইন্দ্রিয়ভাবনা বস্তুসম্পর্ক-বিচ্যুত, ভক্তি জ্ঞানানুগ, হৃদয়াবেগ বুদ্ধির অধীন। বস্তুতঃ, বাংলার অধ্যাত্মসাধনার তীব্র আবেগ ও প্রাণবস্তুগতি সনাতন আর্য্যধর্ম্মে অনুপস্থিত। এই হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতা প্রাচীন বাঙালী জীবনের অন্যদিকেও ধরা পড়িয়াছে। মধ্যযুগে দেখিতেছি, দেবই হউন আর দেবীই হউন, বাঙালী যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছে, তাঁহাদের মর্ত্ত্যের ধূলায় নামাইয়া পরিবারবন্ধনের মধ্যে বাঁধিতে এবং ইহগত সংসার-কল্পনার মধ্যে জড়াইতে, হৃদয়াবেগের মধ্যে তাঁহাদের পাইতে ও ভোগ করিতে, দূরে রাখিয়া শুধু পূজা নিবেদন করিতে নয়। এই কামনার সূচনা আদি পর্ব্বেই দেখা যাইতেছে। ষষ্ঠী, মনসা, হারীতী, কৃষ্ণ-যশোদা প্রভৃতির রূপকল্পনায়ই যে এই ভাবনা অভিব্যক্ত তাহাই নয়; কার্ত্তিকের শিশুলীলা-বর্ণনা, পিতা শিবের বেশভূষা অনুকরণ করিয়া শিশু কার্ত্তিকের

কৌতুক, দরিদ্র শিবের গৃহস্থালির বর্ণনা, নেশাগ্রস্ত শিবের সংসারে উমার দুঃখ এবং জামাতা ও কন্যারূপে শিব ও গৌরীকে সমস্ত হৃদয়াবেগ দিয়া আপন করিয়া বাঁধা, সপরিবারে বিষ্ণু ও শিবকে প্রত্যক্ষ করা প্রভৃতির মধ্যেও একই ভাবনা সক্রিয়।[৭]

এই রস ও ভাবাবেগ সম্বন্ধে রামপ্রসাদ কিছু সচেতন ছিলেন না এমন নয়। বুদ্ধি নয়, যুক্তি নয়, জ্ঞান নয়, গ্রন্থলব্ধ পাণ্ডিত্য নয়, রস ও আবেগ—ইহাই ছিল তাঁহার অধ্যাত্ম-সাহিত্য-সাধনার মূল কথা। পাণ্ডিত্য তুচ্ছ, গ্রন্থ তুচ্ছতর, ভাব ও রসই প্রধান। যখন তিনি বিদ্যাসুন্দর কাহিনী রচনায় ব্যাপৃত, জীবন ও সাধনার সেই আদি পর্ব্বেই তিনি বলিতেছেন,

'গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি, গানে হব মত্ত' [৮]

এই ধ্যানই তাঁহার জীবনে গভীর হইতে গভীরতর হইয়াছে।

'এবার আমি সার ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি॥
যে দেশে রজনী নাই মা, সে দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি॥' [৯]

'মন কি কর তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে॥
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত
অভাবে কি ধর্ত্তে পারে।
মন শশী-অগ্রে বশীভূত,
কর তোমার শক্তিসারে।
ওরে কোঠার ভিতরে চোর কুঠারী
ভোর হ'লে সে লুকাবে রে॥ [১০]

বলিয়াছি, চণ্ডী, অন্নদা, কালিকা ইহারা সকলেই মাতৃকাতন্ত্রের দেবী এবং শক্তিরূপিণী নারীশক্তির প্রতীক এবং মূলতঃ ইহারা একই ধ্যান—কল্পনার মধ্যে বিধৃত। এই ধ্যান-কল্পনার মধ্যে অনার্য্য প্রজননশক্তির ধ্যান এবং আর্য্য ব্রাহ্মণ্য পুরুষ-প্রকৃতির ধ্যান উভয়ই সমান সক্রিয়। মধ্যযুগীয় বাংলার লোকায়ত মানসে চণ্ডী, কালিকা, অন্নদা প্রভৃতি শক্তিরূপিণী দেবী গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, ইহাদের রূপ ও প্রকৃতি সমসাময়িক সমাজ মানস ও প্রকৃতির

পরিবর্ত্তন অনুযায়ী কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের হাতে এবং বিভিন্ন কালস্তরে ইহাদের যত পরিবর্ত্তন বিবর্ত্তনই ঘটুক না কেন, মধ্যযুগীয় মঙ্গল কাব্যগুলিতে সকল মাতৃকাতন্ত্রের দেবীরই প্রকৃতি ও ধর্ম্মের মধ্যে জীবন ও আদর্শের একটা গতানুগতিকতা আছে; সর্ব্বত্রই ইহাদের রূপ, শক্তিময়ী জননীর রূপ, সন্দেহ নাই, কিন্তু সর্ব্বত্র ইঁহারা স্নেহময়ী কল্যাণময়ী জননী নহেন। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যগুলিতে চণ্ডীই হউন আর মনসাই হউন, সকলেই সর্ব্বত্র এক বিশিষ্টরূপে ও ধরণে আবির্ভূত, এবং ছলে, বলে বা কৌশলে বা ভয়ভীতি প্রদর্শন করিয়া, পুরুষের পৌরুষকে দমন ও দলন করিয়া, আপন আপন মহিমা প্রতিষ্ঠাই যেন ইঁহাদের সকলেরই লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যেই ইঁহারা সকলে বদ্ধপরিকর। যতক্ষণ পৌরুষ বশ না মানিতেছে, ততক্ষণ করুণার দাক্ষিণ্য বিতরিত হইতেছে না। পৌরুষ দমনই যেন দৈবনির্ভরতার একমাত্র উপায়। সমসাময়িক সমাজমন, কখনও কখনও বিচিত্র বিপর্য্যয়, বিচিত্র অবস্থার মধ্যে পড়িয়া একই দেবীর বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতি কল্পনা করিয়াছে, এবং বিভিন্ন উপায়ে তাহার তুষ্টিসাধনে তৎপর হইয়াছে। একই চণ্ডী, কখনও শ্মশানচণ্ডী, কখনও উগ্রচণ্ডী ও উড়ানচণ্ডী, কলুইচণ্ডী ও ওলাইচণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী ও শুভচণ্ডী—ইত্যাদি রূপ পরিগ্রহ করিয়া মানুষের ভয়-মিশ্রিত ভক্তি ও পূজা আদায় করিয়াছেন। একই কালিকা কখনও শ্মশানকালী, কখনও রক্ষাকালী, কখনও দক্ষিণাকালী, কখনও উন্মত্তকালী। কালক্রমে এই সব লৌকিক দেবতার উপর আর্য্য-ব্রাহ্মণ্য প্রভাবও পড়িয়াছিল এবং তাহার ফলে ইঁহাদের লোকায়ত গ্রাম্য রূপ ও প্রকৃতির উপর পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য স্পর্শও কিছু লাগিয়াছিল। স্পর্শও যেমন লাগিয়াছিল, তেমনই ইহাদের উপর তান্ত্রিক প্রভাবও কম গভীর হইয়া লাগে নাই। বস্তুতঃ, বিভিন্ন রূপিণী চণ্ডী ও কালী এবং মহাযান, বজ্রযান প্রভৃতি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের শক্তিরূপিণী তারা, তান্ত্রিকেরও উপাস্যা দেবী। আরও গভীরভাবে বলিতে গেলে, বৌদ্ধতন্ত্রের তারা এবং ব্রাহ্মণতন্ত্রের চণ্ডী, কালিকা বা অন্নদা, যথার্থ তান্ত্রিকের দৃষ্টিতে, ইহাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নাই। তারা ও দুর্গার ভেদাভেদ বাঙালীর ইতিহাসের আদি পর্ব্বের শেষ পর্য্যায়েই ঘুচিয়া গিয়াছিল।[১১] লোকায়তস্তরে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কিছু ছিল না। তারা তারা তারা বলিতে রামপ্রসাদের দু'নয়ন বাহিয়া ধারা পড়িত।

কিন্তু লোকায়তস্তরের এই মাতৃকাসাধন এবং রামপ্রসাদের মাতৃকাসাধনের মধ্যে একটা গভীর পার্থক্য ছিল। (রামপ্রসাদের শক্তিরূপিণী দেবীর রূপ ও প্রকৃতির মধ্যে গতানুগতিক চণ্ডী অন্নদা বা কালিকার স্পর্শ কিছু নাই। রামপ্রসাদের তারা বা কালিকা ভয় দেখাইয়া মানুষকে বিপর্য্যয়ের চক্রে পেষণ করিয়া পূজা আদায় করেন না। রামপ্রসাদের শক্তিস্বরূপিণী মাতৃকাদেবী বাঙালীর স্নেহময়ী জননী। এই জননীর কাছে পুরুষের পৌরুষ, নারীর নারীত্ব লাঞ্ছিত ও অবমানিত নয়, তাঁহার মাতার রূপ করুণাময়ী, অন্নপূর্ণার রূপ—বাৎসল্য, মায়া ও মমতাময়ী জননীর রূপ এবং সেই রূপের চরণে রামপ্রসাদ আত্মনিবেদিত, ভয়ে নহে, ভালবাসায়, পূজায় নহে, প্রেমে। রামপ্রসাদও বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, কিন্তু সে বিদ্রোহ মায়ের কাছে সন্তানের বিদ্রোহ। তিনিও ভয়ে ভীত হইয়াছেন এবং মায়ের দেওয়া দুঃখ বহন করিয়াছেন, কিন্তু যে জননীর কোলে বসিয়া আছে, তাহার ভয় বা দুঃখ তো ক্ষণকালের। তিনি কি ভয়ে ভীত হন, না দুঃখকে ডরান?

'এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর খাস তালুকে বসত করি॥
নাইকো জরিপ জমাবন্দি, তালুক হয়না লাটে বন্দি মা।
আমি ভেবে কিছু পাইনে সন্ধি, শিব হয়েছেন কর্ম্মচারী॥'[১২]
—ইত্যাদি

যেহেতু তিনি জননীকে ভালবাসিয়াছেন, সেইহেতু মাকে নিন্দাও করিয়াছেন, তিরস্কারও করিয়াছেন। কারণ, এ অধিকার তো সন্তানেরই। পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতকে যে চণ্ডী, কালিকা, অন্নদা, জননী হইয়াও দূরে দাঁড়াইয়া দেবীর দৈবী রূপ লইয়া ভীত, সন্ত্রস্ত, বিপর্য্যস্ত মানুষের পূজা আদায় করিয়াছেন, রামপ্রসাদের কালে তাঁহার ভাবদৃষ্টিতে সেই দেবীই বাঙালীর মাটির ঘরের মাটির রূপ লইয়া জননীরূপে সন্তানকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। এইখানেই রামপ্রসাদের গানের একান্ত মানবিক আবেদন।)

(রামপ্রসাদের জীবনদর্শন প্রত্যক্ষভাবেই এই সাধনপ্রকৃতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মা ব্রহ্মময়ী, তারা ইত্যাদি সমস্তই তাঁহার জননীসাধনের সাধনগ্রাহ্যরূপ এবং এইরূপ একান্তভাবেই তান্ত্রিক সাধনোপায়-আশ্রয়ী। মায়ের নাম জপ করিয়াই তিনি জপসিদ্ধ হইতে চাহিয়াছিলেন এবং জাগতিক সমস্ত সুখ-

দুঃখের, বেদনা ও আনন্দের ঊর্দ্ধে উঠিয়া সকলকে আহ্বান করিয়াছিলেন সেই আদর্শে।

'তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন, ওরে আমার শুয়া পাখী।
আমারি অন্তরে থেকে, আমাকে দিতেছ ফাঁকি॥
কালীনাম জপিবার তরে, তোরে রেখেছি পিঞ্জরে পুরে।
মন ও তুই আমাকে বঞ্চনা করে, ঐরি সুখে হইলে সুখী॥
শিব দুর্গা কালীনাম, জপ কর অবিশ্রাম মন,
ও তোর জুড়াবে তাপিত অঙ্গ, একবার শ্যামা বলরে দেখি॥' ১৩

এই যে একান্ত নাম জপ এবং সংসারের কেন্দ্রে বসিয়া দেহকে আশ্রয় করিয়াই দেহাতীত হওয়া, নিত্য সংসারের অনিত্যতার ঊর্দ্ধে উত্তীর্ণ হওয়া, নানা তাপ ও গ্লানির মধ্যে বাস করিয়াও জীবনকে সমস্ত অভাব-অভিযোগ তাপগ্লানিকে স্পর্শ করিতে না দেওয়া এই ধ্যান-কল্পনা একান্তই কায়-সাধনের, উল্টাসাধনের ধ্যান কল্পনা; জগৎ সংসার হইতে বিচ্যুত হইয়া নয়, তাহারই কেন্দ্রে বাস করিয়া তাহার অতীত হওয়া, জলের মধ্যে বাস করিয়া গায় জল লাগিতে না দেওয়া, ইহাই ছিল রামপ্রসাদের জীবনদর্শন। এবং এই জীবনদর্শন উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি পাইয়াছিলেন তান্ত্রিক সাধনের পথ আশ্রয় করিয়া। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে, বৌদ্ধ সহজ সাধনে, গৌড়ীয় সহজিয়াসাধনে বাংলার নাথ ধর্ম্ম ইত্যাদিতে সর্ব্বত্রই এই একই মূল রহস্য।

কায়সাধন ও নাম জপ করিতে করিতে মন এক স্থির, অবিচল, আত্মনিষ্ঠ সহজ আনন্দের স্তরে উন্নীত হয়, যেখানে পাপপুণ্যের, শুচি-অশুচির সুখদুঃখের ভেদাভেদ ঘুচিয়া যায়, জাগতিক সুখদুঃখ, জাগতিক অভাব-অভিযোগ তাহাকে আর বিচলিত করে না। এই সাধনোপলব্ধির মধ্যে বৈরাগ্য নাই, তাহা নয়, কিন্তু এই বৈরাগ্য সুখ ও বিষয়ভোগকে অস্বীকার করিয়া নয়, অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে যে মুক্তি, অসংখ্য আসক্তির মধ্যে নিরাসক্ত মনের যে বৈরাগ্য, সেই বৈরাগ্যই প্রসাদের বৈরাগ্য, এবং অসংখ্য গানে রামপ্রসাদ যে বৈরাগ্যের ইঙ্গিত করিতেছেন, তাহাও এই অস্তিধর্ম্মী বৈরাগ্য, বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের নেতিমূলক বৈরাগ্য নয়। তিনি চিনি হইতে চাহেন নাই, চিনি খাইতে ভালবাসিতেন, নির্ব্বাণ লাভ করিতে চাহেন নাই, বলিয়াছেন, 'নির্ব্বাণে কি আছে ফল'। মাটির মূর্ত্তি গড়িয়া তাহার পূজা, ইহাও তাঁহার রুচিকর ছিল না, তিনি

জানিতেন, সমস্ত ত্রিভুবন জুড়িয়াই তো মায়ের মূর্ত্তি, সেই ত্রিভুবনের রূপরসের মধ্যেই তিনি ডুবিয়াছিলেন। শুচি এবং অশুচির সংস্কার তাঁহার ছিল না। আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের কোন আচার-ব্যবহার রীতিনিয়মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না।

'ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি মন তা জান না।
মাটির মূর্ত্তি গড়িয়ে মন তাঁর কর্ত্তে চাওরে উপাসনা॥
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা দিয়ে কত রত্ন সোনা।
ওরে কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁরে দিয়ে ছার ডাকের গহনা॥' [১৪]

—ইত্যাদি

এই ধরণের ধ্যানাদর্শের কথা বাংলাদেশে আমরা শুনিতেছি, একাদশ-দ্বাদশ শতক হইতে, এবং তাহার প্রথম পরিচয় পাইতেছি বৌদ্ধ সাধকদের মধ্যে, পরে মধ্যযুগে নাথপন্থী, বৈষ্ণব সহজিয়াপন্থী, সকলের মধ্যে সেই পরিচয় ক্রমশঃ আরও গাঢ়, আরও নিবিড় হইয়াছে; উত্তর ভারতের মধ্যযুগীয় সন্ত কবি, কবীর, নানক, রজ্জব, দাদু, রুহিদাস ইত্যাদি সকলের মধ্যেই সেই একই ধ্যানাদর্শ।

এই ধ্যানাদর্শের মধ্যে নিরাসক্ত মনে স্থিতকেন্দ্র হইয়াই রামপ্রসাদ দুঃখ, ভয় ও মৃত্যুর উর্দ্ধে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। জাগতিক দুঃখকে তিনি এড়াইতে চেষ্টা করেন নাই, সেই দুঃখের সম্মুখে দাঁড়াইয়াই স্পর্দ্ধিত দর্পে বলিয়াছিলেন,—

'আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
তবে দেও কত দুঃখ মা আমি তা দেখতে চাই॥' [১৫]

... ... —ইত্যাদি

'ওরে শমন কি ভয় দেখাও মিছে।
তুমি যে পদে ও পদ পেয়েছ, সে মোরে অভয় দিয়েছে॥', [১৬]

ইত্যাদি

মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন,—

'দূর হয়ে যা যমের ভটা।
ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা॥
বলগে যা তোর যমরাজারে, আমার মতন নেছে কটা।' [১৭]

—ইত্যাদি

ভারতীয় সাধনপদ্ধতিতে এই জীবনদর্শনের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এবং তাহার সাধনোপায়ও বিশিষ্ট। বাংলাদেশের লোকায়ত ধর্ম্মে এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মেরও বিশেষ বিশেষ আদর্শে ও পন্থায় এই জীবনদর্শন ও সাধনোপায়ের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। রামপ্রসাদ সেই সাধনা ও জীবনদর্শনের ধারাই বহন করিয়াছেন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহার উত্তরসাধক রামকৃষ্ণের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন।

প্রসাদী আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীত

মাতৃকাতন্ত্র ও তাহাকে অবলম্বন করিয়া রামপ্রসাদের জননীসাধনের কথা আগেই বলিয়াছি। এই জননীসাধনাকে আশ্রয় করিয়া একটি পৌরাণিক কাহিনী মধ্যযুগীয় বাংলাদেশে এক অপরূপ জীবন ও সাহিত্যের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। দক্ষজায়া মেনকা ও কন্যা গৌরীর যে কাহিনী ভারতে পুরাণে বিধৃত, সেই কাহিনীর মধ্যে বাংলাদেশের দৈনন্দিন পারিবারিক জীবন এক অতি নিবিড় মাধুর্য্য-বেদনাময় নূতন অর্থসন্ধান দান করিয়াছে। দারিদ্র্যপীড়িত সংসারে একান্ত গৃহকেন্দ্রিক, সন্তানকেন্দ্রিক, বাৎসল্যময় জীবনে, আত্মভোলা সংসারানাসক্ত স্বামীর সংসারে কন্যার যে দুঃখ, মাতৃহৃদয়কে সকরুণ বেদনায় ভারাতুর করিয়া রাখে, সমস্ত বৎসরের মধ্যে কয়েকটি উৎসবমুখর দিনে সেই কন্যাকে মাতৃহৃদয়ের একান্ত নিকটে পাওয়ার আশা, উদ্বেগ ও আনন্দ এবং কয়েকদিন পরে তাহাকে বিদায় দিবার যে দুঃখ মাতৃহৃদয়কে উদ্বেলিত করে, এই পরমবেদনাময় কাতরতা, গভীর উদ্বেগময় আকুলতা, বাংলাদেশের নিম্ন, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র, কৃষিনির্ভর গ্রাম্যজীবনে একান্ত পরিচিত। এই বেদনা ও আনন্দের মধ্যে জীবন ও সাহিত্যে একটি গভীর রস-মাধুর্য্য যে নিহিত, একথা বাংলাদেশ আদিপর্ব্বের শেষ অধ্যায়েই জানিতে আরম্ভ করিয়াছিল; সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থের দুই একটি বিক্ষিপ্ত শ্লোকে তাহার প্রথম পরিচয় আমরা পাইতেছি; কিন্তু ইহার পূর্ণ পরিচয় ব্যক্ত হইয়াছে, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের আগমনী ও বিজয়া গানে; এবং নিগূঢ় ভাষা ও ভাবরূপ লাভ করিয়াছে প্রসাদের এই পর্য্যায়ের সঙ্গীতগুলিতে।

'আজ শুভ নিশি পোহাইল তোমার,
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে।
মুখশশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখরাশি,
ও চাঁদ মুখের হাসি, সুধারাশি ক্ষরে॥'

—ইত্যাদি।[১৮]

সমসাময়িক বাংলার গার্হস্থ্য ও সমাজজীবনের যে সকরুণ চিত্র এই গানগুলির মধ্যে ধরা দিয়াছে, সেই চিত্রই রামপ্রসাদকে অনেকাংশে আমাদের চিত্তের নিকটতর করিয়াছে। যে নারী ও মাতৃহৃদয়ের বিরহব্যথা ও ক্ষোভ বাংলার সমাজজীবনে চির অনাদৃত ও উপেক্ষিত, প্রসাদ সেই অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত মাতৃ-হৃদয়ের সকরুণ বেদনাকে আমাদের কাছে বহন করিয়া আনিয়াছেন ; তাই অন্যান্য কারণ ছাড়াও বাংলার নারীর এই মাতৃত্বের বেদনা ও বাৎসল্যমহিমা কীর্ত্তনের জন্যই আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতগুলি বাঙালীর পরম মাধুর্য্যের ধন হইয়া আছে আজও।

আগমনী ও বিজয়া গানের এই সামাজিক ও সাহিত্য মূল্য ছাড়া ইহাদের অধ্যাত্মসাধন মূল্যও তুচ্ছ করিবার মত নয়। বিশ্বজননীকে কন্যারূপে কল্পনা ও আরাধনা ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার অন্যতম আশ্রয় এবং এই সাধনাকে আশ্রয় করিয়াই মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্য অপূর্ব্ব অধ্যাত্মরূপ লাভ করিয়াছে। এই কল্পনা ও ধ্যানই বাঙালী প্রত্যক্ষ করিয়াছে, যশোদা-শ্রীকৃষ্ণের লীলার মধ্যে, শচী ও গোরাচাঁদের লীলার মধ্যে এবং মেনকা ও উমার কাহিনীর মধ্যে। অধ্যাত্ম-সাধনার গূঢ়রসকে দৈনন্দিন জীবনে এই ধরণের রূপান্তর বিরল।

রামপ্রসাদের আগমনী ও বিজয়াসঙ্গীতের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ইহাদের সহজ, সরল, অকপট প্রাণবন্ত ভাষা, এবং এই ভাষারূপের সঙ্গে বাঙালীর দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনের পরিচয় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

> 'গিরি এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
> বলে বলবে লোকে মন্দ কারো কথা শুনবো না॥
> যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়।
> এবার মায়ে ঝিয়ে করবো ঝগড়া জামাই বলে মানবো না'॥
> —ইত্যাদি।[১৯]

এই জাতীয় গানের ভাষার সকরুণ ইঙ্গিত, ইহার অনাবিল আবেগ এবং ইহাদের একান্ত ঘরোয়া সুরের মধ্যে করুণ মাধুর্য্যের ব্যাপ্তি বাঙালীর ভাবমুগ্ধ চিত্তকে একমুহূর্ত্তে জীবনের গভীরতার মধ্যে টানিয়া লয়।

শাক্তসঙ্গীত

যে গুণ ও আকর্ষণ প্রসাদের আগমনী ও বিজয়াসঙ্গীতে, তাহাই প্রসাদী শাক্তসঙ্গীতেরও অপূর্ব্ব সম্পদ। ভাব, ভাষা ও সুরের এইরূপ ঘনিষ্ঠ দৈনন্দিন

জীবনসুলভ আবেদন, অলঙ্কারধর্ম্মী নাগর সাহিত্যের মধ্যে থাকিবার কথা নয়। নিগূঢ় অধ্যাত্মসাধনার ইঙ্গিতকে, ভাবগভীরতার ঐশ্বর্য্যকে এমন সহজ ঔদার্যময় সারল্যে, এমন আনন্দ—বেদনাময় ব্যাপ্তিতে ব্যক্ত করা, ইহা যে কত বড় সাহিত্যকর্ম্ম, এবং জনজীবনের সঙ্গে কত গভীর আত্মীয়তার দ্যোতক, একথা আমরা অনেক সময়ই ভুলিয়া যাই। রামপ্রসাদের শাক্তসঙ্গীতকে সাধারণতঃ আমরা শুধুমাত্র অধ্যাত্মসম্পদ বলিয়াই মনে করি, এবং অন্যতম অধ্যাত্ম—সাধনোপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু গভীরভাবের দ্যোতনায়, ভাষার স্বচ্ছতায়, উপমার ইঙ্গিতে ও ব্যঞ্জনায়, সুরের মাধুর্য্য বিস্তারে এবং জীবনের সূক্ষ্ম গভীর ইঙ্গিতে রামপ্রসাদের গানের মধ্যে কি যে সাহিত্যরসের ও রূপের ঐশ্বর্য্য, তাহা আজও সাহিত্য ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে ধরা পড়ে নাই।

শাক্তসঙ্গীতগুলির উপমা অলঙ্কারের কথাই প্রথম ধরা যাক্। সঙ্গীতের আধ্যাত্মিক ভাব ও তত্ত্বগুলির সহজ স্ফুরণের জন্য প্রতিপদেই দেখি উপমা, আর সে উপমা-অলঙ্কার প্রয়োগের জন্য রামপ্রসাদকে কোন অলঙ্কারশাস্ত্রের দুয়ারে ভিক্ষা মাগিতে হয় নাই; অথবা সংস্কৃতপুরাণ-কাব্য-নাটক-বর্ণিত ও কীর্ত্তিত ছায়া, রূপক, স্বপ্ন বা ধ্যানের সন্ধান করিতে হয় নাই। এ উপমা ও অলঙ্কার সংগ্রহের আধার বাংলার পল্লীকুটীর ও পল্লীজীবন, বাংলার সুবিস্তৃত পথ-ঘাট ও আকাশ-বাতাস। বাংলার সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর পল্লীজীবন ও সমাজক্ষেত্র হইতেই শ্রদ্ধাভরে সযত্নে এগুলি সমাহৃত। 'মা আমায় ঘুরাবে কত, কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত'; 'খুলে দাও মা চোখের ঠুলি, দেখি তোমার অভয় পদ'; 'সারাদিন কাটালে ঘাটে বসে, সন্ধ্যাবেলা ধরলে পাড়ী'; 'একে তোর জীর্ণতরী কলুষেতে হলো ভারি, নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে'; 'দুখান তরী নিমক ভারি বাদাম তুলি না চলিল';—ইত্যাদি অসংখ্য পদাবলীতে লক্ষ্য করা যায়, অধ্যাত্মজীবনের উন্নত ধ্যান-কল্পনার মধ্যে সমসাময়িক পল্লীর সমাজ ও জীবনের সঙ্গে প্রসাদের সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ, পরিচয় কত নিবিড়। আগাগোড়াই যাঁহার ভাবনেত্র বাংলাদেশের জন, মজুর, কলু, কামার ও চাষী মাঝির জীবন ব্যাপারের সহিত এমন গভীর ও একান্তভাবে সম্পৃক্ত, তাঁহার গান বাঙালীর মন হরণ করিবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে অধ্যাত্মধ্যান ও কল্পনা, এই যে ইঙ্গিত অনুসন্ধান, রামপ্রসাদ ব্যবহৃত উপমা অলঙ্কারাদির ইহাই গভীরতর ব্যঞ্জনা; এবং এই ব্যঞ্জনার মধ্যেই

সাহিত্যরসের ইঙ্গিত। এই উপমা-অলঙ্কার-রূপক ইত্যাদিকে আশ্রয় করিয়াই প্রসাদীগানের শ্রোতার মন আপনাকে প্রসারিত করে এবং জীবনের গভীরতর ইঙ্গিতের সন্ধান লাভ করে। অধ্যাত্মজীবন, পরমধনের গভীর রহস্য যে দৈনন্দিন জীবন হইতে খুব দূরে নয়, বরং তাহারই সঙ্গে ওতপ্রোত হইয়া জড়িত, এই সত্য তাহার নিকটতর হয়, বিরাগ-ঐশ্বর্য্যের ব্যাপ্তি চিত্তের মধ্যে প্রসারিত হয়। রামপ্রসাদের শাক্তসঙ্গীতের সৃষ্টি-ধর্ম্ম এই তথ্যের মধ্যে নিহিত।

'জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে।
ভবে আমার কি হইবে গো মা॥
অগম্য জলেতে মীনের শ্রয়, জেলে জাল ফেলেছে ভুবনময়।
ওসে যখন যারে মনে করে; তখন তারে ধরে ফেলে॥
পালাবার পথ নাইকো জালে, পালাবি কি মন ঘেরেছে কালে
রামপ্রসাদ বলে মাকে ডাক, শমন দমন করবে এসে'॥ ২০

'থাকি একখান ভাঙ্গা ঘরে।
তাই ভয় পেয়ে মা ডাকি তোরে॥
হিল্লোলেতে হেলে পড়ে, আছে কালীর নামের জোরে।
ঐ যে রাত্রে এসে ছয়টা চোরে, মেটে দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে পড়ে॥ ২১

'সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না।
ভাল পেয়েছ ভবে কাল বিছানা॥
এই যে সুখের নিশি, জেনেছ কি ভোর হবে না।
তোমার কোলেতে কামনা কান্তা, তারে ছেড়ে পাশ ফের না'॥
—ইত্যাদি। ২২

উপমা-অলঙ্কার প্রয়োগের এমন সহজ জীবন-ধর্ম্মী সার্থকতা, প্রথাগত অলঙ্কার প্রয়োগের মধ্যে নাই। এই হিসাবে প্রসাদী শাক্তসঙ্গীতের উপমাঅলঙ্কার প্রয়োগের সাহিত্যমূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মধ্যযুগীয় লোকায়ত সাহিত্যের সঙ্গে এই দিক্ হইতে রামপ্রসাদের শাক্তসঙ্গীতের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়।)

(প্রসাদের শাক্তসঙ্গীতে সাধনতত্ত্বের কথা নাই, এমন নয়। বেদ, বেদান্ত, পুরাণতন্ত্রের প্রভাব নাই, তাহাও নয়। কিন্তু যত কঠিনই হউক না কেন, সেই সব তত্ত্ব, বা শাস্ত্রোদ্ধৃত বচন, প্রসাদ তাহাকে ব্যক্ত করিয়াছেন, অত্যন্ত সহজ ও

সরলভাবে, প্রাত্যহিক জীবনের নানা চিন্তা ও কর্ম্মের সঙ্গে অত্যন্ত সহজভাবে মেলাইয়া মিশাইয়া, তাহাকে সহজ জীবনরসে গলাইয়া একান্ত সহজ ভাবে ও ভাষায়। শাস্ত্রীয় বিষয়বস্তুর জটিলতা এবং দুর্ব্বোধ্যতা, সামান্য ও সাধারণ জীবনের তুলনা, উপমা, ব্যঞ্জনায় আবর্ত্তিত হইয়া তাহাদের গ্রন্থি-বন্ধন খসাইয়া ফেলিয়াছে। যাহা ছিল জটিল, তাহা হইয়াছে সহজ। এইখানেই প্রসাদের শাস্ত্রবোধের সঙ্গে জীবনবোধের অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে।

'প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
আর বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি॥
অশুচি শুচিকে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে তখন শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর সেটাকে তাড়ায়ে দিবি।
যদি মোহ্ গর্ত্তে টেনে লয় ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি'॥ [২৩]

'হয়েছি জোর ফরিয়াদী।
ঐ যে মন করিছে জামিনদারী নেচে উঠে ছটা বাদী।
অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা তার ছটা কাম আদি।
যদি তুমি আমি এক হই, তো পূবে হতে দূর করেদি॥
বিমাতা মরেন শোকেতে ছটায় যদি আমল না দি।
সুখে নিত্যানন্দপুরে থাকি, পার হয়ে যাই আশানদী॥' [২৪]

এই জাতীয় নানাসঙ্গীতে প্রসাদ বাস্তবজীবনের একান্ত পরিচিত ঘটনার অবলম্বনে নানাশাস্ত্রীয় তত্ত্বের সহজ প্রকাশ ও প্রচার ঘটাইয়াছেন। প্রসাদ এই সকল গভীর শাস্ত্রীয় তত্ত্ব কেবল পাণ্ডিত্য বা বুদ্ধি দিয়াই আয়ত্ত করেন নাই, সুগভীর জীবনবোধ দিয়া সহৃদয়চিত্তে এগুলিকে একান্ত করিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার শাস্ত্র জীবনরসে সিক্ত এবং তাঁহার এই সকল সঙ্গীত শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যানমূলক হইলেও শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্ব্বিশেষে বাংলার জনসাধারণের প্রিয় ও হৃদ্য বস্তু। দৈনন্দিন জীবন ও অধ্যাত্মসাধনা এমনভাবে এক হইয়া যাওয়া, ইহাই প্রসাদী জীবনের ঐশ্বর্য্য এবং এই ঐশ্বর্য্যকে সহজ সরলতায় জনসাধারণের চিত্তদুয়ারে বহন করা, ইহাই প্রসাদী শাক্তসঙ্গীতের চরম সাহিত্যিক সার্থকতা।

প্রসাদী-সঙ্গীতের ভাব-কল্পনা যেমন স্বচ্ছ ও সহজ, ভাষা যেমন সরল, অনাড়ম্বর ও আবেগময়, অলঙ্কার যেমন সঙ্কেতধর্ম্মী ও ব্যঞ্জনাময়, ইহার ছন্দ ও সুরও তেমনই এদেশের জীবন ও প্রাণ-মনের একান্ত অনুগ। প্রসাদী শাক্ত-সঙ্গীতের গ্রাম্য ও চল্‌তি শব্দের অনায়াস ব্যবহারের মধ্যেও বাংলার জীবনের সহজ পরিচয় নিহিত। প্রসাদী-সঙ্গীতের সুরও বাংলার পল্লী ও প্রাকৃত জীবনেরই সহজ সুর। এই করুণ বৈরাগ্যময় সুরই গ্রাম্য কৃষিনির্ভর বাঙালীর প্রাণের সুর, সহজ গানের সুর। এই সুরের সঙ্গে বাংলার বাউল, ভাটিয়াল সুরের আত্মীয়তা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, ইহারা একই গোত্রের। ইহাদের দীর্ঘ তান এবং মন্থর লয়ের মধ্যে বৈরাগ্যের যে ইঙ্গিত ব্যাপ্ত, তাহাই প্রসাদী শাক্তসঙ্গীতের অন্যতম আকর্ষণ। বাংলার উদার শ্যামল বা রুক্ষ গৈরিক প্রান্তর, বিস্তৃত রূপালী বালুচর এবং প্রশস্ত নদী-বিল-হাওরের উদার, ব্যাপ্ত মহিমা, এই সুরের মধ্যে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। জীবনের সহস্র বিড়ম্বনার মধ্যেও তাই এ সুরের অলৌকিক প্রভাব বাংলাদেশ আজও ভুলিতে পারে নাই।

প্রসাদী শাক্তসঙ্গীতের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ, সমসাময়িক ইতিহাসের এবং চলমান জীবনধারার পরিপ্রেক্ষিতে না দেখিলে সহজে বোধগম্য হয় না। অষ্টাদশ শতকের তৃতীয়পাদের বাংলাদেশে অন্ধকার ঘনায়মান। সমাজ ও রাষ্ট্র বিপর্য্যস্ত, প্রাকৃত দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র বিপর্য্যয়ের মধ্যে মানুষ প্রায় দিশেহারা। রাজভয়, লোকভয়, মৃত্যুভয়, সমস্ত ভয় তাহাকে ঘিরিয়াছে। প্রাণরসের উৎস বিশুষ্ক। লোকায়ত জীবনের এই চরম দুর্দ্দিনে ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া রামপ্রসাদ শক্তিসাধনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সাধনলব্ধ শক্তিকে প্রাণস্পর্শী গানের মধ্যদিয়া প্রাকৃত জীবনের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। চরম দুঃখ ও দুর্দ্দিনের মধ্যেও দুঃখাপহত মানুষকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন :

'আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
তবে দেও কত দুঃখ মা আমি তা দেখতে চাই ॥
আগে পাছে চলে মা যদি, কোন্ খানেতে যাই।
তখন দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে, দুঃখ দিয়ে মা বাজার বসাই ॥
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এখন বিষের কৃমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই ॥

প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী, বোঝা নাবাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুঃখের বড়াই॥'

মৃত্যুভীত মানুষকে প্রসাদ মৃত্যুর ঊর্দ্ধে উঠিবার আহ্বান জানাইয়াছিলেন। যে শক্তি তাঁহাকে অভী করিয়াছিল, সেই শক্তিকে আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য সমসাময়িক মানুষকে তিনি আহ্বান জানাইয়াছিলেন।

'ওরে শমন কি ভয় দেখাও মিছে।
তুমি যে পদে ও পদ পেয়েছ, সে মোরে অভয় দিয়েছে'॥
—ইত্যাদি।

'যারে শমন যারে ফিরি।
ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি॥
পাপ পুণ্যর বিচারকারী, তোর যম হয় কালেক্টরি।

*   *   *

আমার কিসের শঙ্কা মেরে ডঙ্কা, চলে যাব কৈলাসপুরী॥'
—ইত্যাদি। [২৫]

অষ্টাদশ উনবিংশ শতকের বাঙালী রামপ্রসাদের গানের ভিতর হইতেই সাহস সংগ্রহ করিয়াছিল, এবং সেই অবিচল নির্ভীকতার মধ্যে ঘনায়মান অন্ধকারে আলোর সন্ধান লাভ করিয়াছিল। এই তথ্যের মধ্যেও রামপ্রসাদের শাক্ত-সঙ্গীতের সৃষ্টি-ধর্ম্মী ইঙ্গিত নিহিত। এই সব গানের অধ্যাত্ম-ইঙ্গিত তো আছেই, সাধকেরা তাহা গ্রহণও করিয়াছিল, কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রাকৃত জীবনে ও তাহার সমসাময়িক ছন্দের মধ্যে ইহাদের প্রভাবও তুচ্ছ করিবার মতন নয়।

প্রসাদী কাব্যের মানবিক আবেদন

বলিয়াছি, রামপ্রসাদের সাধনাজীবন আগাগোড়াই এই ধূলিমাটির জগতের সঙ্গে মিশিয়াই অগ্রসর, মুহূর্ত্তের জন্যও এই মাটির জগৎ ও স্থূল রক্তমাংসের জীবনের সঙ্গে তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটে নাই। এখানকার সহস্র দৈন্য ও অপূর্ণতা সত্ত্বেও প্রসাদের সাধনাজীবন ইহার স্পর্শকে ঘৃণাভরে দূরে ঠেলিয়া দেয় নাই; ভালবাসিয়া এই জীবনের নানা ক্ষতে তিনি স্নেহের প্রলেপ দিয়াছেন। এইজন্যই লোকায়ত জীবনের সাধারণ মানুষ এই জীবনদর্শনের মধ্যে তাহাদের একান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার স্পর্শ অনুভব করিয়াছে। তাঁহার আরাধ্য শক্তি-দেবতা

সাক্ষাৎ মাতা—গর্ভধারিণী হইতে অভিন্ন। ভক্ত সন্তান প্রসাদের কাছে গর্ভধারিণী জননী হইতে এই বিশ্বজননী কোথাও এতটুকু ভিন্ন নহেন। মায়ের মত এই শক্তি-দেবতা তাই প্রসাদের কেবল আরাধ্যাই নহেন। আদুরে ছেলের মায়ের মত তাঁহাকে ভক্ত সন্তানের অনেক অভিযোগ শুনিতে হয়, অনেক আব্দার, অভিমান সহিতে হয়। প্রসাদী কাব্যে মানবিক আবেদনের মূল কথা এই ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনার মধ্যে নিহিত।

তাহা ছাড়া, লোকায়ত দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে নানা অভাব, অভিযোগ, দুঃখ, বেদনা, ভয়, ভীতি ইত্যাদি তো নিত্যবস্তু। রামপ্রসাদের গান দৈনন্দিন জীবনের এই লোকায়ত রূপের মধ্যেই বিস্তৃত। এই সব দুঃখ, বেদনা, অভাব, অভিযোগই রামপ্রসাদের উপজীব্য। সেইজন্য এ গান শোনা মাত্রই সাধারণ মানুষের চিত্তকে স্পর্শ করে, এবং যেহেতু রামপ্রসাদ তাঁহার গানের কথা ও সুরের মধ্যদিয়া এই অভাব, অভিযোগ, দুঃখ, দৈন্যের ভিতর হইতে টানিয়া লইয়া যান দূরে, এবং তাহার উর্দ্ধে মানুষের চিত্তকে আহ্বান করেন, সেইজন্য লোকায়ত মানবচিত্ত কিছুক্ষণের জন্য হইলেও সেই গানের মধ্যে উদার একটি মুক্তির আস্বাদন লাভ করে।

তৃতীয়তঃ, সাংসারিক জীবনে দুঃখ, ভয় ও মৃত্যু এই তিনও নিত্যবস্তু। প্রতিদিন ইহাদের লইয়া মানুষকে ঘর করিতে হয়। রামপ্রসাদ এই দুঃখ, ভয় ও মৃত্যু—ইহাদের কথাও বলিয়াছেন এবং দুঃখ-ভয়-মৃত্যু-ভীত মানুষের প্রাণে একটি অত্যন্ত স্থির ও অবিচল সাহসের সঞ্চার করিয়াছেন। মানুষ তাঁহার গান শুনিয়া চিত্তে বল লাভ করিয়াছে, অন্ধকারের মধ্যে আলোর সন্ধান পাইয়াছে। দৈনন্দিন জীবনে মানুষের চিত্তে এই যে সাহস সঞ্চার, ইহাও মানুষের প্রাণে রামপ্রসাদের সঙ্গীতের অন্যতম মানবিক আবেদন, সন্দেহ নাই।

এই মানবিক আবেদন রামপ্রসাদের ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কারের মধ্যেও স্বপ্রকাশ। তাঁহার অধিকাংশ গানের ভাষাই একান্ত লোকায়ত দৈনন্দিন জীবনের ভাষা—সহজ, সরল ও লোকায়ত জীবনের গতিতে প্রাণবন্ত।

> 'মন তুমি কৃষি কাজ জান না।
> এমন মানব জমি রৈলো পতিত
> আবাদ করলে ফলতো সোনা'॥ ২৬

আবার,

'মা আমায় ঘুরাবে কত।
কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত' ॥[২৭]

অন্যত্র,

'তারা আমি নই আটাসে ছেলে।
আমি ভয় করিনে চোখ রাঙ্গালে ॥'[২৮]

ইত্যাদি সঙ্গীতের একান্ত সহজ ও সরল আবেদন অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। উপমায়, অলঙ্কার এবং বলিবার ভঙ্গীতে এ ভাষা বাঙালীর প্রাণের ভাষা।

ভাষার মত রামপ্রসাদের ছন্দ ও অলঙ্কারের মধ্যেও তাঁহার মানবিক আবেদন একান্ত প্রত্যক্ষ। যে হসন্তবহুল ছন্দ নানা প্রবচন ও ছড়ার মধ্যদিয়া বাংলার লোকায়ত জীবনকে নানাভাবে ব্যক্ত করিয়াছে, যে ছন্দ শিশু ও নারীর মন ভুলাইয়াছে, বয়স্ক পুরুষের কর্ম্মের প্রেরণা যোগাইয়াছে, সেই হসন্তবহুল ছন্দই রামপ্রসাদের সঙ্গীতের অন্যতম বাহন। আর যে ধামালী ছন্দ-রূপ বাংলার গ্রাম্য কৃষিনির্ভর জীবনে তাহার স্বল্প অবসরের মধ্যে বাঙালীর সুখদুঃখ ও আনন্দ বেদনাকে বহন করে, সেই ধামালী ছন্দও রামপ্রসাদের অন্যতম উপজীব্য। এই ছন্দ-রূপকে আশ্রয় করিয়াই রামপ্রসাদ বাঙালীর চিত্তে সহজ প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন।

এ কাব্যে অলঙ্কারও নিঃসন্দেহে অনেকখানি মানবিক আবেদন বহন করে। এ অলঙ্কার সাহিত্যদর্পণ বা কাব্যদর্শাদি সংস্কৃতশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত নয়, ইহাদের রূপ বা প্রকৃতির মধ্যে শাস্ত্রীয় প্রভাব প্রায় নাই বলিলেই চলে। রামপ্রসাদের উপমা ও অলঙ্কার একান্তভাবে লোকায়ত প্রাণরসে পুষ্ট, জীবনরসে সিক্ত। তাঁহার উপমা ও অলঙ্কার প্রত্যক্ষ ও নিবিড় জীবনানুভূতির সহজ ও অকৃত্রিম বাঙ্‌ময় প্রকাশ। ইহাদের মধ্যে কোন আড়ষ্টতা, আড়ম্বর বা পাণ্ডিত্যের প্রকাশ নাই।

'মা আমায় ঘুরাবে কত।
কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত।' —ইত্যাদি

'প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
আর বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র তত্ত্বকথা তায় সুধাবি ॥'

—ইত্যাদি

এই সকল সঙ্গীতের অলঙ্কারগুলির প্রকৃতি সংসারক্লিষ্ট মানবজীবনের নানা অবস্থা, নানা দুঃখ-বেদনাময় অভিজ্ঞতার সহিত অন্তরঙ্গভাবে জড়িত। ইহাদের উৎস প্রত্যক্ষ বাঙালী জীবন ও তাহার নানা অবস্থা বিপর্যয়, বাঙালী জীবনে ইহাদের অন্তর্নিহিত সুগভীর সঙ্কেত ও ব্যঞ্জনার প্রভাব অনস্বীকার্য্য।

সাধারণভাবে প্রসাদী গানের এই ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কারগত মানবিক আবেদন ছাড়াও রামপ্রসাদের আগমনী ও বিজয়াসঙ্গীতের মধ্যেও আছে মানবহৃদয়মনের গভীর আত্মীয়তা ও ঐকান্তিক আকর্ষণ। কারণ এ সঙ্গীতের মধ্যে ব্যক্ত, বাংলাদেশের দরিদ্র ও স্নেহাতুর মাতৃহৃদয়ের গভীর ব্যথা ও বেদনা।

'গিরি এবার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ কারো কথা শুনবো না॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়।
এবার মায়ে ঝিয়ে করবো ঝগড়া জামাই বলে মানবো না'॥ [২৯]

বাংলার দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনসমাজের ঘরে ঘরে আবহমানকাল কন্যার দুঃখ-দুর্দ্দশায় বিড়ম্বিতজীবন মাতৃহৃদয়ে যে আর্ত্তি ও আক্ষেপ মূর্ত্তিমান, এ সঙ্গীতে তাহারই প্রতি আছে অকুণ্ঠ ও অকপট সহানুভূতি ও সমবেদনা। সমাজ-জীবনের যে কুপ্রথা ও দুর্নীতির জন্য সুচিরকাল হইতে বাংলার মাতৃজীবনের এই শোচনীয় দুর্দ্দশা বিদ্যমান, রামপ্রসাদের সহৃদয় চিত্ত এই জাতীয় সঙ্গীতের করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী সুরে তাহারই বিরুদ্ধে জানাইয়াছে অভিযোগ, এবং এইভাবে তিনি বাঙালীর হৃদয়কে কাঁদাইয়াছেন।

বহুদিন পরে দরিদ্র স্বামীর গৃহ হইতে স্বগৃহে কন্যার আগমন উপলক্ষে বিরহ-ক্লিষ্ট মাতৃহৃদয়ের দুরন্ত ব্যাকুলতা, আবেগ ও উৎকণ্ঠা প্রসাদের এই জাতীয় সঙ্গীতে পরম আন্তরিকতায় অভিব্যক্ত।

'জয়া কি কথা কহিলি আমারে কিনিলি, কি দিলি
শুভ সমাচার।
তোমায় অদেয় কি আছে এস দেখি কাছে,
প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো॥' [৩০]

আবার গৌরীর মত বাংলার যে শত সহস্র কিশোরী বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য স্বামীর হস্তে কেবলই লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন পাইয়া আসিতেছে, প্রসাদ তাঁহার প্রেমকর-

স্পর্শে মুছাইতে চাহিয়াছেন তাহার সেই বেদনাশ্রু। সাক্ষাৎ জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী এখানে বাংলার ঘরের দরিদ্র ও হতভাগিনী মায়ের কন্যারূপে অবতীর্ণা।

এই মানবিক আবেদনের কিছু আভাষ প্রসাদের প্রাথমিক রচনা শৃঙ্গার-রসাত্মক বিদ্যাসুন্দর কাব্যের ভিতরেও প্রত্যক্ষ। পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যাসুন্দর কাব্য-গুলিতে বিদ্যা, সুন্দর বা হীরামালিনীর চরিত্রের প্রতি ভদ্র ও মার্জ্জিত রুচির তেমন কোন সহানুভূতি বা সমবেদনাই জাগে না। কারণ, এগুলি কেমন যেন জীবনহীন বা 'টাইপ'। কিন্তু প্রসাদী বিদ্যাসুন্দরে অন্যান্য কাব্যের মত আদিরসের প্রাধান্য থাকিলেও এসকল চরিত্রের মধ্যে আছে অনেকটা স্বাভাবিকতা বা জীবনের স্পর্শ। প্রসাদের বিদ্যাচরিত্রের স্বাধীনতা ও উগ্রতার ভিতরেও আছে প্রাণময়তা, ধর্ম্ম-ভীরুতা এবং গুরুজন ও দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা। বিদ্যা পরম ধর্ম্মভীরু। প্রতিদিন ভক্তের মত নিষ্ঠার সঙ্গেই বিদ্যা কালীপূজা সম্পন্ন করিত।

'অনাথিনী থাকি একা ছমাস বৎসরে
দিনেক তোমার সঙ্গে নাই দেখা॥'[৩১]

তিরস্কার করিতে উদ্যত মায়ের প্রতি কন্যা বিদ্যার এই আক্ষেপোক্তি ও অভিযোগ সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই সহানুভূতি উদ্রেক করে। সুন্দর চরিত্রও অন্যান্য সকল বিদ্যাসুন্দর কাব্যের চরিত্র অপেক্ষা সহজ সহানুভূতি ও প্রীতির উদ্রেক করে।

'শুন শুন প্রাণ প্রিয়া
মহাগুরু জনক জননী।'
—ইত্যাদি।[৩২]

এই বাক্যে জনক-জননীর প্রতি ভক্তিপরায়ণ সুন্দরচরিত্র মানবহৃদয়ের কতকটা প্রীতি ও ভালবাসা জাগায়।

বিদ্যা ও সুন্দর ব্যতীত প্রসাদী বিদ্যাসুন্দরের হীরা কুটনী চরিত্রও কেবল অবিমিশ্র নিন্দা, ঘৃণা ও ধিক্কারের বস্তু নয়। নীচজাতীয়া কুটনী হইলেও প্রসাদের হস্তে হীরার স্বাভাবিক নারীহৃদয়ের কোমলতা ও স্নেহপ্রবণতার অভাব দেখা যায় না।

'আছাড়ি পাছাড়ি সহী কেঁদে কহে হীরা
ও চাঁদ মুখের কথা শুনিব কি ফিরা॥'[৩৩]

বিপন্ন সুন্দরের প্রতি হীরার স্নেহ ও দরদপ্রকাশ, তাহার চরিত্রে সহৃদয় মানবের মায়া ও প্রীতি আকর্ষণ করে।

কোটালিনীর ভদ্রকালার স্তুতির মধ্যেও মানবিক আবেদন নাই, এমন নয়। সেও স্বামীর পীড়ন দর্শনে নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলতা, দুর্ব্বলতা এবং ভগবৎ-নির্ভরতাবশতঃ শেষ ও পরমনির্ভর দেবীর আরাধনায় আত্মসমর্পণ করিল এবং পরম বিশ্বাসে প্রসাদপুষ্প স্বামীর নিকট প্রেরণ করিল। বাংলার নারীহৃদয়ের এই চিরন্তন রহস্য ও সত্যের সহজ চিত্রণে প্রসাদীকাব্যের এই সকল চিত্র ও চরিত্র এ দেশের বিশ্বাসপ্রবণ ও ধর্ম্মভীরু নরনারীর হৃদয় সহজেই বিচলিত ও আকৃষ্ট করে।

এই একান্ত লোকায়ত মানবিক আবেদন রামপ্রসাদের জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ; এক্ষেত্রে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের পার্থক্য একান্তই জীবনদর্শন-গত, এবং সে পার্থক্য অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক।

রামপ্রসাদ—বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী সমাজ

রামপ্রসাদ প্রাকৃত বাঙালীর মনে আসন বিস্তার করিয়াছেন প্রধানতঃ তাঁহার বিচ্ছিন্ন ও একান্ত ভাবধর্মী পদাবলীর জন্য। সেই পদাবলীর কথা ও সুরের মধ্যে বাঙালীর মন অপূর্ব্ব অধ্যাত্মরসে পরম বৈরাগ্যের সন্ধান পাইয়াছে, তাঁহার নিজেরই মনের আবেগ ও আকৃতি সেই পদাবলীর মধ্যে ধ্বনিত হইয়াছে। প্রসাদী-পদাবলীর সাহিত্যিক সার্থকতা এইখানে।

কিন্তু তাঁহার এই পদাবলী-সাহিত্য, সেই সাহিত্যের বলিষ্ঠ ভাবাদর্শ, তাঁহার শব্দচয়ন ও বাগ্‌ভঙ্গী, উপমা ও ব্যঞ্জনা, ছন্দ ও অলঙ্কার-এ সমস্তই তাঁহার পরিণত অধ্যাত্মমানসের আবেগময় প্রকাশ। 'আরম্ভের আগেও আরম্ভ আছে' --ঠিক এই ভাবাদর্শ ও সাহিত্যরূপ লইয়া প্রসাদী-সাহিত্যজীবন আরম্ভ হয় নাই। এ তথ্য অনৈতিহাসিক নয় যে, তাঁহার বিদ্যাসুন্দর তাঁহার প্রথম রচনা এবং তাহার পর কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কালীকীর্ত্তন। বিদ্যাসুন্দরের কবি রামপ্রসাদ মোটামুটি মধ্যযুগীয় মঙ্গল কাব্য সাহিত্যের ধারায় ও আদর্শে বাঁধা। ধর্ম্মগত আচরণে ও অধ্যাত্মসাধনে যাঁহারা শাক্ত, তাঁহারা চিরাচরিত কোন মঙ্গলকাব্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। সমসাময়িক বাংলায় বিদ্যা ও সুন্দরের কাহিনী জনপ্রিয় ছিল। রামপ্রসাদ সেই কাহিনীকে আশ্রয় করিয়াছিলেন

এবং সেই কাহিনীগত ভাবাদর্শ এই কাব্যেও অনেকটা সক্রিয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রামপ্রসাদ এই কাহিনীকে যেভাবে রূপদান করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কবির ভাষা ও ভাবাদর্শগত স্বাতন্ত্র্যও সুস্পষ্ট। ভাষার দিক্ হইতে কবি তখনও প্রথাগত ছন্দ ও অলঙ্কার ব্যবহার, সংস্কৃত-ফারসী পাণ্ডিত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। যদিও সেই ভাষার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু লৌকিক স্পর্শ লাগিয়াছে, কিন্তু রামপ্রসাদের স্বাতন্ত্র্য প্রধানতঃ ধ্যান-কল্পনায় ও ভাবাদর্শে। প্রথমতঃ, রামপ্রসাদকল্পিত চরিত্রগুলি অনেকটা প্রাকৃত লোকায়ত দৈনন্দিন জীবনের ছাঁচে গড়া। তাহাদের রূপ ও প্রকৃতি বস্তু-ঘনিষ্ঠ, কথাও অলঙ্কারগত নয়; সমসাময়িক জীবন্ত, রক্তমাংসে-গড়া মানুষের নিশ্বাস তাহাদের প্রাণবন্ত করিয়াছে। এই হিসাবে রামপ্রসাদ মুকুন্দ-রামের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যাসুন্দর কাব্যের পরিণতি রামপ্রসাদের স্বতন্ত্র ধ্যান ও ভাবাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত। এই পরিণতি প্রচলিত বিদ্যাসুন্দর কাহিনীতে নাই, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরেও নাই। রামপ্রসাদের কল্পনায় মানুষের মহতী বিনষ্টি কোথাও ছিল না, সেইজন্য তাঁহারই ধ্যানাদর্শ অনুযায়ী বিদ্যাসুন্দরের জীবনকে একটি পূর্ণতর পরিণতির মধ্যে আনিয়া এই কাব্যের সমাপ্তিসাধন ঘটাইয়াছেন। এই পূর্ণতর পরিণতির কথা যেন অনিবার্য্যভাবেই কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের পরিণতি এবং তদাশ্রয়ে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার ইঙ্গিতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। যে মানবিক স্পর্শ পরবর্ত্তী জীবনে পদাবলীগুলিতে সুস্পষ্ট, সেই মানবিক স্পর্শ শৃঙ্গার রসাত্মক বিদ্যাসুন্দর কাব্যেও এবং সেই আদি পর্য্যায়েই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এবং হীরামালিনী ও কুটনী চরিত্রও সেই মানবিক স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

কিন্তু কাহিনীকাব্য অপেক্ষা গীতি কবিতা এবং গানেই রামপ্রসাদের প্রতিভার সহজ বিকাশ, এ তথ্য তাঁহার কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তনে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই কীর্ত্তনগানের ধারাও রামপ্রসাদ মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য হইতেই পাইয়াছিলেন। যে আবেগ ও সুরধর্ম্ম গীতিকাব্যের প্রাণ, তাহার সূচনা এই কৃষ্ণ ও কালীকীর্ত্তনের মধ্যেই দেখা যাইতেছে। এক্ষেত্রেও রামপ্রসাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, অর্থাৎ সহজ, সরল লোকায়ত ভাষা, উপমায়, ব্যঞ্জনায় প্রাকৃত জীবনের ইঙ্গিত এবং সুরাবেগের মধ্যদিয়া বক্তব্যের প্রকাশ—এ সমস্তই ক্রমশঃ যেন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়াছে। তবু বিদ্যাসুন্দর কৃষ্ণকীর্ত্তন কালীকীর্ত্তনের রামপ্রসাদ এখনও অনেকটা মধ্যযুগীয় বাংলা

সাহিত্যের ধ্যান-কল্পনা ও ভাবাদর্শের গতানুগতিকতার মধ্যে নিবদ্ধ। সেই গতানুগতিকতা ও চিরাচরিত ধ্যান-কল্পনা ও ভাবাদর্শ হইতে একান্ত মুক্ত হইয়া রামপ্রসাদ তাঁহার আপন স্বাতন্ত্র্যে স্বপ্রকাশ হইয়াছেন, তাঁহার আগমনী ও বিজয়া গানে, তাঁহার শাক্তপদাবলীতে। মধ্যযুগীয় ধ্যানে যে দেবদেবী ছিলেন ক্রূর ও নিষ্ঠুর, ছলনাকুশল, যাঁহারা ভয়ভীতি প্রদর্শন করিয়া মানুষের পূজা আকর্ষণ করিতেন, রামপ্রসাদের ধ্যানে সেই দেবদেবীরা হইলেন কল্যাণময়, ভাবময়, প্রেমময়, ভালবাসার বস্তু। যে মানুষ মধ্যযুগে ছিল প্রকৃতি ও সংসারের হস্তে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও পর্য্যুদস্ত, সেই মানুষই রামপ্রসাদের কল্পনায় হইল বলিষ্ঠ ও আত্মপ্রত্যয়বান্। যে মানুষ সংসার-সংগ্রামে দিশেহারা হইয়া অদৃষ্ট বা নিষ্ঠুর দেবতার কবলে নিজেকে সমর্পণ করিত, সেই মানুষ এখন হৃদয়ে গভীর ভক্তি ও বিশ্বাস লইয়া আত্মশক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া জননীর কোলে আসিয়া আশ্রয় লইল। এই যে মানুষকে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় ফিরাইয়া দেওয়া, আবেগময় প্রেম ও ভক্তির ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ করা, অষ্টাদশ শতকের ভাবাদর্শের এ কি বিস্ময়কর রূপান্তর, দুই শতাব্দী পরে বসিয়া তাহা ধারণায় আনা কঠিন। ইহার মধ্যে বাস করিয়া প্রসাদের মানুষের প্রতি যে অপরিমেয় বিশ্বাস ও ভালবাসা, মানবিক যে মূল্যের চেতনা, সমাজবোধের চেতনা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই রামপ্রসাদের পদাবলীর সর্ব্বপ্রধান সম্পদ। মধ্যযুগীয় গতানুগতিক ও চিরাচরিত ধ্যান ও দৃষ্টিভঙ্গীর এই যে বাঁক ফিরাইয়া দেওয়া, ইহাই রামপ্রসাদের পরম সাহিত্যকীর্ত্তি।

বিশেষতঃ, যখন মনে হয়, মঙ্গলকাব্যের একদা জীবন্ত প্রবাহ, বৈষ্ণব মহাজন-পদাবলী সাহিত্যের প্রাণবান্ স্রোত অষ্টাদশ শতকে ক্ষীণতর হইয়া ক্রমশঃ বদ্ধ জলাশয়ের মধ্যে সঞ্চিত হইতেছিল অথবা অগভীর সঙ্কীর্ণ স্রোতে বিবর্ত্তিত হইতেছিল, সেই যুগে রামপ্রসাদ তাহার মধ্যে নূতন প্রাণাবেগের সঞ্চার করিলেন, নূতন খাতে আবেগের স্রোত বহাইয়া দিলেন, নূতনতর উৎসের সন্ধান দিলেন, এবং আবেগ-ধর্ম্মী ভক্তি ও বিশ্বাসমূলক গীতিকাব্যের নূতনতর ধারা প্রবর্ত্তন করিলেন, তখন রামপ্রসাদের সৃষ্টির অপূর্ব্ব মহিমা উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হয় না। মধ্যযুগীয় সাহিত্যের সকল সৃষ্টি-সম্ভাবনা যখন প্রায় নিঃশেষিত, তখন রামপ্রসাদ নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দান করিলেন, রামপ্রসাদের এ কীর্ত্তি অবহেলার বস্তু নহে।

তাহা ছাড়া যখন মনে হয়, অষ্টাদশ শতকের মধ্যপাদে মধ্যযুগীয় সামন্তপ্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্য প্রায় কণ্ঠাগত, বাংলার নাগরিক, আর্থিক ও সামাজিকজীবন অন্তঃসার-শূন্য, রাষ্ট্রীয়জীবন বিপর্য্যস্ত এবং প্রাকৃত লোকায়ত জীবন পুকুরপাড়ে, বটের ছাওয়ায়, ঘরের দাওয়ায় গ্রাম্য সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আচার-অনুষ্ঠানগত এবং সামাজিক নানা অনাচারের মধ্যে নিজেদের প্রায় হারাইয়া ফেলিয়াছে, তখন আবেগময় ভাষায় ও সুরে রামপ্রসাদ নূতনতর পথের সন্ধান দিতেছেন, দুর্ব্বল জাতিকে শক্তিসাধনায় আহ্বান করিতেছেন, জীর্ণ প্রাণে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় ফিরাইয়া আনিতেছেন, তখনও রামপ্রসাদের সৃষ্টির মহিমা নূতন দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। অষ্টাদশ শতকের বাঙালী জীবনে ইহাই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের পরম প্রকাশ আমরা দেখিলাম এক শতাব্দী পরে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনে।

প্রসাদী শাক্তপদাবলীর বাগ্‌ভঙ্গী, তাহার ছন্দ, উপমা, ব্যঞ্জনা প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার এই স্বতন্ত্র ধ্যান ও ভাবাদর্শের বাহক। সেই ভাষা, ছন্দ, উপমা, ব্যঞ্জনা—সমস্তই আহৃত হইয়াছে একান্ত সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের মধ্য হইতে। অধ্যাত্ম-জীবনের গভীরতত্ত্ব ও পরম রহস্যও ব্যক্ত হইয়াছে, সহজ প্রাকৃতজীবনের নানাবস্তু পরিবেশ ও নানা রহস্যের বিস্ময়কর সঙ্কেতের সূত্র ধরিয়া। অত্যন্ত কঠিন তত্ত্বও এমন সহজভাবে ব্যক্ত করা এবং সাধারণ মানুষের চিত্তে তাহার নির্ভুল ইঙ্গিত সঞ্চার করা, ইহা যে কত বড় সাহিত্যকর্ম্ম, তাহা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে যে কালে প্রাচীন বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের চিরপ্রযুক্ত অলঙ্কারগুলির চর্ব্বিতচর্ব্বণ চলিতেছিল এবং সেই রোমন্থনের ফলে উপমা-অলঙ্কার প্রভৃতি যখন তাহাদের ব্যঞ্জনাশক্তি হারাইয়া কাব্যদেহের প্রায় ভার হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে রামপ্রসাদ লোকায়ত জীবনের অনুভূতি হইতে তাহারই বস্তু পরিবেশকে আশ্রয় করিয়া নূতন উপমা ও ব্যঞ্জনা, নূতন বাগ্‌ভঙ্গী আহরণ করিয়াছেন। এই বাগ্‌ভঙ্গী, এই উপমা ও ব্যঞ্জনা, রস ও দীপ্তি নূতনতর লোকায়ত ভাষা এবং লোকায়ত জীবনকে এইভাবে বিশুদ্ধ আবেগ ও গভীর তত্ত্বের বাহন করা, রামপ্রসাদ নূতন প্রবর্ত্তন করেন নাই, একথা সত্য; সে ইঙ্গিত চর্য্যাগীতি, বৌদ্ধ দোঁহা, গ্রাম্য ছড়া ও বচন, গাথাকাব্য, আউল বাউলদের গান ইত্যাদিতে সুস্পষ্ট ছিল, কিন্তু রামপ্রসাদ সেই ইঙ্গিতকেই আরও উজ্জ্বল, আরও প্রসারিত, আরও সুপ্রতিষ্ঠিত

করিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। রামপ্রসাদ একান্ত গ্রাম্য ভাষা ও গ্রাম্য কৃষিনির্ভর জীবনের ধ্যান-কল্পনার অন্তর্নিহিত শক্তিকে নূতন চেতনা দান করিলেন, তাহার সুপ্ত সম্ভাবনাকে ব্যক্ত করিলেন, তাহার মধ্যে নূতন অর্থ সন্ধান ও নির্দ্দেশ দান করিলেন, ইহা যে রামপ্রসাদের সৃষ্টিপ্রতিভার সহজ, স্বাভাবিক অভিজ্ঞান, তাহাও অস্বীকার করা চলে না।

পঞ্চম অধ্যায়ের পাদটীকা

১। কবিরঞ্জনের কাব্য সংগ্রহ, পৃঃ ৩

২। " " " " ৭১

৩। " " " " ১০৭

৪। বাংলার সাধনা
ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা
ভারতীয় সাধনার ঐক্য
} ক্ষিতিমোহন সেন
শশিভূষণ দাসগুপ্ত

Obscure religious cults as background of Bengali Literature.
&
An Introduction to Tantric Buddhism
} S. B. Das Gupta.

Doctrine of Sakti in Indian Literature—
P. C. Chakravarti.

৫। কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহ, ২০৮ নং গীত

৬। " " ২০৭ "

৭। বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব্ব, পৃঃ ৮৫৩—৫৪

৮। কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহ, পৃঃ ১৭৬

৯। " " ২৬ নং গীত।

১০। " " ৪১ "

১১। বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব্ব, পৃঃ ৬৭০—৭১

১২।	কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহ		১৬২ গীত
১৩।	„	„	১৬৪ „
১৪।	„	„	১৩১ নং
১৫।	„	„	৩৩ „
১৬।	„	„	৭৩ „
১৭।	„	„	৭২ „
১৮।	„	„	২০৩ „
১৯।	„	„	২০৫ „
২০।	„	„	১৪৭ „
২১।	„	„	১৮৭ „
২২।	„	„	১৭২ „
২৩।	„	„	১২৯ „
২৪।	„	„	১০০ „
২৫।	„	„	৭১ „
২৬।	”	”	৩ ”
২৭।	”	”	২ ”
২৮।	”	”	৭০ ”
২৯।	”	”	২০৫ ”
৩০।	”	”	২০৪ ”
৩১।	”	”	পৃঃ ৭৫
৩২।	”	”	” ১৬১
৩৩।	”	”	” ১২৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ একই দেশ ও কালখণ্ডের সৃষ্টি। কোন বিশেষ দেশ ও কালের মধ্যে নানা সমাজস্তর, নানা ভাব ও আদর্শ, নানা-জীবনোপায়, নানা বস্তুপরিবেশ পাশাপাশি সক্রিয় থাকে, নানা পারস্পরিক সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়া। বাংলাদেশে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদ সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। ভারতচন্দ্র নাগরিক এবং সামন্ত দরবারী সমাজের পরিবেশের মধ্যে এবং সেই পরিবেশসুলভ শিক্ষায় দীক্ষায় মানুষ হইয়াছিলেন, প্রখর ব্রাহ্মণ্য বুদ্ধির দীপ্তিতে প্রতিভা ছিল উজ্জ্বল। দক্ষিণ রাঢ়ীয় সংস্কৃত পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্য, বুদ্ধির ক্ষুরধার দীপ্তি, নৈয়ায়িকের অবিশ্বাস, পণ্ডিতের ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ-প্রিয়তা, তিনি যেন উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করিয়াছিলেন, আর তাহা পুষ্ট ও লালিত হইয়াছিল নাগরসমাজের দরবারী পরিবেশের মধ্যে, যে পরিবেশে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, ভক্তি ও আবেগের উৎপাদন বা উদ্দীপনার কোন উপকরণ ছিল না বলিলেই চলে। অন্যদিকে সেই সমাজ অংশের ঐশ্বর্য্য ও অলঙ্কারের প্রতি, জীবনের উপরের স্তরের নানা রঙ, রূপ ও রসের সমৃদ্ধলীলার প্রতি, সংস্কৃত-অলঙ্কার বৈদগ্ধ্যপুষ্ট, ফার্সী-দরবারী-আবেশপুষ্ট, নাগরিক-সমৃদ্ধিপুষ্ট, রাজকীয় সভাকবির গতানুগতিক আদর্শ-লালিত জীবনের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ তাহার প্রভাবও গণনার মধ্যে আনিতেই হয়।

রামপ্রসাদের বস্তুপরিবেশ, তাঁহার উত্তরাধিকার ও শিক্ষাদীক্ষা কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। মধ্যবিত্ত ভদ্রসংস্কার ও সংস্কৃতি অনুযায়ী রামপ্রসাদ সংস্কৃত ও ফারসী বৈদগ্ধ্যের কিছু উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার জীবন, বিশেষভাবে পরবর্ত্তী জীবন, সেই উত্তরাধিকার ও পরিবেশের মধ্যে লালিত হয় নাই; জীবনোপায়ের প্রয়োজনের জন্য তাঁহাকে সমসাময়িক নাগর সমাজের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ ছিল প্রাকৃত লোকায়ত জীবনের সঙ্গে। নাগরজীবনের বিদগ্ধ ঐশ্বর্য্য-অলঙ্কার-সমৃদ্ধ জীবনের সঙ্গে এই লোকায়ত জীবনের আদর্শ বা অনুভূতির বিশেষ যোগ

ছিল না বলিলেই চলে ; সহানুভূতিও ছিল, এমন মনে হয় না। এই দুই বস্তু ও সমাজ পরিবেশ এবং দুই মানসপ্রকৃতি ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের সাহিত্যসৃষ্টি ও প্রতিভার পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যের মূল কারণ। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ একই কালের বাঙালী সমাজকে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাহার ব্যবহারিক ও মানস-কল্পনার জগতকে ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সেই সমাজের বিভিন্ন দুই পৃথক অংশকে, এবং সেই বিভিন্ন অংশগত বিশিষ্ট জীবনরূপ ও ধ্যান-কল্পনাকে। একটি বিদগ্ধ, বুদ্ধিজীবী, ঐশ্বর্য্য-অলঙ্কার-সমৃদ্ধ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-প্রিয়, তীক্ষ্ণ কলা-দীপ্তিময় নাগর সমাজের রূপ, আর একটি সহজ, প্রাকৃত, দরিদ্র, গ্রাম্য, কৃষিনির্ভর জীবনের ভাবাবেগময়, ভক্তিবিশ্বাসময়, সচেতন-কলা-নৈপুণ্য-বিরহিত, বিরলবসন, প্রায় অনাবৃত, অথচ সরল—সুষমাময় রূপ।

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের সাহিত্যপ্রকৃতি, সাহিত্যের ফলশ্রুতি ভিন্ন ও পরস্পর স্বতন্ত্র। ভারতচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টি সাহিত্যরচনার আনন্দ উপভোগের জন্য, কলা-কৌশল-রস ও বিদগ্ধ জীবনের তৃপ্তি আস্বাদনের জন্য, বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধি পরিতৃপ্তির জন্য। সাহিত্যই তাঁহার সাহিত্যের শেষ, অদ্ভুত পাণ্ডিত্যবলে অবলীলাক্রমে শব্দার্থের বিচিত্র সমাবেশ ঘটাইয়া ভারতচন্দ্র নিজেও আনন্দ পাইতেন, তাঁহার সমসাময়িক বিদগ্ধ সমাজও সেই সাহিত্যের মধ্যে তাঁহাদের চিত্তের পরিতৃপ্তি খুঁজিয়া পাইতেন। সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে যত কিছু কলা-কৌশল, যত কিছু আর্ট, সকলই যেন কবির সহজায়ত্ত ছিল। শব্দ ঝঙ্কারের কান এবং অর্থের মানবোধ, উভয়ই কবির ছিল অসাধারণ, তাই যেখানে যেমন ইচ্ছা, যেখানে যেমন রুচি, কবি শব্দ ও অর্থের সমন্বয় ঘটাইয়াছেন। সাহিত্যে তাঁহার দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত ইহার আর্ট সৃষ্টির দিকে, তাঁহার সৃষ্টিতে জীবন আর্টের অনুগামী মাত্র। ইহাই ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের বিশেষ প্রকৃতি। ভারতচন্দ্র কবি ও সাহিত্যিকদের কবি ও সাহিত্যিক, কলাবিদ্‌দের কলাগুরু।

রামপ্রসাদের সাহিত্যপ্রকৃতি ভিন্নরূপ। প্রথম জীবনে যখন তিনি গতানুগতিক সাহিত্যধারাকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যাসুন্দর কাব্যরচনা করিতেছেন, তখনই সেই রূপ ব্যক্ত হইয়াছে ; তাহা না হইলে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর পরিণতি এমন ভাবে কিছুতেই হইতে পারিত না। বিদ্যা ও সুন্দরের কাহিনী গতানুগতিক বিলাস-লীলায় এবং কাব্যিক কলা-কৌশলে বর্ণনামাত্র দিয়া তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই ; শেষ পরিণতির মধ্যে তাঁহার ধ্যান-কল্পনার জীবনকে

সৃষ্টিও করিতে চাহিয়াছেন, নূতন জীবনের ইঙ্গিতও দিয়াছেন। পরবর্ত্তী সাহিত্য প্রচেষ্টায়, সাহিত্য-আদর্শে এই রূপ ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়াছে, নূতন ইঙ্গিতও দিয়াছেন, সে ইঙ্গিত আজিকার দিনে গ্রাহ্য কি না সে প্রশ্ন বর্ত্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর। তাঁহার সাহিত্য তাঁহার জীবন সাধনার আশ্রয়মাত্র এবং তাঁহার আগমনী ও বিজয়াসংগীত, শাক্তপদাবলী প্রভৃতি সমস্তই সেই সাধনলব্ধ অভিজ্ঞতার আনন্দ—বেদনাময় প্রকাশ। সাহিত্য তাঁহার দৃষ্টিতে চর্চ্চা-আলোচনালব্ধ কলালঙ্কারের বস্তুমাত্র নয়, গভীরতম জীবনানুভূতির এবং জীবন-ধ্যানের স্বতঃস্ফূরিত বাঙ্ময় বিস্তার। রামপ্রসাদ কোথাও ভাষার জন্য ভাষা, ছন্দের জন্য ছন্দ অথবা অলঙ্কার প্রয়োগের জন্য অলঙ্কার ব্যবহার করেন নাই; তাঁহার ভাষা, ছন্দ, উপমা, অলঙ্কার প্রভৃতি যেমন সমসাময়িক লোকায়ত জীবনের বস্তু পরিবেশ হইতেই সংগৃহীত, তাহার চেয়েও বড় কথা, সেই ভাষা, ছন্দ ও উপমা অলঙ্কার তেমনই বাহন হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার গভীর, সূক্ষ্ম ও ঐকান্তিক জীবনানুভূতির। এ সমস্তই তাঁহার প্রয়োজন হইয়াছে, সেই অনুভূতিকে নিজের কাছেই জীবন্ত ও উপভোগ্য করিবার জন্য, এবং সেই অনুভূতিকে প্রাকৃত জীবনের মধ্যে সঞ্চার করিবার জন্য।

ভারতচন্দ্রের সম্মুখে যে জীবন বিস্তৃত ছিল, সেই সামন্তদরবারী ও নাগরিক জীবনের মধ্যে, সাধারণ জীবনের চলমান প্রবাহের মধ্যে, তিনি যে অন্তঃসার-শূন্যতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, ধর্ম্মের ও সমাজের নানা আচার-অনুষ্ঠান ও ব্যবহারের মধ্যে যে ছলনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাকে তিনি কখনও প্রচ্ছন্ন কখনও সুস্পষ্ট ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে লাঞ্ছিত করিয়াছেন, কখনও অলঙ্কারের আতিশয্যের মধ্য দিয়াই অন্তঃসার-শূন্যতাকে চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। বোধ ও আবেগের দুয়ারে নয়, আমাদের বুদ্ধির সম্মুখে সমাজের একটি বৃহৎ অংশের বস্তুময় রূপ তুলিয়া ধরিয়াছেন। অষ্টাদশ শতকে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের এবং সেই জীবনধারার মধ্যে জীবনের যে ছলনা প্রচ্ছন্ন ছিল, ভারতচন্দ্রের কৃপায়, তাঁহারই নির্ম্মোহ দৃষ্টির মধ্য দিয়া আমরা তাহার স্বরূপকে স্পষ্টতর করিয়া জানিয়াছি। সেই সময় ও সমকালীন সমাজের কেন্দ্রে বাস করিয়া, নাগরসমাজের দরবারী পরিবেশের মধ্যে বাস করিয়া, তিনি যে ভাবে তাঁহার দৃষ্টি ও বুদ্ধিকে সজাগ রাখিয়াছিলেন, কখনও আবিষ্ট হইতে দেন নাই, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার সচেতন সমাজবোধ দিয়া তিনি জানিয়াছিলেন, যাহার মধ্যে সারবস্তু আর কিছু

অবশিষ্ট নাই, যাহা ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে, সেই সমাজের এই বাস্তব অবস্থা, এই অন্তঃসার-শূন্যতা এবং তাহার জীবন ও ধর্ম্মগত ব্যবহার, আচার-অনুষ্ঠানকে হাস্য-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে লাঞ্ছিত করাই সৃষ্টি-প্রেরণা-উদ্বুদ্ধ কবির অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য।

রামপ্রসাদের সচেতন সমাজমানস সক্রিয় হইয়াছিল অন্যপথে। তিনিও যে প্রশস্ত প্রাকৃত লোকায়ত জীবন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও মূঢ়তা, দুঃখ-দারিদ্র্য, অত্যাচার, অভাব, অভিযোগ, প্রকৃতির বিপর্য্যয়ের অভাব ছিল না। সে জীবন ছিল জীবনধনে দীন, আশা ও দুঃখাপহত, দৃষ্টিহীনতায় আচ্ছন্ন। অষ্টাদশ শতকের মধ্যপাদের অন্ধকার তাহাকে ঢাকিয়াছিল। তাহারই কেন্দ্রে বসিয়া রামপ্রসাদ আত্মজীবন সাধনা করিয়াছিলেন, এবং সেই সাধনাবলে যে সবল আশা ও আশ্বাস, যে নির্ভীকতা এবং যে অবলম্বনের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহাই তিনি জাতির প্রাণে সঞ্চারিত করিতে চাহিয়াছিলেন, সে অবলম্বন আজিকার দিনের অবলম্বন কিনা, সে প্রশ্নও অবান্তর। সেইকালে ইহাই ছিল সাহিত্যের অন্যতম সমধিক প্রয়োজন। রামপ্রসাদ সেই অন্ধকারের মধ্যে জাতির প্রাণে বৈরাগ্যময় আবেগ, আনন্দের পরম নির্ভীকতা এবং আশা ও বিশ্বাসের সঞ্চার করিয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের আকর্ষণ দুই বিপরীত দিকে। জীবনের এক ধারায় থাকে বিদগ্ধরুচি, ঐশ্বর্য্য ও অলঙ্কার প্রীতি, পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধির দীপ্তির আকর্ষণ, সমসাময়িক চলমান জীবনের প্রথাগত সংস্কার ও আড়ষ্ট ধর্ম্ম এবং জীবনবোধের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের, হাস্যপরিহাসের আকর্ষণ। এই জীবনই বিস্তৃত ছিল অষ্টাদশ শতকের বাংলাদেশের ভদ্র, সংস্কৃতিপরায়ণ নাগরসমাজে। এই জীবনে ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের আকর্ষণ প্রবল এবং যে পরিমাণে এই জীবন আজও আমাদের মধ্যে বিধৃত, সেই পরিমাণে ভারতচন্দ্র আজও আমাদের প্রিয়। এই কারণেই ভারতচন্দ্রের সাহিত্যবৈদগ্ধ্য আজও আমাদের বিদগ্ধচিত্তে প্রেরণার সঞ্চার করে। তাঁহার কুশলী ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টি, তাঁহার নানা ছলাকলাময় মন্তব্য, তাঁহার পাণ্ডিত্য, তাঁহার সংস্কারবদ্ধ জীবনের উপর সুচতুর শরাঘাত, সর্ব্বোপরি তাঁহার নির্ম্মোহ দৃষ্টি অনুরূপ সংস্কৃত ও বিদগ্ধ জীবনের মন ও বুদ্ধিকে আজও তৃপ্তিদান করে।

এই সংস্কৃত, ভদ্র, শিক্ষিত জীবনের আড়ালে থাকে আর একটি জীবনের

ধারা। সে ধারা প্রাকৃত লোকায়ত জীবনকে আশ্রয় করিয়া প্রসারিত। সেখানে পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধির দীপ্তি অপেক্ষা, যুক্তির চাতুর্য্য অপেক্ষা ভাবের সারল্য ও হৃদয়াবেগের গভীরতা প্রবলতর। জীবনের এই ধারায় প্রসাদীপদাবলীর আবেদন অত্যন্ত গভীর। তাঁহার এই পদাবলীতে জীবনের গভীরতম অনুভূতির ধ্যানলব্ধ পরমতম সত্যের প্রাণময় প্রকাশ। প্রাকৃত লোকায়ত জীবন এই প্রকাশের মধ্যে তাহাদের প্রাণের বিস্তার খুঁজিয়া পায়। বাঙালী সমাজের যে অংশে যে পরিমাণে জীবনের গভীরতর অংশের প্রতি আকর্ষণ প্রবল, সেই অংশে সেই পরিমাণে রামপ্রসাদের গানের প্রতি আকর্ষণও গভীর। প্রসাদী-পদাবলীর এই আকর্ষণ আরও গভীরতর মহিমা লাভ করিয়াছে, প্রসাদী-সঙ্গীতের সুরের বৈরাগ্যময় আবেদনের মধ্যে। বস্তুতঃ, প্রসাদী সুরের গভীর ও প্রসারিত বৈরাগ্যমহিমাই রামপ্রসাদকে বাঙালী চিত্তের পরম আত্মীয় করিয়া দিয়াছে।

প্রথম পরিশিষ্ট

ভারতচন্দ্রের সত্যপীরের পাঁচালী

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও পরম নিষ্ঠার ফলে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য অনেক প্রাচীন কবি বা সাহিত্যিকের ন্যায় ভারতচন্দ্রের জীবনী ও গ্রন্থাদির পরিচয় আজ অনেকটা সুপ্রতিষ্ঠিত। গুপ্তকবি বিরচিত ভারতচন্দ্রের জীবন বৃত্তান্ত ও কাব্যাদির পরিচয় এ বিষয়ের প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিলেও করা যায়। ১ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-কর্ত্তৃপক্ষ এই বৃত্তান্ত অবলম্বনেই ভারতচন্দ্রের জীবন কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন এবং অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের মধ্যে কবির ত্রিপদী ও চৌপদী ছন্দে রচিত সত্যপীরের পাঁচালী দুইখানিও মুদ্রিতাকারে প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু রায়গুণাকরের সুন্দর ও সমৃদ্ধ ভাষার সহিত পাঁচালী দুইখানির ভাষাগত বিশেষ পার্থক্য বিবেচনা করিয়া কাহারও কাহারও মনে এ প্রশ্ন জাগিয়াছে, অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর রচয়িতা সংস্কৃতজ্ঞ, আলঙ্কারিক ও কলাকুশলী কবি ভারতচন্দ্র কেমন করিয়া এরূপ নগ্ন ও অপরিপক্ক ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। এই সংশয়ের জন্যই অনেকে ভারতচন্দ্রকে সত্যপীরের পাঁচালীর লেখক বলিয়া মনে করেন না।

এ সংশয় অসার্থক বা একেবারে অমূলক এমন বলিতেছি না। তবে সম্প্রতি এই পাচালীর যে পাণ্ডুলিপিখানি পাওয়া গিয়াছে, এ বিষয়ে আগ্রহশীল বিদ্বন্মণ্ডলীর সন্দেহ নিরাকরণে তাহা অনেকখানি সাহায্য প্রদান করিবে। ২ ভাব, ভাষা ও ছন্দের দৃষ্টিতে সাহিত্য-পরিষদ-মুদ্রিত গ্রন্থ এবং এই পাণ্ডুলিপির পাঠের তারতম্য আলোচনা করিয়া যেটি সঙ্গত ও বিশুদ্ধপাঠ বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। পুঁথি পাঠ গ্রহণে বানান সম্পর্কে প্রায় সর্ব্বত্রই অবিকল পুঁথির পাঠ রক্ষা করিয়াছি। কোন কোন স্থলে কিছু কিছু সংশোধন করিয়া আধুনিক প্রচলিত বানান প্রদান করিয়াছি।

'সত্যপীরের পাঁচালী'

শুন সভে এক চিত্ত সত্যপীরগুণান্বিতঃ।
১
তিন লোকে পাবে প্রীত সিদ্ধি মনস্কামাঃ॥
২ ৩
গণেশাদি দেবগণ বন্দ সর্ব্ব নারায়ণঃ।
সিরিণি দেও অনুক্ষণ জার জেই ভাবনা॥
৪
কলির প্রথমে হরি ফকিরের বেশ ধরি
৫
অবনীতে অবতরি হরিবারে জন্ত্রণা।
দ্বিতীয়েতে বিষ্ণুনামে দরিদ্র দ্বিজের ধামে
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কামে দানে কৈল মন্ত্রণা॥
৬
ব্রাহ্মণ ভিক্ষারে জায় প্রভু দেখা দিলে তায়,
৭ ৮
ধরিয়ে ফকির কায় মুখে দিব্য দাড়িরে॥
৯
গায়ে কাঁথা শিরে টোপ গলে চেলি মুখে গোঁপ
১০
ঝুলিতে ঝুলেছে থোপ হাতে আশা বাড়ি রে॥
সেলাম হামেরা পাড়ে ধূপ মাত্র কাঁহে থাড়ে
১১ ১২
প্রিয়াসনা দেখি বাঁড়ে মেরা বাত ধরত॥
১৩ ১৪
সিরণি দেও পিরে বা সক্রাদি খিরবা
১৫ ১৬
মোকামে হাজির বা সন্ধেকালে দেহত॥
১৭ ১৮

আসিয়ে নিবাস নিজ
১৯
পূজিল গরুড়ধ্বজ সির্ণি দিয়া বিহিতে
২০ ২১
দেখিয়া বিপ্রের ধন ঘরে ঘরে সর্ব্বজন,
২২
পূজে সর্ত্তনারায়ণ খ্যাতি কৈল ক্ষিতিতে ॥
২৩
ত্রিতিয়েতে বিষ্ণুলোক নিস্তারিতে রোগ শোক
২৪
সর্গে জায় ব্রহ্মালোক সভে কৈলেন মন্ত্রণা ॥
চতুর্থে উৎকট কষ্ট কাঠুরের হৈল নষ্ট,
২৫
জগতে হইল শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কৈল পালনা ।
সত্যপীরগণ গেয়ে মনোমত ধন পেয়ে
২৬
সিরিণি প্রসাদ খেয়ে সিদ্ধি করে বাসনা ॥
পঞ্চমে পাইয়া কন্যা সদানন্দ নামে ব্যানে
২৭
সর্ত্তপিরে সির্ণি মেনে চন্দ্রকলা নামেতে ॥
কি কব কন্যার ছাঁদ কাম ধরিবার ফাঁদ,
২৮ ২৯
মুখখানি পূর্ণ চাঁদ, জিনি রতি কামেতে ॥
৩০ ৩১
বর আনি নীলাম্বর রূপে গুণে মনোহর,
৩২
সদানন্দ সদাগর কন্যা দিল দানেতে ।
কন্যার বিবাহ দিয়ে জামাতারে সঙ্গে লয়ে,
৩৩

সিরিণি বিস্মৃত হয়ে, পাটনেতে চলিলে,
পীর ক্রোধ করে তায়, ধরা পড়ে চোর দায়
গলে তোক বেড়ী পায় কারাগারে রহিলে ॥
৩৪
চন্দ্রকলা নিকেতনে সর্ত্তপিরে সির্ণি ম্যানে
৩৫
সর্ত্তপির ভাবি মনে সাধু হইল ছোড়নে ॥
৩৬ ৩৭
এ সব প্রকার ষষ্ঠে সদাগর মুক্তকণ্ঠে
৩৮
সপ্তমে সাধুর দৃষ্টে পথে কৈল ছলনা।
অষ্টমেতে ঘরে আইল চন্দ্রকলা বার্ত্তা পাইল
৩৯
প্রসাদ খাইতে ছিল ফেলে কৈল হেলনা
৪০
জলে ডুবে মরে পতি উভরায় কান্দে সতী,
কি হবে আমার গতি, প্রভু কোথা গেলি হে
এ নব যৌবন নিশি হোয়ে তোর পূর্ণ শশী
৪১
কোথা আছ অহর্নিশি প্রেমাধিনী ফেলে হে ॥
যৌবন প্রভব কাল মদন দাহন জ্বাল,
৪২
কোকিল কোকিলা কাল রাখ পদতলে হে ॥
স্তবে তুষ্ট জগৎ কর্ত্তা বাঁচাইলেন তার ভর্ত্তা
সদানন্দ পাইল বার্ত্তা সির্ণি করিল বিহিতে ॥
৪৩ ৪৪
ভাঙ্গাইয়া কড়ি টাকা সির্ণি কৈল কাঁচা পাকা
যেন শশধর রেখা দুই লোকে তরিল
৪৫

ভরদ্বাজ অবতংশ ভূপতি রায়ের বংশ
সদাভাবে হত্ত কংস ভুরস্থটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের স্থত ভারত ভারতী যুত
৪৬
কুলের মুখটি খ্যাত, দ্বিজপদে স্থমতি॥
দেবের আনন্দ ধাম দেবানন্দ পুর গ্রাম
৪৭
তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুনসী।
৪৮
গুণ মস্ত মহাশয় স্নেহ করি অতিশয়
৪৯
হয়ে মরে কৃপাময় পড়াইলেন পাঁরসী
সংক্ষেপে করিনু পুঁথি জেমতি আমার মতি
৫০
করিনু তেমতি স্তুতি না লইবে দোষণা॥
৫১
গোত্রের সহিত তায় পির হবে বর দায়।
৫২ ৫৩
ঈশ্বরের ভাবি পায় সণে রুদ্র চৌগুণাঃ॥
৫৪

পুঁথির শেষে নিম্নলিখিতরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

"সর্ত্তনারায়ণের পুস্তর্ক সমাপ্ত হইল—বেলা আন্দাজ চারিদণ্ড থাকিতে সয়ক্ষর শ্রীবিশ্বনাথ সর্খাল সাং পাকুড়তলা এই পুস্তক পঠনার্থ শ্রীরামনাথ মণ্ডলের সাং পাকুড়তলা পরগণে ঘড় ১২৩৬ সাল তারিখ ২ জ্যৈষ্ঠ—রোজ ব্রিহস্পতিবার—

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

কালীকীর্ত্তন—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন

ভারতচন্দ্রের মত কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনেরও জীবন বৃত্তান্ত ও গ্রন্থাদির পরিচয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সংগ্রহই ·আপাততঃ নির্ভরযোগ্য। কারণ, গুপ্তকবি বিশেষ সাবধানে ও সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের পরিশ্রমে রামপ্রসাদের জীবন বৃত্তান্ত ও তাঁহার রচনাদির পরিচয় সংগ্রহ করেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কবি প্রসাদের কালীকীর্ত্তন গ্রন্থখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই মুদ্রিত গ্রন্থখানির প্রামাণিকতা সম্পর্কে গুপ্তকবি উহার ভূমিকায় নিম্নলিখিতরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

'ঐ অপূর্ব্ব গীত গ্রন্থের অবৈকল্যরূপে ও প্রাচুর্য্যরূপে বহুকাল স্থায়িত্বার্থ আমি আকর স্থান হইতে মূলপুস্তক আনয়নপূর্ব্বক সংশোধিত করিয়া কালীকীর্ত্তন পুস্তক মুদ্রিতকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি ইহাতে সাধু সদাশয় মহাশয়েরা নয়নাস্তপাত করিলে তাঁহাদের মনে কালীভক্তি কল্পলতাঙ্কুরবৃদ্ধি ও পরগুণগ্রাহিতা প্রকাশ হয় এবং গ্রন্থকর্ত্তার মহাকীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হয় এবং আমারও এতাবৎ পরিশ্রমের সুফলসিদ্ধি হয়'।

এরূপ একখানি সৎগ্রন্থ বাংলার জীবনের অপরিহার্য্য সম্পদ। গুপ্তকবির এই মুদ্রিত গ্রন্থখানি নিতান্ত দুর্ল্লভ বিবেচনায় শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত মহাশয় অতি কষ্টে রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরী হইতে এই গ্রন্থের একখণ্ড সংগ্রহ করেন এবং এই গ্রন্থের বিশুদ্ধ পাঠ রক্ষার জন্য সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকায় উহা অবিকল মুদ্রিত করেন। বাজারে সচরাচর যে সকল মুদ্রিত কালীকীর্ত্তন গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে পাঠবৈষম্যের অন্ত নাই। এ কারণ, এই অমূল্য গ্রন্থের অভ্রান্ত ও বিশুদ্ধ পাঠের নিদর্শনস্বরূপ গুপ্তকবির এই মুদ্রিত গ্রন্থ বা ইহা হইতে অবিকল উদ্ধৃত পাঠই এ পর্য্যন্ত আমাদের নির্ভর।

কিন্তু সম্প্রতি কবিরঞ্জনের এই কালীকীর্ত্তনের যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে, উক্ত মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠের সহিত ইহার আবার অনেকস্থলেই নানা বৈষম্য দেখা যাইতেছে। ৪ যদিও পাণ্ডুলিপিখানি মুদ্রিত গ্রন্থের সম্পূর্ণ অংশের সাক্ষ্য দেয় না এবং অসম্পূর্ণ বলিয়া ইহাতে রচনার স্থান, কাল বা লেখকের কোন

পরিচয় পাওয়া যায় না, তথাপি অনেকাংশে প্রসাদী কালীকীর্ত্তনের মৌলিকতা দাবী করিতে পারে বলিয়া মনে হয়।

মুদ্রিত গ্রন্থ ও পুঁথির পাঠের ভাব, ভাষা ও ছন্দগত বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিয়া এবং মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠের সহিত অপ্রকাশিত অথচ সঙ্গত পাঠ যুক্ত করিয়া কালীকীর্ত্তনের অপেক্ষাকৃত পূর্ণ পাঠ লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

পুঁথির পাঠের মধ্যে মুদ্রিত গ্রন্থপাঠের প্রথম হইতে অনেকটা অংশ অর্থাৎ 'প্রভাত সময় জানি হিমগিরি রাজরাণী'......এই প্রথম ছত্র হইতে তোমার অঙ্গের গুণনয় ও শ্রীঅঙ্গের গুণ' এই পর্য্যন্ত নাই। আবার শেষাংশেও 'চরাইতে ধেনু বেণু দান দিল ভব'——ইত্যাদি ছত্র হইতে 'চিত্তাকাশে প্রকাশে নবীন কাদম্বিনী' এই শেষ পর্য্যন্ত পুঁথির পাঠে নাই। অনাবশ্যক বিবেচনায় মুদ্রিত গ্রন্থের এই অংশ এখানে উদ্ধার করিলাম না। বানান সম্পর্কে অধিকাংশ স্থলেই পুঁথিপাঠ গ্রহণে পুঁথিগত সমসাময়িক বানানই রক্ষা করিয়াছি। কেবল কয়েকটি স্থলে কিছু আধুনিক দৃষ্টিতে পরিবর্ত্তন আছে।

কালী কীর্ত্তন

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।

প্রভাত সময় জানি হিমগিরি রাজরাণী উমার মন্দিরে উপনীত।
মঙ্গল আরতি করি চেতনা জন্মায় রাণী প্রেমভরে অঙ্গ পুলকিত ॥

* * *

তোমার অঙ্গের গুণ নয় ও শ্রীঅঙ্গের গুণ ॥

(মুদ্রিত গ্রন্থ)

তব অঙ্গের আভা যখন শ্রীঅঙ্গে পশিল।
শ্রীঅঙ্গের যে গুণ সেগুণে মিশাইল ॥ ১
উমা ছাড়া হয়ে রাণী দেখ দেখি অঙ্গ।
অমন আর কি দেখা যায় তার কি প্রসঙ্গ ॥ ২
হয় নয় অন্তরে রয়্যা আপন অঙ্গ দেখ নিরখিয়া।
উমার অঙ্গের আভা চাঁদ মলিন হয় চায়্যা ॥ ৩
প্রাণধন উমা মোদের গুণ সসোধর।
আমা সভার তনু নির্ম্মল সরোবর ॥ ৪

একচন্দ্র আভা শত সরোবরে লখি।
তোমা বল্যা নয় গো রাণী সকল অঙ্গে বিরাজ অঙ্গ যে যেমন
নিরখি ॥ ৫

এক মুখে কি কহিব উমার রূপগুণ।
উমার রূপের নানারূপ প্রসবে পুন পুন ॥ ৬
দাস প্রসাদ কহে সার কথা বটে।
পুষ্পে যেমন গন্ধ তেমনি মা বিরাজে সর্ব্বঘটে ॥ ৭
অঙ্গনে বৈসল রাণী ব্রহ্মময়ী কোলে
জগদম্বা আনন্দে আনন্দময়ী হাসি ২ দোলে। ৮
নিরখি বদন ইন্দু পুলকে উথলে প্রেমসিন্ধু
ছল ছল নয়ানলোর চন্দ্রবদন চুম্বনা।
মধুর বিনয় বাণী গদ ২ স্বরে কহত রাণী
কোটি জন্ম পুণ্য জন্য কোলে কমল লোচনা।
দর ২ দর নয়ান লোর
ঝর ২ ঝর তনু বিভোর
কবহু ২ করত কোর
থোরি ২ থোরি দোলনা।
রাণী বদন হেরি ২
হাসি ২ বদন বেরি
থোরি ২ মন্দ বলনা।
ঝুনুর ঘুমুর বাদ
কিঙ্কিনীর উভয় নাদ
পদতল থল কমল নিন্দি
ন কহি মকর গঞ্জনা।
গলিত ললিত মুকুতাহার
মেরু (—) বিচে মকরাকার
বিভুদ তটিনি নিসদ নিরে
ঐ ছন তনু অঞ্চলা।

কনক কসিত বিমলা কান্তি
মনহি তাপ করত শান্তি
তনু তিরপিত নয়ান সুখ
কলুস নিকর ভঞ্জনা।
দিন হিন প্রসাদ দাসে
সদত করুণা ভাসে
বারেক ও রবি তনয় শঙ্কা
মদন ২ অঙ্গনা।

রাণী বলে ওগো জয়া কুস্বপনে প্রাণ আমার কাঁদে।
গত ঘোরতর নিশি রাহু যেন ভূমে খসি, গিলিতে ধাইছে মুখ চাঁদে॥
শুন্যাছি পুরানে বহু মুখখান বটে রাহু তার শরীরের সঙ্গে বটে কেতু। ৯
এ রাহুর জটা মাথে দারুণ ত্রিশূল হাতে বুঝিতে নারিলাম ইহার হেতু।
রাহু গ্রাস করে যে শশীরে সেই শশী এ রাহুর শিরে।
দেকহ কদাচ ভিন নয় ১০
রাহুর কপালে আনল জ্বলে
জটাভাসে গঙ্গা জলে
এমত কেবা দেখ্যাছ কোথায়।
কোথা গেলে গিরিবর শিব স্বস্ত্যয়ন কর গঙ্গাজল বিল্বদল আনি।
সর্ব্ব ঔষধির জলে স্নান করাও জয়া বলে সর্ব্ববিঘ্ন নাশ তাহে জানি॥
রামপ্রসাদে দাসে একথা শুনিয়া হাসে অন্য স্বস্ত্যয়নে কিবা কাম।
১১ ১২
যদি রাণি বুঝ্যা থাক আমার বচন রাখ জপ করাও মাএর দুর্গানাম॥
১৩
শিব স্বস্ত্যয়নে কিবা কাম।
সেই শিব জপে এই দুর্গানাম॥
১৪
শ্রীদুর্গানাম গুণগানে শিব না মরিল বিষপানে।
মাএর নামের ফলে যে মাএর নাম লয়।
তার কি আর অন্য ভয় সেই হইতে শিবে মৃত্যুঞ্জয় বলে॥ ১৫

দুর্গানাম সংসার সাগরে তরি, কাণ্ডারি তাহে ত্রিপুরারি।
যেই দুর্গানাম বিঘ্নহরে সেই দুর্গা কন্যারূপে তোমার ঘরে॥
গিরিরাজ সুন্দরী স্নান করাইয়া গৌরী পুনঃ বসাইল সিংহাসনে।
গদ ২ ভাবভরে ঝর ২ আঁখি ঝরে সাজায় রাণি যেমন উঠে মনে॥ ১৬
সুচারু বকুল মালে কবরী বান্ধিল ভালে হরিচন্দনের বিন্দু দিল।
উপরে সিন্দুর বিন্দু রবি কোলে যেন ইন্দু হেরি ২ নিমিষ তেজিল॥১৭
কোন সহচরী আর দোথরি মুকুতাহার আনি দিল উমার কপালে।
অনুমানে বুঝি হেন চাঁদ বেড়া তারা যেন উদয় করিল মেঘের কোলে॥১৮
হাসিয়া বিজয়া বলে মেঘ নহে কেশ ছলে রাহুর গমন হেন বাসি।
মুখ বিস্তারিয়া ধায় দন্তশ্রেণী দেখা যায় মুক্তা নহে গ্রাস করে শশী॥
জয়া বলে বটে এই পুণ্যকাল ইথে দান করা ভাল চিত্ত বিত্ত দান উমার পায়।
কৃপানাথ উপদেশ প্রসাদ ভক্তের শেষ প্রাণ দান দিয়া লইতে চায়॥১৯

জয়া বদনে দিলা চাঁদের তুলনা।
কত চাঁদ পদ রেণু করএ জয়া ভাবনা। ২০
শ্রীমুখমণ্ডল হেরি বিদগধ বিধি
নিরজনে বসি নিরমিল কলানিধি॥
শ্রীমুখ তুলনা যদি না পাইলে চাঁদে।
সেই অভিমানে চাঁদ পায়ে পড়ে কাঁদে॥ ২১
এ কথা শুনিয়া সখী বলিছে জনেক।
সবে মাত্র এক চাঁদ এ দেখি অনেক॥ ২২
ভুবন বিখ্যাত চাঁদ সুধার আধার।
পরিপূর্ণ হৈলে দেবে করয়ে আহার॥ ২৩

এই হেতু সে চাঁদের দেব প্রিয় নাম।
বিচার করিল মনে বিধি গুণধাম॥ ২৪
বিধির বাসনা সুধা সঞ্চয় কারণে।
চাঁদপাত্র বদলিয়া রাখিব বদনে॥২৫
পুরাতন পাত্র চাঁদ ভূমে আছাড়িল।
দশখান হইয়া রাঙ্গা চরণে পড়িল॥ ২৬

জত জনে জত বাদ শুন সার শুন কই।
এক চ াঁদ দশখণ্ড চায়ে দেখ ঐ॥২৭
চাঁদ পদ্ম দুই সৃষ্টি করিল বিধাতা।
চাঁদ আর কমলে হইল শাত্রবতা॥২৮
চাঁদ বলিছে এ কি সয়রে আমার।
আমার অঙ্গের শোভা যার অঙ্গে যায়॥
ছিরে কমল তাই হইতে চায়॥২৯
এতবলি মহা অহঙ্কারে চাঁদ উঠিল আকাশে।
অভিমানে কমল সলিল মাঝে ভাসে॥
উচ্চ পদ পেয়ে চাঁদ ক্ষমা নাহি করে।
বিস্তারিয়া নিজ কর পদ্ম শোভা হরে॥
বিধাতা বুঝিল চাঁদ মান করে বহু।
করিলা যুগল শত্রু রাহু আর কুহু॥৩০
নিরখি যুগল শত্রু ছাড়িয়া আকাশে।
ভয় পেয়ে অভয় পদে করিল প্রবেশে॥৩১
অভয় পদ ভজনের দেখহ প্রভাব॥
শত্রুভাব দূরে গেল দোঁহে মৈত্রভাব॥
দুই সৃষ্টি করি বিধির না পুরিল সুখ॥ ৩২
করিল তৃতীয় সৃষ্টি এই উমার মুখ॥
রাহু কুহু গরাসিল বদন প্রকাশি।
উভয়তঃ সিত পক্ষ নিত্য পূর্ণমাসী॥
বাহিরের অন্ধকার গগন চাঁদে হরে।
মনের আঁধার শ্রীবদনে আলো করে॥
দাস প্রসাদ রূপ নিরখি রহিল।
পূর্ণ চন্দ্র জেন ভূমে উদয় হইল॥৩৩

রাণী বলে সাধে সাজাইলাম বেশ বানাইলাম, উমা একবার নাচগো
নূপুর দিয়াছি পায় সুমধুর রব তায় একবার নাচি আছ ভবে,
তেমনি কর্য়া আর বার নাচিতে হবে
শুনেছি নিগূঢ় বাণী চারিবেদে তোমার নূপুরের ধ্বনি॥৩৪

উমা নাচগো ত্রিভঙ্গ দয়াময়ী নাচত।

বড় সাধের আনন্দ সই নাচত ॥৩৫

পরিবাদি পিনাকদণ্ড কত হি উঠত তানরঙ্গ

মন মোহন তান সুমধুর গান স্মরহর পরসঙ্গ ॥

দয়ামই নাচত ॥

শোভা চারর চিকুরে বেণি রচিত রঙ্গন ফুল লবঙ্গ ॥৩৬

ওগো আমার উমা নাচত ভাল।

সফল কর আমার এহ পরকাল ॥৩৭

চৌদিগে ঘেরল নব ২ বধূজন।

পূর্ণ চন্দ্র বেড়া যেন স্বর্ণ পদ্ম বন ॥ ৩৮

বাজে ডম্প জগঝম্প মৃদঙ্গ রসাল।

বিজয়ার করে করতাল শোভে ভাল ॥৩৯

প্রসাদ বলে পুণ্যবতির প্রসন্ন কপাল।

কন্যা যার পদহৃদে ধরে মহাকাল ॥৪০

কুমারী দশম বরিসে স্বর্ণ কান্তি ছটা।

সোসহিন সসঙ্ক পূর্ণ মুখ ঘটা ॥৪১

(শশহীন) (শশাঙ্ক)

ভুবনে ভূষিতরূপ এটা মাত্র ছল।

ভুজঙ্গ ভূষণ রূপ করে টলমল ॥৪২

রূপ চোয়ায়ে লাবণ্য গলে।

বান্ধা কি ভূষণ ছলে ॥

প্রভাতে নূতন গান শুন স্মেরযুতা।

উষাকালে উক্তি উল্লাসিত শৈলসুতা ॥৪৩

শ্রীরাজ কিশোরে মাতা নিজ সুত জ্ঞানে।

প্রসন্ন প্রকাশ গিত পুরাণ প্রমাণে ॥ ৪৪

(গীত)

অরসিক অভক্ত অধম লোকে হাসে।

করুণাময়ীর দাস প্রেমানন্দে ভাসে ॥৪৫

শ্রীরাজকিশোরা দেশে শ্রীকবিরঞ্জন।
রচে গান মহা অন্ধের ঔষধ অঞ্জন ॥ ৪৬
জয়া বলে চলনা জগদম্বা পুষ্প কাননে।
তোমার জয়া দাসী যাবে সনে ॥ ৪৭
জগদম্বে বিলম্বে অচলিত পদ চলনা।
সোহিত চরণ তলারুণ পদতব নখরুচি সম্পদদলনা ॥ ৪৮
লোল নিচোল বিলোল পবনে ঘন সুমধুর কিঙ্কিনী কলনা।
সকল সময় মম হৃদয় সরোরুহে বিধু বসি বহসি শশিললনা ॥ ৪৯
কল্পতরুতলে শ্রীরাজ কিশোরভাবে বাঞ্ছা ফল ফলনা। ৫০
ভাগ্যহীন শ্রীকবিরঞ্জন কাতরে দিন দয়াময়ী সন্তত ছলনা ॥ ৫১

জয়া বিজয়া সঙ্গে নগেন্দ্র জাতা।
পুষ্প কাননে ক্রীড়তি বিশ্বমাতা ॥
মত্ত কোকিল গুঞ্জিত পঞ্চস্বরে।
গুণ ২ গুঞ্জরে মন্দ ভ্রমরে ॥ ৫২
তরু পল্লব শোভিত ফুল্ল ফুলে।
মাতা বৈঠহি চারু কদম্বমূলে ॥ ৫৩
ঘামেরে ঘামিল বদন খানি।
ইহা শুন্যা কি বাঁচিবে রাণি ॥ ৫৪
মুখমণ্ডলমে শ্রমবারি ঝরে।
পরিপূর্ণ সুধাংশু পীযূষ ক্ষরে ॥
চারু সৌরভ সঙ্গ সুধীর সমীর।
প্রভু বিচ্ছেদ খেদ সুবাক্য গভীর ॥ ৫৫
মাতা মোহিত কম্পিত প্রেমভরে।
শিব শঙ্কর ২ গান করে ॥ ৫৬
ত্রিগুণাত্মক নির্গুণ কল্পতরু।
পরমাত্মা পরাৎপর বিশ্বগুরু ॥ ৫৭
করুণাময় হে শিব শঙ্কর হে।
শিব শম্ভু স্বয়ম্ভু দিগম্বর হে ॥ ৫৮

ভব ঈশ মহেশ শশাঙ্কধর।
ত্রিপুরাস্থর গর্ব্ব বিনাশকর॥
জয় বেদবিদাম্বরভূত পতে।
জয় বিশ্ববিনাশক বিশ্বপতে॥

অপাঙ্গ লোচনে মোহিনী কি গুণ জানে চৈতন্য নিগূঢ় হরেরে।
এমন রূপের ছটা চারি দিগে মেঘ ঘটা দেখিলে শিবের মন হরে॥ ৫৯
কুঞ্জর গামিনী তনু সৌদামিনী প্রথম বয়স রস রঙ্গিনী।
যৌবন সম্পদ ভাবে চিত্ত গদ ২ সমান সঙ্গের সঙ্গিনী॥ ৬০
নির্ম্মল বর্ণ বর্ণ আভা ভাবিনী ভূষণ শোভা হরের ভবনে কিবা কাজ।
পূর্ণ চন্দ্র কোলে খদ্যোত জলে প্রকাশে নাহি বাসে লাজ॥ ৬১
ভণে রামপ্রসাদ কবি নিরখিয়ে বদন ছবি মোহিত দেব মহেশ।
ভুলে কামরিপু জর ২ জর বপু এনা রূপের কি কব বিশেষ॥ ৬২

যদি বল অনূঢ়া কালির একি কথা।
শিব শিবা ভিন্ন রূপ কে দেখ্যাছ কোথা॥ ৬৩
উভয় সম্ভাষ সঙ্কেত সংবাদ।
উভয় চিত্ত মধ্যে জন্মে পরম আহ্লাদ॥ ৬৪
আজ্ঞা কর কতকাল হেতা রব।
কালক্রমে কল্যাণি কৈলাস পুরে লব॥ ৬৫
তুমি রমণীর শিরোমণি পরম রতন।
রতন ভূষণ কার না হয় যতন॥ ৬৬
পুরুষ বিহনে হয় বিধবা প্রকৃতি।
প্রকৃতি বিহনে আমার বিধবা আকৃতি॥ ৬৭
এই ভস্ম অঙ্গ ভুজঙ্গ ভূষণ।
তোমার বিহনে অন্য নাহি প্রয়োজন॥ ৬৮
নিজ হংস হংসী সদা মানসগামিনী।
চৈতন্য রূপিণী নিত্য স্বামীর স্বামিনী॥
নখজ্যোতি পরং ব্রহ্ম শূন্যাছ কি সেটা। ৬৯
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড কর্ত্রী কর্ত্তা তব কেটা॥ ৭০

অনুচ্চার্যানাদিরূপা গুণাতীত গুণ। ৭১
নির্গুণের সতগুণ প্রসবে ত্রিগুণ ॥ ৭২
নিজে আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব।
তব দত্ত তত্ত্বজ্ঞানে ঈশের ঈশত্ব ॥ ৭৩
তুমি মন বুদ্ধি আত্মা পঞ্চভূত কায়া। ৭৪
ঘটে ২ আছ যেমন জলে সূর্য্যছায়া ॥
বেদে বলে তুমি যোগী তত্ত্ব কর‍্যা ফিরে। ৭৫
সেই বস্তু এই তুমি মন্দাকিনী তীরে ॥
দাক্ষায়ণী দেহত্যাগে দক্ষে অপমান।
শিখরীরে করি ক্রিপা (কৃপা) তব অধিষ্ঠান ॥ ৭৬
মর্ম্ম কয়্যা স্বস্থানে প্রস্থান শূল পাণি।
জননী চলিল যথা গিরিরাজ রাণী ॥ ৭৭
বাল্যলীলা এই মার জনকভবনে।
গোষ্ঠলীলা অতঃপর একাম্র কাননে ॥
শঙ্করী কহেন বসি শঙ্করের কাছে।
প্রভু শঙ্করী সমান স্থান আর নাকি আছে ॥ ৭৮
শুন্যাছি তোমার লীলা অভিনক্ত কাশী।
অভিমুক্ত স্থান সেই গুপ্ত বারাণসী ॥ ৭৯
শঙ্করীর কথা শুনি কহেন পঞ্চানন।
প্রিয় শঙ্করী সমান স্থান একাম্র কানন ॥ ৮০
তবে যদি আজ্ঞা কর প্রভু ত্রিলোচনে।
একান্ত যাইব সেই একাম্র কাননে ॥ ৮১
কাশী হৈতে হৈল কাশীনাথের আদেশ। ৮২
একাম্র কাননে মাতা করিল প্রবেশ ॥

ইহার পর হইতে 'চিত্তাকাশে প্রকাশে নবীন কাদম্বিনী'—এই শেষ পর্য্যন্ত পুঁথির পাঠের মধ্যে না থাকায় এখানে উদ্ধার করিলাম না।

তৃতীয় পরিশিষ্ট

সেন ও দ্বিজ রামপ্রসাদ

প্রসাদ-পদাবলী বাংলার সাহিত্য ও জীবনের এক অমূল্য ও শাশ্বত সম্পদ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে প্রসাদীপদ এদেশের ধর্ম্ম ও কর্ম্মময় জীবনের এমন অপরিহার্য্য বস্তু, তাহাদের প্রকৃত রচয়িতা কে, সমগ্র পদাবলী সম্পর্কে এ প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত। প্রসাদী পদ সংগ্রহের জন্য এযাবৎ যাঁহারা গবেষণা ও ব্যাপকভাবে প্রচেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের গুপ্ত কবি ও পূর্ব্ববঙ্গের দয়ালপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের নামই উল্লেখযোগ্য। উভয়েই প্রসাদী পদকর্ত্তা হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গের একজন পৃথক রামপ্রসাদের উল্লেখ করিয়াছেন।

'পূর্ব্ব অঞ্চলে রামপ্রসাদী কবিতা অনেক প্রচারিত আছে। সে সকল পদ্য এখানে প্রচার নাই। ঢাকা, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা প্রদেশের নাবিকেরা সর্ব্বদাই তাহা গান করিয়া থাকে, সে বিষয়ে তাহাদিগের এত ভক্তি যে, যখন অস্নাত থাকে, তখন তাহা মুখাগ্রে উচ্চারণ করে না।'৫

দয়ালবাবু লিখিয়াছেন :

'পূর্ব্ব বাংলার অনেকেরই এরূপ অবগতি, সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে আমারও এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, রামপ্রসাদ দ্বিজ ছিলেন, কিন্তু কবিরঞ্জন রাম-প্রসাদ যে দ্বিজ ছিলেন না, ইহা আর বলিবার আবশ্যকতা নাই।' ৬

এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—'আমার বোধ হয় কবিরঞ্জন সঙ্গীতে নিজে দ্বিজভণিতা দেন নাই। তাঁহার গীতগুলি অতি গভীর ভাবাত্মক। কিন্তু দ্বিজ রামপ্রসাদ নামে যে সকল ভণিতা ছিল, সে সকল অপেক্ষাকৃত অনেক লঘুতা-প্রকাশক, কিন্তু ইহারই শেষাংশে তিনি লিখিয়াছেন :

'কিন্তু দ্বিজ রামপ্রসাদ বাস্তবিক একজন ছিলেন কিনা? যদি ছিলেন, তাঁহার বাড়ী কোথায়? তিনি কোন্ শতাব্দীর লোক? কি করিয়াই বা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন? ইহার বিন্দুবিসর্গও জানা গেল না।'

দেখা যাইতেছে, গুপ্তকবি এবং দয়ালপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের একজন পদকর্ত্তা রামপ্রসাদের অস্পষ্ট আভাস দিয়াছেন, কিন্তু নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলিতে

পারেন নাই। এইজন্য ইঁহাদের পরবর্ত্তী প্রসাদীপদ-সংগ্রহকর্ত্তা প্রসাদী-জীবন বৃত্তান্ত লেখকের সকলেরই মনে এই উভয় রামপ্রসাদের স্বরূপ সম্বন্ধে সংশয় বিদ্যমান। গুপ্তকবির কৃপায় কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের জীবনবৃত্তান্ত এবং তাঁহার অনেক পদই আজ সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহার এই বৃত্তান্তই আজ কবিরঞ্জনের জীবন সম্পর্কে প্রামাণিক। ৭ কিন্তু দ্বিজ রামপ্রসাদের প্রকৃত পরিচয় বা প্রসাদী-পদকর্ত্তা হিসাবে তাঁহার পরিচয় লইয়া তর্কবিতর্কের অন্ত নাই। অতুলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'রামপ্রসাদ' শীর্ষক গ্রন্থে দ্বিজ রামপ্রসাদের অস্তিত্ব অতিকষ্টে স্বীকার করিলেও প্রসাদী পদ-রচয়িতা হিসাবে তাঁহাকে আদৌ আমল দিতে চাহেন নাই। অতুলবাবু লিখিয়াছেন:

'চিনিষপুরের রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী আমাদের চিরনমস্য, তিনি সিদ্ধ হইয়া যে তথায় কালী স্থাপনা করিয়াছেন, ইহাতেও সন্দেহ না থাকিতে পারে, কিন্তু কবিরঞ্জনের নামের সহিত তাঁহার নামের সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই যে তাঁহার বিষয়ে কতকগুলি প্রবাদ ও স্বপ্নমূলক আখ্যায়িকা রচনা করিয়া তাঁহাকে পদকর্ত্তা রামপ্রসাদ বলিয়া সাজাইতে হইবে, আধুনিক সাহিত্যিক লুপ্তরত্নোদ্ধারের নিয়মাবলীতে এইরূপ কোন বিধি লিপিবদ্ধ হয় নাই।'

দয়াল ঘোষ মহাশয় তাঁহার পূর্ব্ববঙ্গে সংগৃহীত পদের অনেকগুলিতে দ্বিজ-ভণিতা দেখিয়া ঐগুলি পূর্ব্ববঙ্গের কোন দ্বিজ রামপ্রসাদের গান বলিয়াই ধারণা করিয়াছিলেন।

'যদি চ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ভিন্ন 'দ্বিজ রামপ্রসাদের' অস্তিত্ব সম্বন্ধে মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলাম না, তথাপি পশ্চিমবাংলার সেন রামপ্রসাদ ভিন্ন পূর্ব্ব-বাংলায় একজন দ্বিজ রামপ্রসাদ ছিলেন—আমার এ সংস্কার দূর হইল না। দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণিতাযুক্ত সঙ্গীত মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইল বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় এই সকল সঙ্গীত দ্বারা কবিরঞ্জনের কিছুই পদবৃদ্ধি হইতেছে না, বরং কতক পরিমাণে পদহানি হইতেছে।' ৮

কিন্তু অতুলবাবু দ্বিজ রামপ্রসাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া ঐরূপ যাবতীয় গানই কবিরঞ্জনের বলিয়া মনে করেন।

'শাস্ত্রজ্ঞ রামপ্রসাদ বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কার সম্পন্ন হইয়া গানের ভণিতায় নিজকে দ্বিজ রামপ্রসাদ বলিয়া অভিহিত করিবেন, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।' ৯

অবশ্য স্থানান্তরে তিনি এরূপ উক্তিও করিয়াছেন :

'রামপ্রসাদের নামে প্রচলিত সমস্ত সঙ্গীতই যে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের রচিত, তাহা আমরা বলিতে চাহি না' এবং 'চিনিষপুরের রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী আমাদের চিরনমস্য'—ইত্যাদি ভাষণে একান্ত কুণ্ঠার সঙ্গে দ্বিজ রামপ্রসাদের অস্তিত্ব বা পদ-কর্ত্তা হিসাবে তাঁহার স্থান মানিয়া লইলেও তাঁহাকে কবিরঞ্জনের 'অনুকরণের দক্ষতার প্রশংসা ব্যতীত' কোনরূপ মৌলিকতার অধিকার প্রদান করিতে চাহেন নাই। এইজন্য তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই লিখিয়াছেন : "পরবর্ত্তী কালে তাহার ভাবের ও সুরের অনুকরণে ২।৪টি নকল সঙ্গীত রচিত হইলেও এবিষয়ে মৌলিকত্বের কৃতিত্ব একমাত্র কবিরঞ্জনেরই প্রাপ্য।" ১০

ইহা ছাড়া অতুলবাবু নিজে পূর্ব্ববঙ্গ বিক্রমপুর জেলার অধিবাসী, অথচ তিনি চিনিষপুর কালীবাড়ীর নাম শুনিলেও প্রসাদী সঙ্গীত রচয়িতা দ্বিজ রাম-প্রসাদের কথা কোন দিনই শুনেন নাই। 'প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গ নিবাসী রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি.এ. মহাশয় সমগ্র বঙ্গদেশ ঘুরিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে তিনি দ্বিজ রামপ্রসাদের নামোল্লেখও করেন নাই।'

আবার, "চিনিষপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী অবগত আছে" এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ববঙ্গ নিবাসী ৺দয়ালচন্দ্র ঘোষ মহাশয় রামপ্রসাদ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত চিনিষপুর না যাইয়া হালিসহরে আসিবেন কেন? ইত্যাদি নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করিয়া অতুলবাবু পূর্ব্ববঙ্গবাসী দ্বিজ রামপ্রসাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হইয়াছেন।

দেখা যাইতেছে, দয়াল ঘোষ মহাশয় নিজের দৃঢ় সংস্কারের দোহাই দিয়া পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী দ্বিজ রামপ্রসাদের অস্তিত্ব মনে মনে মানিলেও উপযুক্ত সাক্ষ্য বা যুক্তি প্রমাণের অভাবে শেষপর্য্যন্ত তাঁহার পরিচয়কে প্রতিষ্ঠা দান করিতে পারেন নাই।

গুপ্তকবি, "পূর্ব্ব অঞ্চলে রামপ্রসাদী কবিতা অনেক প্রচারিত আছে, সে সকল পদ্য এখানে প্রচার নাই" মাত্র এইটুকু ইঙ্গিত দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন।

কিন্তু দ্বিজ রামপ্রসাদ যে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং পূর্ব্ববঙ্গবাসী তাঁহারই সমসাময়িক মৌলিক পদকর্ত্তা, নানা কারণে এ বিষয়ে এখন

আর কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। কারণগুলি একে একে উল্লেখ করিতেছি।

১। প্রথমতঃ, এই সন্দেহের নিরাকরণে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 'রামপ্রসাদ' প্রবন্ধের অন্তর্গত "দ্বিজ রামপ্রসাদ" শীর্ষক আলোচনায় দ্বিজ রামপ্রসাদের অস্তিত্ব প্রমাণ কালে যে দুইটি লিখিত প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা অকাট্য বলিয়াই মনে হয়। ১১

"দয়াল ঘোষের অনুসন্ধানকালে বিক্রমপুরের বিখ্যাত শক্তিসাধক রাজমোহন আম্বলি তর্কালঙ্কার ১২৩১—৯৩ জীবিত ছিলেন। (প্রসাদ প্রসঙ্গ, ভূমিকা, পৃঃ ১৩) তাঁহার গান ও জীবনী মুদ্রিত হইয়াছে। ('সাধক রাজমোহন,' ১৩২৪) তাঁহার জীবনীপাঠে জানা যায়, চিনিষপুরের অর্থাৎ রামপ্রসাদের সিদ্ধ-পীঠে তিনি আত্মকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন (পৃঃ ১)। তিনি স্বয়ং তাঁহার তিনটি গানে ৮৪, ৯২ ও ১০৩ সংখ্যক সাধনপথে "রামপ্রসাদের রা" পাওয়ার কথা লিখিয়াছেন। রাজমোহনের পক্ষে কুমারহট্টের সিদ্ধপীঠ হইতে 'রা' পাওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ২৯২ সংখ্যক গানে যে সকল শক্তিসাধকের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে—ব্রহ্মাণ্ড গির, গোসাই ভট্টাজ, রামচন্দ্র, সর্ব্ববিদ্যা, পূর্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, রাজা রামকৃষ্ণ ও রামপ্রসাদ—তাঁহারা সকলেই পূর্ব্ববঙ্গে পরিচিত।"

দীনেশবাবু আরও বলেন: "ত্রিপুরা জেলার দক্ষিণাংশে খণ্ডল পরগণার 'মধুগ্রাম' এক সময়ে পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। ঐ গ্রামের অভয়ানন্দ ভট্টাচার্য্য ১৮২৫ শকে "আদিবৃত্ত" নামে একটি বংশবৃত্তান্ত রচনা করেন, তাঁহার পুঁথি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। এক স্থলে সিদ্ধ পুরুষদের একটি অদ্ভুত নামমালা আছে (পৃঃ ১০)। যথা "শ্রীধরস্বামী, ব্রহ্মাণ্ডগিরি, শঙ্করাচার্য্য, ভাগুরী স্বামী, পূর্ণানন্দ স্বামী, জয়দেব গোস্বামী, গুরু রামানন্দ স্বামী, গুরু নানকজী, সর্ব্ববিদ্যা সর্ব্বানন্দ ঠাকুর, রামপ্রসাদ ঠাকুর, গোরক্ষনাথ, মীননাথ, অভিরাম স্বামী, মুকুন্দরাম স্বামী, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, নয়ন ভট্টাচার্য্য ঠাকুর, গুংতিবন, গোসাই ভট্টাচার্য্য, মহারাজ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি।" 'কবিওয়ালা' রামপ্রসাদও 'ঠাকুর' ছিলেন বটে, কিন্তু যে সকল সিদ্ধ পুরুষের নাম স্মরণেও ধর্ম্মসঞ্চয় হইয়া থাকে, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন না নিশ্চিত।"

২। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী হইয়াও যে অতুলবাবু নিজে বা প্রসাদ-প্রসঙ্গকার দয়াল ঘোষ মহাশয় অথবা দীনেশ সেন মহাশয়—ইঁহাদের কেহই

চিনিষপুরের দ্বিজ রামপ্রসাদের তেমন কোন পরিচয় পান নাই বলিয়া অতুল বাবু পদকর্ত্তা দ্বিজ রামপ্রসাদের অস্তিত্বকে কতকগুলি প্রবাদ ও স্বপ্নমূলক আখ্যায়িকা রচনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন, ইহারও সদুত্তর দীনেশবাবু উক্ত প্রবন্ধেই প্রদান করিয়াছেন :

"চিনিষপুর অতি দুর্গমপথ ছিল এবং ভৈরব-টঙ্গি রেল খোলার পরও সুগম' নহে। দয়াল ঘোষ হইতে অতুলবাবু পর্য্যন্ত কেহই চিনিষপুর আসেন নাই।"

ইহা ছাড়া, দ্বিজ রামপ্রসাদ যে একান্ত অজ্ঞাত, অখ্যাত তাহার অন্য একটি বিশেষ কারণ, তিনি কেবল সাধকই ছিলেন। যোগ, সাধন ও সন্ন্যাসই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। কবিরঞ্জনের মত সাধন সঙ্গীত ব্যতীত অন্য কোন কাব্য তিনি রচনা করেন নাই, অন্তত তেমন প্রমাণ নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের মত মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতাও তাঁহার ছিল না; সেই কারণেই জনসমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের সুযোগও তাঁহার ঘটে নাই।

৩। তৃতীয়তঃ, অতুলবাবু যে শেষ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গের দ্বিজ রামপ্রসাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও কবিরঞ্জনের পরবর্ত্তী বিবেচনায় তাঁহাকে কেবল কবিরঞ্জনের পদের 'অনুকারকের সৌভাগ্যটুকুই' দিতে চাহিয়াছেন, তাহাও সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। দীনেশবাবু উক্ত প্রবন্ধে 'রামপ্রসাদের কাল নির্ণয়' শীর্ষক আলোচনায় দ্বিজ রামপ্রসাদকে কবিরঞ্জনের সমসাময়িক বরং তাঁহাকে 'কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠই' প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এবং দীনেশবাবুর এই সকল প্রমাণ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়াই মনে হয়।

দীনেশবাবুর এই সকল যুক্তি-প্রমাণ ব্যতীত আরও একাধিক এবং অন্তরঙ্গ প্রমাণ আছে, যাহার ফলে পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের দ্বিজ ও সেন দুই পৃথক ও স্বাধীন পদকর্ত্তা রামপ্রসাদের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

প্রথমতঃ, অতুলবাবু প্রসাদীগানের দ্বিজ ভণিতাটিকে যেরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা কবিরঞ্জনেরই গান বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, তাহা যুক্তিসিদ্ধ মনে হয় না।

তিনি বলেন :

"ইহাও হইতে পারে যে, সাধক সাধনার প্রথমাবস্থায় ভৈরবীচক্রে বসিয়া এই 'দ্বিজ' ভণিতাযুক্ত পদাবলীগুলি রচনা করিয়াছিলেন।" এই প্রসঙ্গে মহা-নির্ব্বাণ তন্ত্রের অষ্টমোল্লাসের শ্লোক উদ্ধার করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, যখন ভৈরবী-চক্র অনুষ্ঠিত হয়, তখন সকল জাতীয় ব্যক্তিই 'দ্বিজ শ্রেষ্ঠ' মধ্যে পরিগণিত।"

এই দ্বিজ ভণিতার ব্যাখ্যান কল্লে তিনি আরও বলিয়াছেন,—'শাস্ত্রজ্ঞ রামপ্রসাদ বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কার সম্পন্ন হইয়া গানের ভণিত্যায় নিজকে দ্বিজ রামপ্রসাদ বলিয়া অভিহিত করিবেন, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।'

কিন্তু অতুলবাবুর দ্বিজ ভণিতার এইরূপ ব্যাখ্যানে আপত্তি এই যে, সাধনার প্রথমাবস্থায় ভৈরবীচক্রে বসিয়া যদি কবিরঞ্জন 'দ্বিজ' ভণিতা দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সমগ্র কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন ও অন্যান্য যাবতীয় পদাবলীর কোথাও কি এইরূপ দ্বিজ ভণিতা থাকিত না? আবার উপনয়ন সংস্কৃত হইয়াই যদি কবিরঞ্জন 'দ্বিজ' বলিয়া নিজেকে পরিচয় দিতে চাহিতেন, তাহা হইলেও নিশ্চয় কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তনাদির পদেও কোন-না-কোন স্থলে দ্বিজ ভণিতা আশা করা যাইত। কিন্তু অন্য কোথাও এই ভণিতা দেখা যায় না।

পদাবলীর মধ্যেও যেগুলি কবিরঞ্জনের বলিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত, যেগুলির মধ্যে সংস্কৃত ভাষা ও অলঙ্কার এবং তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট, তাহাদের প্রায় কোনটিতেই দ্বিজ ভণিতা দেখা যায় না।

পক্ষান্তরে দ্বিজ রামপ্রসাদের সম্যক্ ও সুষ্ঠু পরিচয় না পাইলেও পূর্ব্ববঙ্গে সংগৃহীত যে কয়েকটি গানের ভাষা ও ভাবগত বৈলক্ষণ্য দেখিয়া দয়ালবাবু 'দ্বিজ' শব্দের পরিবর্ত্তে '+' এইরূপ চিহ্ন দ্বারা দ্বিজ রামপ্রসাদের বলিয়া ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহাদের প্রায় সবগুলিই দ্বিজ ভণিতাযুক্ত। ১২

সংবাদ প্রভাকরে গুপ্তকবি সংগৃহীত কবিরঞ্জনের গানের ভাষা ও ভাবের সহিত তুলনায় নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে, এই দ্বিজ ভণিতাযুক্ত পদগুলির অধিকাংশই কবিরঞ্জনের রচিত নহে।

দয়ালবাবু এবং 'প্রসাদ-পদাবলীর' রচয়িতা কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের মন্তব্যও এইরূপ সিদ্ধান্তেরই পরিপোষক।

'দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণিতিযুক্ত সঙ্গীত মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইল বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় এই সকল সঙ্গীত দ্বারা কবিরঞ্জনের কিছুই পদবৃদ্ধি হইতেছে না।'

(ভূমিকা—প্রঃ প্রঃ ১মসং)

"কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ যে দ্বিজভণিতি দিয়া কোন সঙ্গীত রচনা করেন নাই, এ বিশ্বাস অনেকেরই ছিল। কিন্তু দ্বিজ রামপ্রসাদ কে, তাহা জানিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন নাই।" ১৩

দ্বিজ ও সেন রামপ্রসাদের সমগ্র পদের এইরূপ ভণিতাগত বৈশিষ্ট্য ব্যতীত উঁহাদের ভাষা ও ভাবগত বৈলক্ষণ্যও দুই পৃথক রামপ্রসাদের অস্তিত্বের অন্যতম বিশেষ প্রমাণ। কবিরঞ্জনের প্রায় যাবতীয় পদেরই ভাষা একান্ত সংস্কৃতানুগ ও কবিত্বময়। প্রতিপদেই ইহাতে অনুপ্রাসাদি শব্দালঙ্কার এবং উপমা রূপকাদি অর্থালঙ্কারের ছড়াছড়ি। ইহাদের হসন্তবহুল ছন্দেরও এক বিশেষ ছাঁচ।

ভাষার সহিত ইহাদের অনেক স্থলেই ভাবের ঐশ্বর্য্যও লক্ষণীয়।

"সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হিন্দুশাস্ত্র, বিশেষতঃ তন্ত্রের ভাব লইয়া প্রসাদের পদাবলী ও গীতিকাব্য রচিত। রামপ্রসাদের আধ্যাত্মিক জীবনের ধারা এবং তাঁহার রচনা বিশেষভাবে আলোচনা করিলে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, কালীভক্ত প্রসাদ সনাতন হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহার মা-নামের পদাবলী অতি সরল ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদের মাতৃভাব সাধনা এবং তাঁহার ভক্তিতত্ত্ব শাস্ত্রমূলক, পদাবলীর যেখানে প্রসাদ কালীতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেখানেই তিনি তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।"১৪

গুপ্তকবি, দয়ালপ্রসাদ এবং অতুলবাবু প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে প্রসাদী রচনায় কবিরঞ্জনের এইরূপ ভাবগত ও ভাষাগত সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন এবং গুপ্তকবি সংগৃহীত বিশুদ্ধ কবিরঞ্জনের যাবতীয় পদেই এই বৈশিষ্ট্য ন্যূনাধিক

কিন্তু দ্বিজ ভণিতিযুক্ত গানের প্রায় সর্ব্বত্র এবং দয়ালপ্রসাদের '+' চিহ্নদ্বারা দ্বিজ রামপ্রসাদের বলিয়া নির্দ্দিষ্ট প্রসাদীপদের সর্ব্বত্রই ভাষা ও ভাবের পরিচয় ভিন্নরূপ। ইহাদের কোথাও সংস্কৃত বা তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না, এবং ভাষাও সর্ব্বত্র অনলঙ্কৃত, একান্ত সহজ ও সরল। ইহাদের কোথাও কবিরঞ্জনের পদের মত কবিত্বের লক্ষণ দেখা যায় না। দয়ালপ্রসাদ নিজেও গ্রন্থের ভূমিকাতে বলিয়াছেন:

"প্রথমে আমি রামপ্রসাদকে কবি বলিয়া জানি নাই, তাঁহার কাব্য সংগ্রহ আমার কার্য্যও হয় নাই। তিনি কালীসাধক, সেই সাধনার সঙ্গীত সংগ্রহই আমার কার্য্য।"

অন্যতর বিবেচনাও এই জাতীয় গানগুলিকে পূর্ব্ববঙ্গের দ্বিজ রামপ্রসাদের রচনা বলিয়াই সাক্ষ্য দিতেছে। ঈশ্বরগুপ্ত মহাশয়, 'এদেশে প্রচারিত নাই' বলিয়া পূর্ব্ব অঞ্চলের যে সকল প্রসাদী গানের কথা বলিয়াছেন, যাহার প্রতি

অকুণ্ঠ ভক্তি ও শ্রদ্ধায় ঐ অঞ্চলের অশিক্ষিত নাবিকেরা অস্নাত অবস্থায় বা বাসি কাপড়ে কখন ঐ গান করিত না, তাহা পূর্ব্ববঙ্গের এই অকবি রামপ্রসাদের হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ একাধারে শাস্ত্রজ্ঞ, কবি ও সাধক কবিরঞ্জনের পদের ভাষা ও ভাবের ঐশ্বর্য্য অশিক্ষিত বা নিরক্ষর নাবিকের ভাবোন্মাদ জন্মাইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য কবিরঞ্জনের গানের মধ্যেও যে অনেক সহজ ও সরল ভাষার সুন্দর পদ আছে, তাহা অনস্বীকার্য্য, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের বলিয়া সাধারণভাবে এগুলি দ্বিজ রামপ্রসাদেরই হইবার সম্ভাবনা।

ভাষার দৃষ্টিতে প্রসাদী গীতের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া আরও একটি বিষয় আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রসাদী গীতের কোন কোনটিতে এমন কতকগুলি পদ দেখা যায়, যেগুলি একান্তভাবেই পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা ও জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িত। পশ্চিমবঙ্গের জীবনে এইরূপ পদের ব্যবহার কখনও ছিল বলিয়া মনে হয় না।

যেমন—

'দেখি মা কেমন করে আমারে ছাড়ায়ে যাবা

এমন ছাপান ছাপাইব মাগো খুঁজে খুঁজে নাহি পাবা॥ ১৫

এই সঙ্গীতের 'ছাপান ছাপাইব' এই পদ কেবল পূর্ব্ববঙ্গের জীবনেই প্রচলিত। লুকান অর্থে ছাপান পদের প্রয়োগ পশ্চিমবঙ্গের জীবনে কোনদিনই চলিত নয়। এইরূপ একান্তভাবে পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষা-বহুল সঙ্গীতের আরও অনেকগুলি নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:

"কেহ দুধে খায় সাচি চিনি
কেহ শুতে তেতালাতে পালঙ্কেতে মশৈর টানি
আমরা মরি 'পুড়পুড়ায়ে' হে দে গো করুণাময়ী
ভাঙ্গা ঘরে নাইকো ছানি।"
"কে বা বুকের কে বা পিঠের বদনিয়তিয়া কাণীর কাণী॥
কেহ সারাদিনে পায়না খাইতে হে দে গো করুণাময়ী॥"

"চুরিদারী করলে পরে উচিত মত সাজা পাব।"

"কেহ গায় দেয় শাল দুশালা।
কেহ পায়না ছিঁড়া তেনা॥"

"যাই পড়াই তা পড় মন, পড়লে শুনলে দুধি ভাতি।
জাননা কি ডাকের কথা না পড়িলে ঠেঙ্গার গুতি॥"

"আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে,
ভবার্ণবে গো॥"

"তরকারী বানায়ে খাব।
তোমার মুণ্ডুমালা কেড়ে নিয়ে
অম্বলে সম্বরা দিব।"

"দুখান তরী নিমক ভরি বাদাম তুলি না চলিল"
"মোহাছিরা দিতে হবে, নিকাশ তৈয়ার কর।"

উপরি উদ্ধৃত সঙ্গীতের চিহ্নিত পদগুলি পূর্ব্ববঙ্গীয় সৃষ্টির পরিচয়ই দিতেছে। আবার কবিরঞ্জনেরই সঙ্গীতে প্রতিপদে এইরূপ প্রক্ষেপ আসিয়া পড়িয়াছে—এই অনুমানও যুক্তিসিদ্ধ মনে হয় না।

সঙ্গীতের ভণিতা এবং ভাষা ও ভাব বিচারে যেমন এইভাবে কবিরঞ্জন ও দ্বিজ দুই পৃথক ব্যক্তি বলিয়া ধারণা জন্মে, সঙ্গীতে পদকর্ত্তার জীবন-পরিচয়ও আমাদিগকে অনুরূপ সিদ্ধান্তে পৌছাইয়া দেয়। কবিরঞ্জনের সুপ্রতিষ্ঠিত জীবনবৃত্তান্ত দ্বারাই কতকগুলি গানকে কবিরঞ্জনের সঙ্গীত হইতে পৃথক না করিয়া উপায় নাই। কারণ এই সকল সঙ্গীতে রামপ্রসাদের জীবনের যে পরিচয় মিলিতেছে, তাহা কবিরঞ্জনের জীবন ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

'আমার কপাল গো তারা
ভাল নয় মা ভাল নয় মা, ভাল নয় মা কোন কালে।
শিশুকালে পিতা মলো মাগো রাজ্য নিল পরে,
আমি অতি অল্পমতি, ভাসালে সাগরজলে॥ ১৬

এ সঙ্গীতে দেখা যায়, শৈশবেই রামপ্রসাদের পিতার মৃত্যু হয় এবং তিনি অপহৃত-সম্পদ।

কিন্তু প্রসাদ-প্রসঙ্গকার কবিরঞ্জনের জীবনকাহিনী বর্ণনায় স্পষ্টাক্ষরেই লিখিয়াছেন :

'রামপ্রসাদ বাংলা, সংস্কৃত, পারসী ও হিন্দী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন, তিনি বত্রিশ বৎসর বয়সে বিবাহ করেন। যৌবনের প্রারম্ভে তাঁহার উপর সংসারের ভার ন্যস্ত হয়।'

আবার কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের পিতা বড় সম্পত্তিশালী ছিলেন বা রামপ্রসাদ শৈশবে রাজ্যহারা হন, দয়াল প্রসাদ বা গুপ্তকবি এমন কথার ইঙ্গিতও কোথাও দেন নাই।

অন্যত্র,—

'মা মা বলে আর ডাকব না।
ওমা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা॥
ছিলাম গৃহবাসী করিলি সন্ন্যাসী আর কি ক্ষমতা রাখিস্ এলোকেশী।' ১৭
এ সঙ্গীতে রামপ্রসাদকে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে দেখা যাইতেছে।

অথচ,

'তুমি ইচ্ছা সুখে ফেলে পাশা
কাঁচায়েছ পাকা গুঁটি।' ১৮

এ সঙ্গীতে কবিরঞ্জনের প্রতি আজু গোঁসাই-এর এই উক্তিতে মনে হয়, রামপ্রসাদ কোনদিন গৃহত্যাগী ছিলেন না, এবং বৃদ্ধ বয়সেও সংসারীরূপে একটি সন্তান লাভ করিয়াছিলেন।

অতএব এই জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা কবিরঞ্জনকে ধরিয়া লওয়া যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। অথচ এই গান দুইটির প্রথমটি দয়াল ঘোষ মহাশয়ের দ্বিজ বলিয়া '+' চিহ্নযুক্ত গীতেরই অন্তর্ভুক্ত।

এই প্রসঙ্গে 'রামপ্রসাদ'-গ্রন্থকর্তা অতুলবাবুর একটি উক্তির কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

'এই ভণিতার তারতম্য লক্ষ্য করিয়া ৺দয়ালচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার 'প্রসাদ প্রসঙ্গে' দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণিতাযুক্ত গানগুলিকে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের রচিত বলিয়া নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার

ধারণা ছিল ব্রাহ্মণ বংশ সম্ভূত অন্য কোন রামপ্রসাদ ঐ গানগুলি রচনা করিয়াছেন।' ১৯

অতুলবাবুর এই উক্তিতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল, কেবল 'দ্বিজ' ভণিতা দেখিয়াই দয়ালবাবু ঐ সকল সঙ্গীতের রচয়িতা দ্বিজ রামপ্রসাদের আবিষ্কার করেন। কিন্তু অতুলবাবুর এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ দ্বিজ-ভণিতা বর্জ্জিত গানও দয়ালবাবু তাঁহার গ্রন্থে '+' এইরূপ চিহ্ন দ্বারা দ্বিজ রামপ্রসাদের বলিয়া পৃথক করিয়া রাখিয়াছেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি এইখানে এইরূপ দুইটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিতেছি।

"এবার বাজি ভোর হলো।
মন কি খেলা খেলাবে বলো" ॥

(প্রসাদ-প্রসঙ্গ—১৩ নং ১ম সং)

'আমার কপাল গো তারা ভাল নয় মা,
ভাল নয় মা, ভাল নয় মা কোন কালে।

(ঐ—২১ নং)

দ্বিজ ও সেন রামপ্রসাদের পৃথক ব্যক্তিত্ব নির্ণয়ে গানের ভণিতা, ভাব, ভাষা এবং কবি-জীবনের পরিচয়ের সূত্র ব্যতীতও অন্য প্রমাণের অভাব নাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে চট্টগ্রাম আনোয়ারা স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম বি. এ. মহাশয় তাঁহার নিজ সংগৃহীত বাংলা পুঁথির যে বিস্তৃত তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহাতে প্রসাদ-বিরচিত দুইখানি পুঁথির পরিচয় পাওয়া যায়। উহাদের ১ম পুঁথিখানিতেও (২৩০ নং সঙ্গীত-সংগ্রহ) কবিরঞ্জন ও দ্বিজ দুই ভিন্ন রামপ্রসাদেরই পরিচয় সুস্পষ্ট।

"ইহাতে প্রাচীনকালের ২৬টি শাক্ত সঙ্গীত সংগৃহীত আছে। তন্মধ্যে অনেকটি কবিরঞ্জন ও দ্বিজ রামপ্রসাদের রচিত।"

আবার কবিরঞ্জন যে দ্বিজ ছিলেন না, তাহা "পূর্ব্ববাংলার অনেকেরই এরূপ অবগতি, সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে আমারও এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল যে রামপ্রসাদ দ্বিজ ছিলেন, কিন্তু কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ যে দ্বিজ ছিলেন না, ইহা আর

বলিবার আবশ্যকতা নাই"—প্রসাদ-প্রসঙ্গকার দয়ালবাবুর এই উক্তিও অন্যান্য যুক্তির সহিত লঙ সাহেবের নিম্নলিখিত কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের পরিচয়েও সুস্পষ্ট—

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন।

অষ্টম সংস্করণ।

সন ১৩৫৬ সাল।

Descriptive Catalogue

of

Bengali Works

by

J. Long

Calcutta

Sivite Works

Kali Kirtan, P. P. 20 1845

Kali's Praises, by Ramprosad, a Sudra

এই সকল নানাবিধ যুক্তি ও দৃষ্টান্তমূলক প্রমাণ প্রয়োগে এখন অনেকটা সুস্পষ্ট যে, দ্বিজ ও কবিরঞ্জন দুই সমসাময়িক পৃথক শক্তিসাধক ও স্বতন্ত্র শাক্ত পদাবলীর রচয়িতা, এবং দ্বিজ রামপ্রসাদ যে পূর্ব্ববঙ্গেরই কবি এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।

অতএব কাব্য-বিশারদ মহাশয় যে, কোনরূপ প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ না করিয়া 'দ্বিজ রামপ্রসাদের সন্ধান পাইয়াছি, তিনি পূর্ব্ববাংলার নহেন, কলিকাতারই অধিবাসী'[২০] এইভাবে দ্বিজ রামপ্রসাদকে পূর্ব্ববাংলা হইতে কলিকাতা সহরে টানিয়া আনিয়াছেন—ইহাও ভ্রমাত্মক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নহে।

কবিওয়ালা রামপ্রসাদ

সেন ও দ্বিজ রামপ্রসাদের আলোচনা প্রসঙ্গে একান্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই অপর একজন রামপ্রসাদের কথা আসিয়া পড়ে। বাংলাদেশে সুধীসমাজের অনেকেরই বদ্ধমূল ধারণা ও দৃঢ় বিশ্বাস যে, প্রসাদী পদাবলীর দ্বিজ-ভণিতাযুক্ত পদের

অনেকগুলি কবিওয়ালা রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর রচনা। 'প্রসাদ পদাবলী' রচয়িতা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ মহাশয় এই মতের একান্ত পরিপোষক। তাঁহার নিম্নোক্ত উক্তিই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—

'চক্রবর্ত্তী রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের মৃত্যুর পূর্ব্বেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথানুসরণ করিয়া সঙ্গীত রচনাও করিয়াছিলেন। সুতরাং উভয়ের সঙ্গীত যে মিশ্রিত হইয়াছে, ইহা কোনক্রমেই বিচিত্র নহে। কতকগুলি প্রসাদীগানে 'ডিক্রী', 'ডিসমিস', 'আপীল' প্রভৃতি শব্দ দৃষ্ট হয়। ঐ সমস্ত ইংরাজি কথা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে বাংলা ভাষার অন্তর্নিবিষ্ট হওয়া তত সম্ভবপর নহে। সেইজন্য আমার বোধহয়, উক্ত শব্দাবলীযুক্ত গানগুলি কবিরঞ্জনের নহে, চক্রবর্ত্তী রামপ্রসাদের রচিত।'[২১]

কিন্তু কাব্য-বিশারদ মহাশয়ের এই মতবাদ বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা যায় না। কারণ, প্রথমতঃ গুপ্তকবি কবিওয়ালাদের জীবন ও কাব্যসম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। তিনি তাঁহার সংবাদ-প্রভাকরের বিভিন্ন সংখ্যায় রামপ্রসাদ, রাসু, নৃসিংহ, রামবসু, হরুঠাকুর, নিতাই বৈরাগী ইত্যাদি প্রসিদ্ধ কবিওয়ালাদের প্রায় সকলেরই জীবন ও কাব্যের সুষ্ঠু ও বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।[২২] কিন্তু কবিওয়ালা রামপ্রসাদকে শক্তিসাধক বলিয়া কোথাও কোনরূপ ইঙ্গিতই দান করেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ, 'ডিক্রি', 'ডিসমিস', 'আপীল' প্রভৃতি যে সকল শব্দ কবিরঞ্জনের কাব্যের অন্তর্নিবিষ্ট হওয়া সম্ভবপর নয় বলিয়া তিনি ধরিয়া লইয়াছেন, তাহা কতদূর সত্য, সে বিষয়েও ঘোর সন্দেহ রহিয়াছে। কারণ যদিও কবিরঞ্জনের সময়ে পাশ্চাত্ত্য ভাষা ও জীবনের প্রভাব একান্ত হইয়া উঠে নাই, তবু, আইন সংক্রান্ত কিছু কিছু ইংরাজী শব্দ এদেশের সাহিত্য ও জীবনে প্রচলিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

অতএব ঐরূপ শব্দযুক্ত পদমাত্রই কবিওয়ালা রামপ্রসাদের, এইরূপ বিশ্বাস খুব যুক্তি-সহ মনে হয় না।

তৃতীয়তঃ,

"যেমন ঢাকের পিঠে বাঁয়া থাকে বাজে নাকো একটি দিন।
তেমনি নীলুর দলে রামপ্রসাদ এ-কটিন্॥"

এই প্রসিদ্ধ প্রবচনের উল্লেখ করিয়া কাব্য-বিশারদ মহাশয় রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীকে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর নীলুঠাকুরের দলের বাঁধনদার বা সঙ্গীতপ্রণেতা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

কিন্তু এই নীলুঠাকুরের দলে গীত যাবতীয় সঙ্গীতের প্রত্যেকটিই বৈষ্ণব-সঙ্গীত। দক্ষিণেশ্বর নিবাসী শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত "গুপ্ত রত্নোদ্ধার" বা "প্রাচীন কবি সঙ্গীত সংগ্রহ" নামক পুস্তকে এই নীলুঠাকুরের দলে গীত বলিয়া অনেক গানই সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু উহাদের একটিও শাক্ত-সঙ্গীত নহে এবং গ্রন্থে কবিওয়ালা রামপ্রসাদের কোনরূপ পরিচয়ই মিলে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি গান উদ্ধৃত করিতেছি—

'গুপ্ত রত্নোদ্ধার'
বা
'প্রাচীন কবি সঙ্গীত সংগ্রহ'
১৩০১ সাল।
নীলুঠাকুরের দলে গীত

১ চিতান। বৃন্দে সভামধ্যে কহিছেন,
কৃষ্ণে করিয়া প্রণাম।
১ পর চিতান। এলাম বৃন্দাবন ধাম হতে
রাধার সঙ্গিনী আমি—শ্যাম।
... ... —ইত্যাদি
(পৃঃ ২৯১)

১ চিতান। শ্রীমধুমণ্ডলে আসি বৃন্দে
খেদে গোবিন্দের পদার-বিন্দে কয়;
... ... —ইত্যাদি
(পৃঃ ২৯২)

বিরহ
৺নীলুঠাকুরের দলে গীত।
১ চিতান। শীত বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা আদি যত কাল;
১ পর চিতান। পতি বিনা সকল জেন নারীর পক্ষে কাল
... ... —ইত্যাদি (পৃঃ ২৪৫)

৺নীলুঠাকুরের দলে গীত।

১ চিতান। সকল ভণ্ডকাণ্ড ভোলা তোর।

তুই পাষণ্ড নচ্ছার।

১ পর চিতান। ভজিস ঢেঁকি, বলিস কিনা গৌর অবতার

... ... —ইত্যাদি। (পৃঃ ৩০৪)

অবশ্য, সেকালে এই কবিওয়ালারা এই জাতীয় বৈষ্ণব সঙ্গীতের সঙ্গে অনেক শাক্ত-সঙ্গীতও রচনা করিতেন, একথা অনস্বীকার্য্য এবং এই কবিওয়ালা রামপ্রসাদও যে শাক্ত-সঙ্গীত রচনা করেন নাই, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। তবে দ্বিজ ভণিতাযুক্ত প্রসাদী পদের অনেকগুলি এই কবিওয়ালা রামপ্রসাদের রচনা—একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায় না। আবার ডিক্রী, ডিসমিস ইত্যাদি ইংরাজী শব্দযুক্ত পদমাত্রই কবিওয়ালা রামপ্রসাদের, ইহাও এক কথায় মানিয়া লওয়া যায় না।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে,

'মাগো তারা ও শঙ্করী।

কোন্ অবিচারে আমার উপর, কল্লে দুঃখের ডিক্রীজারী'

(১৯ নং কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহ)

এ সঙ্গীতে 'প্যায়দার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র' এইরূপ উল্লেখ থাকাতে অনেক বিশিষ্ট পণ্ডিতেরই ধারণা এ পদটি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদেরই রচনা। তাঁহারা এই 'প্যায়দার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র' বলিতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এ ধারণা একান্তই ভ্রান্ত। কারণ, কবিরঞ্জনের পৃষ্ঠপোষক নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র 'প্যায়দার রাজা' বলিয়া পরিচিত হইবেন কেন? ইনি কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালই হইবেন। তবে ডিক্রীজারী, ডিসমিস্ ইত্যাদি ইংরাজি কথা থাকার জন্য এটি কবিওয়ালা রাম-প্রসাদের বলিয়াও নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।

অতএব শাক্ত-সাধক হিসাবে কবিওয়ালা রামপ্রসাদের স্থান কোথায় এবং প্রসাদী সঙ্গীতমালার অনুরূপ পদগুলি তাঁহার রচিত কিনা, উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে এ বিষয়ে আজও স্থির সিদ্ধান্তে পৌছান যায় না।

কবিরঞ্জন ও দ্বিজ রামপ্রসাদের পদাবলী

অথবা

প্রসাদী পদের স্বরূপ বা পরিচয়ঃ

সমসাময়িক শক্তিসাধক ও প্রসাদীপদকর্ত্তা হিসাবে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের দ্বিজ ও সেন রামপ্রসাদের পৃথক সত্তা প্রতিষ্ঠার পরেই সহজ জিজ্ঞাসা আসে, উহাদের পদ-পরিচয় সম্ভব কিনা। যদি আদৌ সম্ভব হয়, তবে উভয়ের পদগত ভেদ নির্ণয়ের প্রশস্ত বা প্রকৃষ্ট পথই বা কি?

এ যাবৎ যাঁহারা বিশেষ যত্ন ও গবেষণা সহকারে প্রসাদীপদ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ এ পথের কিছু কিছু কণ্টক পরিষ্কার করিলেও পথটিকে আজও নিষ্কণ্টক করিতে পারেন নাই।

কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ মহাশয় স্পষ্ট ভাষাতেই লিখিয়াছেন,—"এই দুই জনের রচনা পৃথক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতার্থ হইতে পারি নাই। কারণ এই অব্দ শতাস্তে কোন্ গানের ভণিতাতে দ্বিজ ছিল, কোন্ গানে ছিল না, প্রাচীন পাণ্ডুলিপির অভাবে তাহা স্থির করা যায় না।" [২৩]

অতি সম্প্রতি অধ্যাপক দীনেশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন,—"বর্ত্তমানে ভাষা ও সংগ্রহস্থানের সাবধান আলোচনা দ্বারা পদাবলীর বিভাগ দুরূহ হইলেও কর্ত্তব্য।"[২৪]

শ্রীযুক্ত দয়াল ঘোষ মহাশয়ের ইঙ্গিত এই অন্ধকার পথে বিশেষ আলোক প্রদান করে। তাঁহার সংগৃহীত অনেকগুলি গান দ্বিজ রামপ্রসাদের বলিয়া তাঁহার দৃঢ় সংস্কার ছিল। কিন্তু বিশেষ চেষ্টায়ও দ্বিজ রামপ্রসাদের প্রকৃত পরিচয় না পাইয়া শেষে নিম্নলিখিত ভঙ্গীতে তিনি দ্বিজ রামপ্রসাদের কয়েকটি পদের নমুনা রাখিয়া গিয়াছেন,—

"যে পর্য্যন্ত দ্বিজ রামপ্রসাদের বিষয় বিশেষরূপ জানা না যায়, সে পর্য্যন্ত সঙ্গীতগুলি কবি রামপ্রসাদের নয়, ইহাও বলিতে পারি না। কাজেই দ্বিজ শব্দের পরিবর্ত্তে বিশেষ একটি চিহ্ন '+' ব্যবহার করিয়া বিভিন্নতা রক্ষা করিয়াছি।"

এই জাতীয় পদনির্ব্বাচনে গুপ্তকবির ইঙ্গিতটুকুও প্রণিধানযোগ্য:

"পূর্ব্ব অঞ্চলে রামপ্রসাদী কবিতা অনেক প্রচারিত আছে, সে সকল পদ্য এখানে প্রচার নাই।"

গুপ্তকবি সংবাদ প্রভাকরের বিভিন্ন সংখ্যায় যে গানগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অনেকটা নিঃসন্দেহরূপেই কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের পদ-বিচারের মান নির্দ্দেশ করে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই মান এবং প্রাচীন প্রসাদী জীবনবৃত্তান্ত লেখক ও পদ-সংগ্রাহকগণের সংগৃহীত পদ এবং প্রদর্শিত পথ ধরিয়া কবিরঞ্জন ও দ্বিজ রামপ্রসাদের পৃথক পৃথক পদ-তালিকা নির্দ্ধারণের একটা চেষ্টা করা যাইতে পারে। আমার এ চেষ্টার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হইতেছে, সাধ্যমত যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত ভঙ্গীতে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের পদাবলীর উদ্ধার। বাংলার সাহিত্য ও সমাজজীবনে অষ্টাদশ শতকের যে দুইজন শাক্তকবির কাব্য ও জীবন-আদর্শ প্রধান আলোচ্য বিষয়, কবিরঞ্জন তাঁহাদের অন্যতম। তাই নিতান্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই তাঁহার পদ নির্দ্ধারণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য।

এ যাবৎ যাঁহারা নানাস্থান হইতে নানা উপায়ে প্রসাদীপদ সংগ্রহ করিয়াছেন বা মুদ্রিতাকারে উহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র গুপ্তকবিই দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের পরিশ্রমে ও পরম নিষ্ঠাসহকারে কবিরঞ্জনের পদাবলী সংগ্রহ করেন, এবং গুপ্তকবির সংগৃহীত কবিরঞ্জনের পদাবলী ও জীবনবৃত্তান্ত যে নিঃসংশয়ে নির্ভরযোগ্য, তাহা তাঁহার উক্তির দৃঢ়তা এবং প্রচেষ্টার আন্তরিক-তাতেই প্রমাণ। সংবাদ প্রভাকরের ১ পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রসাদী জীবন-বৃত্তান্ত ও পদাবলীর সত্য প্রতিষ্ঠাকল্পে ঐ পত্রিকার ১ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত পত্রখানি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

"মহাত্মা রামপ্রসাদ সেনের জীবনবৃত্তান্ত উল্লেখে আপনি যাহা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া আপনার পৌষ মাসিক প্রথম দিবসীয় অতিরেক পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপাঠে অস্মদগণেরা কি গাঢ় পুলক প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা লিখনে লেখনী অসমর্থা, কেননা, প্রকাশ্যপত্রে ঐ কবির গুণাবলী এরূপ আন্দোলন ও আলোচনা না হইলে কালে তাঁহার প্রকৃত গুণ ও অসাধারণ ক্ষমতা লোপ পাইবার সম্ভাবনা। অপর কবিরঞ্জনের দৈবশক্তি ও পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বরসের ব্যাপার যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা উৎকট বর্ণনা হয় নাই, স্বরূপাখ্যান হইয়াছে, কারণ রামপ্রসাদ সেন অস্মদগ্রামস্থ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বিষয়ে আমরা অনেক জ্ঞাত আছি। অপিচ তাঁহার মাহাত্ম্য বিষয়ক আপনার রচনা গ্রামস্থ বিজ্ঞ ও বহুদর্শী ও অনুসন্ধানকারী এবং বৃদ্ধ মনুষ্যদের সমক্ষে পাঠ করিলে তাঁহারা অম্লানবদনে ব্যক্ত করিলেন যে, এরূপ লেখা পরম্পরা শ্রুত বাক্যানুযায়ী বটে, পরন্তু তিনি যে ঐশিক

শক্তি প্রভাবে গীতাবলী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ বিরল, শাস্ত্রাধ্যয়ন না করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রের শাসন দর্শন ও মর্ম্মপ্রকাশ করা কি সামান্য ক্ষমতার কর্ম্ম ?”

এই পত্রখানির স্বাক্ষরকারী বা ইহার বিশেষ পরিচয় কিছু এখানে নাই বটে, তবে গুপ্তকবি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হইলে এরূপভাবে পত্রটি পত্রস্থ করিতেন না। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বটতলা বিদ্যারত্ন যন্ত্র হইতে ‘কবিরঞ্জনের কাব্য সংগ্রহ’ নামক গ্রন্থে যে ৯১টি প্রসাদীপদ প্রকাশিত হয়, তাহাও মনে হয়, অনেকটা বিশুদ্ধ কবিরঞ্জনেরই পদ, তবে ঐ গ্রন্থখানি এখন আর সুলভ নহে এবং ঐসকল গানেরও অধিকাংশ অর্থাৎ প্রায় ৬৬টি গুপ্তকবি সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশ করেন।

‘কবিরঞ্জনের কাব্য-সংগ্রহ’, ‘প্রসাদ পদাবলী,’ ‘প্রসাদ প্রসঙ্গ’, ‘সাধকসঙ্গীত’, ‘রামপ্রসাদ’ এবং এই জাতীয় প্রসাদীপদের যাবতীয় গ্রন্থই মিশ্রিত প্রসাদীপদের সংগ্রহ। ইহার কারণ তৃতীয় পরিশিষ্টে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

আবার গুপ্তকবির সংগ্রহ সমগ্র প্রসাদীপদের এক-চতুর্থাংশও নহে। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ১২৯২ সালে ‘কবিরঞ্জন কাব্য-সংগ্রহ’ নামক যে গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন, প্রসাদীপদ নির্ণয়ের মোটামুটি সত্য ও সূক্ষ্মধারা অনুসারে তাহারও প্রতিটি কবিরঞ্জনের বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

এ অবস্থায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অথচ একান্ত প্রয়োজনীয় বুঝিয়া পূর্ব্বোদ্ধৃত যাবতীয় গ্রন্থ হইতে প্রসাদীপদ সংগ্রহপূর্ব্বক উহাদের ভাষা, ভাব, প্রতিষ্ঠিত জীবন-বৃত্তান্ত ও প্রাপ্তিস্থানের সূত্র ধরিয়া এবং দৃষ্টি ও বিচারশক্তির নিরপেক্ষতা রক্ষণপূর্ব্বক কবিরঞ্জনের পদনির্ব্বাচনের চেষ্টা করিতেছি। উপযুক্ত পাণ্ডুলিপির অভাবে এ বিচার বা নির্ব্বাচন সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইবে এমন আশা করা যায় না। পাছে অর্ব্বাচীনতার পরিচয় পায়, এজন্য নানাদিক বিচারেও স্পষ্ট কোন লক্ষণের অভাবে অনেক পদেরই পরিচয় অনির্ণীতই রাখিতে হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত বিভিন্ন যুক্তি অনুসারে সমগ্র প্রসাদীপদকে মোটের উপর তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি।

প্রথম—কবিরঞ্জনের সঙ্গীত।

দ্বিতীয়—দ্বিজ রামপ্রসাদের সঙ্গীত॥

তৃতীয়—যে সকল সঙ্গীত সম্বন্ধে এইরূপ পরিচয় নির্ণয় করিতে পারি নাই, সেগুলিকে তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছি।

প্রসাদী পদনির্ণয়ের বিভিন্ন যুক্তি—

প্রথমতঃ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের জীবনবৃত্তান্ত হইতে ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত যে, রামপ্রসাদ একাধারে কবি, সাধক ও সঙ্গীতকার, এবং বিভিন্ন সংস্কৃতশাস্ত্র, গীতা, পুরাণ ও তন্ত্রাদিও তাঁহার একান্ত আয়ত্ত ছিল। তাঁহার কালীতত্ত্বমূলক সাধন-সঙ্গীতের ষট্‌চক্রাদি বর্ণনায় এইজন্য প্রতিপদে নানাতন্ত্রশাস্ত্রের ভাবের এত ছড়াছড়ি। তাঁহার এমন অনেক পদই আছে, যেগুলি ঐ সকল শাস্ত্রীয় পদের ভাবানুবাদ বলিয়াই মনে হয়। গুপ্তকবি সংগৃহীত কবিরঞ্জনের পদাবলীর মধ্যে এই জাতীয় সঙ্গীতের ছড়াছড়ি।

অতুলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার 'প্রসাদী রচনায় শাস্ত্রের প্রভাব' শীর্ষক আলোচনা প্রসঙ্গে এই জাতীয় গীতের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে এখানে সেরূপ দৃষ্টান্ত উদ্ধারের প্রলোভন হইতে বিরত হইলাম। লক্ষ্য করিবার বিষয়, সমগ্র প্রসাদী পদাবলীর এই জাতীয় পদে প্রায় কোথাও দ্বিজ ভণিতা দেখা যায় না, বরং এইরূপ অনেক পদেই স্পষ্ট কবিরঞ্জন ভণিতাই দৃষ্ট হয়। অনেক পদে এইরূপ শাস্ত্রীয় প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগের সৌষ্ঠব এবং কৌশলও লক্ষণীয়।

পক্ষান্তরে প্রসাদ-প্রসঙ্গকার দয়াল ঘোষ মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের রামপ্রসাদকে কেবল সাধক বলিয়াই জানিয়াছিলেন, এবং তাঁহার গ্রন্থে দ্বিজ রামপ্রসাদের বলিয়া '+' চিহ্নযুক্ত পদগুলির কোনটিতেই তেমন কবিত্ব অর্থাৎ ভাষা, ছন্দ বা অলঙ্কার প্রয়োগের কারিগরি নাই অথবা সংস্কৃতশাস্ত্রের প্রভাবের চিহ্ন নাই।

ঈশ্বরগুপ্তও পূর্ব্ববঙ্গের দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্পর্কে এমন স্পষ্ট ভাষায় কিছু না বলিলেও তাঁহার পদাবলীর অনুরূপ পরিচয়ই জন্মাইয়া দিয়াছেন।

"ঢাকা, সেরাজগঞ্জ ও পাবনা প্রদেশের নাবিকেরা সর্ব্বদাই তাহা গান করিয়া থাকে, সে বিষয়ে তাহাদিগের এত ভক্তি যে, যখন অস্নাত থাকে তখন মুখাগ্রে উচ্চারণ করে না" ইত্যাদি পূর্ব্বাঞ্চলের প্রসাদী গীত সম্পর্কে গুপ্তকবির এই উক্তিই যথেষ্ট প্রমাণ যে, ঐ রামপ্রসাদী পদ সংস্কৃতশাস্ত্র প্রভাবান্বিত নহে অথবা ছন্দ অলঙ্কারাদি জড়িত উচ্চাঙ্গের কবিত্বও তাহাতে ছিল না। কারণ নিরক্ষর নাবিক বা তজ্জাতীয় ভক্ত শাস্ত্রভাব প্রভাবিত বা অলঙ্কৃত পদাবলীর এমন ভক্ত ছিল বলিয়া মনে হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, 'দ্বিজ' ভণিতাটিকেও দুই ভিন্ন প্রকৃতির গীতপরিচয়ের অন্যতম সূত্র বলিয়া অনেকটা নির্ভয়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ইহার প্রথম কারণ, সমগ্র প্রসাদীপদের মধ্যে মাত্র গুটিকতক অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল প্রকৃতির পদ ব্যতীত কবিরঞ্জনের ভাবগম্ভীর ও সংস্কৃতশাস্ত্র-প্রভাবিত পদাবলী অথবা বিদ্যাসুন্দর, কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণ-কীর্ত্তনাদির কোথাও দ্বিজ ভণিতা দেখা যায় না।

দ্বিতীয় কারণ, দয়াল ঘোষ মহাশয় দ্বিজ রামপ্রসাদের অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট পরিচয় না পাওয়ায় যে গানগুলিকে কবিরঞ্জনের নয় বলিয়া জোর করিয়া বলিতে পারেন নাই, অথচ 'দ্বিজ' শব্দের পরিবর্ত্তে '+' এইরূপ বিশেষ চিহ্ন দ্বারা বিভেদ বজায় করিয়াছেন, তাহাদের প্রায় প্রতিটিতেই দ্বিজ ভণিতা আছে। [২৫]

তৃতীয়তঃ, সংবাদ প্রভাকরে গুপ্তকবি সংগৃহীত প্রসাদীপদে এবং ভূকৈলাসের পাণ্ডুলিপি হইতে অতুলবাবুর সংগৃহীত অপ্রকাশিত নূতন প্রসাদ পদাবলীর কুত্রাপি দ্বিজ ভণিতা দেখা যায় না। [২৬]

দ্বিজ ভণিতাযুক্ত পদের অপর বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাদের প্রায় সবগুলিই সংস্কৃত গীতা, পুরাণ ও তন্ত্রাদির প্রভাব একান্তভাবেই বর্জ্জিত ; ইহার উপর ইহাদের ছন্দ ও অলঙ্কারের ঐশ্বর্য্য বর্জ্জিত ভাষার বৈলক্ষণ্যও লক্ষণীয়। এজন্য সাধারণ-ভাবে এগুলি পূর্ব্ববঙ্গের কেবল সাধক রামপ্রসাদের হওয়াই যুক্তি বা অনুমান-সিদ্ধ।

প্রসাদ-প্রসঙ্গকার দয়ালবাবুর উক্তিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

"আমার বোধহয় কবিরঞ্জন সঙ্গীতে নিজে দ্বিজ ভণিতা দেন নাই। তাঁহার গীতগুলি গভীর ভাবাত্মক, কিন্তু দ্বিজ রামপ্রসাদ নামে যে সকল ভণিতা ছিল, সে সকল অপেক্ষাকৃত অনেক লঘুতাপ্রকাশক।"

আবার ভাষাতত্ত্বের বিচারেও কতকগুলি প্রসাদীপদকে পশ্চিমবঙ্গের কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের রচিত বলিয়া স্বস্তির সঙ্গে কোনপ্রকারেই গ্রহণ করা যায় না। কারণ এই জাতীয় কতকগুলি পদে এমন অনেক শব্দের প্রয়োগ আছে, যাহা কোনদিনই পশ্চিমবঙ্গের জীবনে পরিচিত নহে, এবং এগুলিকে পূর্ব্ববঙ্গের গায়কের মুখের প্রক্ষেপও ধরা যাইতে পারে না।

দৃষ্টান্তক্রমে—

'আপন মন মগ্ন হলে মা, পরের কথায় কি হয় তারে

* * *

যদি সে নিরাইতে পারে, অঝরে কাঞ্চন ঝরে ॥'

'রামপ্রসাদ' ১৬১ নং

এই পদাবলীর অন্তর্গত 'নিরাইকরা' পদটি একান্তভাবেই পূর্ব্ববঙ্গের। [২৭]

আবার,

'দেখি মা কেমন করে আমারে ছাড়ায়ে যাবা

* * *

এমন ছাপান ছাপাইব মাগো খুঁজে খুঁজে নাহি পাবা ॥'

'রামপ্রসাদ' ৬৫ নং

এই গীতের অন্তর্গত 'ছাপান ছাপাইব' এই পদ পশ্চিমবঙ্গের জীবনে একেবারেই অপরিচিত। লুকান অর্থে এইরূপ 'ছাপান' শব্দের প্রয়োগ এ দেশের কোন যুগেই চলিত নহে। কাজেই যদিও 'রামপ্রসাদ' রচয়িতা অতুলবাবু লিখিয়াছেন, 'রামপ্রসাদের নামে প্রচলিত কোন কোন পদের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গীয় প্রাদেশিক ভাষার প্রয়োগ দেখিয়া কুমারহট্ট হইতে রামপ্রসাদকে চিনিষপুরে টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করা নিতান্ত মূঢ়তা, এবং তাঁহার গ্রন্থের পূর্ব্বোদ্ধৃত ৬৫ নং গীতের পাদটীকায় লিখিয়াছেন, 'যাবা', 'খাবা', 'পাবা' ইত্যাদি পদ কেবল পূর্ব্ববঙ্গে নয়, পশ্চিমবঙ্গেও প্রচলিত', তথাপি ঐ পদের অন্তর্গত 'ছাপান' শব্দটির এবং ১৬১ নং গীতের 'নিরাই' ও এই জাতীয় পদের তিনি অনুরূপ কোন ব্যাখ্যাই প্রদান করিতে পারেন নাই। এই জাতীয় সঙ্গীতের অনেকগুলি দৃষ্টান্ত সেন ও দ্বিজ রামপ্রসাদের পৃথক ব্যক্তিত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিয়াছি।

অতএব কতকগুলি গীতের এই জাতীয় পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষাবৈলক্ষণ্যও এই পদ-ভেদ নির্ণয়ের মোটামুটি একটি সূত্র ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, গুপ্তকবি সংগৃহীতপদে অথবা অতুলবাবুর সংগৃহীত ভূকৈলাসের পাণ্ডুলিপির পদে কিংবা পুরাণ তন্ত্রাদি সংস্কৃতশাস্ত্র প্রভাবিত এতগুলি প্রসাদীপদের কোথাও এরূপ পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষা বা জীবন ব্যাপারের পরিচয় নাই।

অবশেষে উভয় প্রসাদের জীবনপরিচয়। যদিও দ্বিজ রামপ্রসাদের জীবনের সুষ্ঠু পরিচয় আজও দুর্ল্লভ, তথাপি কবিরঞ্জনের প্রতিষ্ঠিত জীবনবৃত্তান্ত অবলম্বনেই কতকগুলিকে তাঁহার পদাবলী হইতে পৃথক্ না করিয়া উপায় নাই। ইহাদের ভাষা এবং ছন্দও ইহাদিগকে কবিরঞ্জনের বলিয়া সাক্ষ্য দেয় না। ভিন্নরূপ জীবনপরিচয়ের সহিত ভাষা ও ভাবের অপরিপক্কতা বা 'লঘুতায়' এগুলি পূর্ব্ববঙ্গের ভিন্নরূপ প্রসাদীপদ বলিয়াই মনে হয়।

'আমার কপাল গো তারা, ভাল নয় মা,
ভাল নয় মা ভাল নয় মা কোন কালে।
শিশুকালে পিতা মলো মাগো রাজ্য নিল চোরে ॥'

এই পদটিতে দেখা যায়, প্রসাদ শৈশবেই পিতৃহীন এবং অপহৃতরাজ্য। কিন্তু দ্বিজ রামপ্রসাদের জীবন-কাহিনী আমাদের অজানা থাকিলেও কবিরঞ্জন যে শৈশবেই পিতৃহারা নন, একথা দয়াল প্রসাদ ও গুপ্তকবি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তাঁহার জীবন-কাহিনী হইতে সুস্পষ্ট। আবার তাঁহার পিতাও বিশেষ বিষয়সম্পত্তিবান্ ছিলেন, এমন কোন পরিচয়ও নাই। অতএব তাঁহার পক্ষে শৈশবে হৃতরাজ্য হওয়াও কেমন করিয়া সম্ভব?

এইভাবে কাব্যের ভাব, ভাষা ও উভয় কবির জীবনপরিচয় এবং অন্যান্য সকল প্রকার বিচারেই কবিরঞ্জনের পদাবলী হইতে দ্বিজ রামপ্রসাদের পদকে পৃথক না করিয়া উপায় নাই।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের পদাবলী

প্রথম শ্রেণীর গান

(১)

প্রসাদী স্বর—একতালা।

তাই কালরূপ ভালবাসি।
জগ-মন্মোহিনী মা এলোকেশী।
কালোর গুণ ভাল জানে,
শুক শম্ভু দেব-ঋষি।
যিনি দেবের দেব মহাদেব,
কালরূপ তাঁর হৃদয়বাসী॥
কাল বরণ ব্রজের জীবন,
ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী।
হলেন বনমালী কৃষ্ণ-কালী,
বাঁশী ত্যজে করে অসি॥
যতগুলি সঙ্গী মায়ের, তারা সকল একবয়সী
ঐ যে তার মধ্যে কেলে মা মোর,
বিরাজে পূর্ণিমা শশী॥
প্রসাদ ভণে অভেদজ্ঞানে,
কালরূপে মেশা-মিশি।
ওরে একে পাঁচ, পাঁচেই এক,
মন করো না দ্বেষাদ্বেষি॥১

(২)

প্রসাদী সুর—একতালা।

দুঃখের কথা শুন মা তারা।
আমার ঘর ভাল নয় পরাৎপরা॥
যাদের নিয়ে ঘর করি মা,
তাদের এম্নি কাজের ধারা।
ও মা পাঁচের আছে পাঁচ বাসনা,
সুখের ভাগী কেবল তারা॥
অশীতি লক্ষ ঘরে বাস করিয়ে
মানব-ঘরে ফেরা ঘোরা।
এ সংসারেতে সং সাজিয়ে,
সার হলো গো দুঃখের ভরা॥
রামপ্রসাদের কথা লও মা,
এ ঘরে বসতি করা।
ঘরের কর্ত্তা যে জন, স্থির নহে মন,
ছ'জনেতে কল্লে সারা॥২

---

(৩)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা! আমার বড় ভয় হয়েছে।
সেথা জমা-ওয়াশীল দাখিল আছে॥
রিপুর বশে চল্লেম আগে,
ভাবলেম না কি হবে পাছে।
ঐ যে চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত,
যা করেছি তাই লিখেছে॥
জন্মজন্মান্তরের যত,
বকেয়া বাকী জের টেনেছে।
যার যেম্নি কর্ম্ম তেম্নি ফল,
কর্ম্মফলের ফল ফলেছে॥

জমায় কমি খরচ বেশী,
তলব কিসে রাজার কাছে।
ঐ যে রামপ্রসাদের মনের মধ্যে,
কেবল কালী নাম ভরসা আছে ॥৩

(৪)

প্রসাদী সুর—একতালা।
আমি কবে কাশীবাসী হব।
সেই আনন্দ-কাননে গিয়ে,
নিরানন্দ নিবারিব ॥
গঙ্গাজল বিল্বদলে,
বিশ্বেশ্বরনাথে পূজিব।
ঐ বারাণসীর জলে স্থলে,
মোলে পরে মোক্ষ পাব ॥
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী স্বর্ণময়ীর শরণ লব।
আর বব বম্ বম্ ভোলা ব'লে,
নৃত্য ক'রে গাল বাজাব ॥৪

(৫)

প্রসাদী সুর—একতালা।
মন তুমি কি রঙ্গে আছ।
ও মন রঙ্গে আছ রঙ্গে আছ ॥
তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরা ঘোরা,
দুঃখে রোদন সুখে নাচ ॥
রঙের বেলা রাঙে কড়ি,
সোনার দরে তা কিনেছ।
ও মন দুঃখের বেলা রতন মাণিক,
মাটীর দরে তাই বেচেছ ॥

সুখের ঘরে রূপের বাসা,
সেই রূপে মন মজায়েছ।
যখন সে রূপে বিরূপ হবে,
সে রূপের কিরূপ ভেবেছ ॥৫

(৬)

প্রসাদী সুর—একতালা।
ভাল ব্যাপার মন কর্ত্তে এলে।
ভাসিয়ে মানব-তরী কারণ-জলে ॥
বাণিজ্য করিতে এলে, মন ভবনদীর জলে।
ওরে, কেউ করিল দুনো ব্যাপার,
কেহ কেহ বা হারালো মূলে ॥
ক্ষিত্যপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম,
বোঝাই আছে নায়ের খোলে।
ওরে, ছয় দাঁড়ী ছয় দিকে টেনে
গুঁড়ায় পা দে ডুবিয়ে দিলে ॥
পাঁচ জিনিস নে ব্যবসা করা
পাঁচে ডেকে পাঁচে মিলে।
যখন পাঁচে পাঁচ মিশায়ে যাবে,
কি হবে তাই প্রসাদ বলে ॥৬

(৭)

প্রসাদী সুর—একতালা।
কালী কালী বল রসনা রে।
ও মন ষট্‌চক্র রথমধ্যে,
শ্যামা মা মোর বিরাজ করে ॥
তিনটে কাছি কাছাকাছি,
যুক্ত বাঁধা মূলাধারে।

পাঁচ ক্ষমতায় সারথি তায়
রথ চালায় দেশদেশান্তরে ॥
যুড়ি ঘোড়া দৌড় কুচে, দিনেতে দশকুশী মারে।
সে যে সময়-শির নাড়িতে নারে,
কলে বিকল হলে পরে ॥
তীর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ,
মন উচাটন করো না রে।
ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস,
শীতল হবে অন্তঃপুরে ॥
পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে গেলে,
ফেলে রাখবে প্রসাদে রে।
ও মন, এই ত সময়, মিছে কাল যায়,
যত ডাকৃতে পার দু-অক্ষরে ॥৭

(৮)

প্রসাদী সুর—একতালা।
ভূতের বেগার খাটিব কত।
তারা বল আমায় খাটাবি কত ॥
আমি ভাবি এক, হয় আর,
সুখ নাই মা কদাচিত।
পঞ্চ দিকে নিয়ে বেড়ায়,
এ দেহের পঞ্চভূত ॥
ও মা ষড়রিপু সাহায্যে তায়,
হোলো ভূতের অনুগত।
আসিয়া ভব-সংসারে, দুঃখ পেলেম যথোচিত ॥
ও মা যার সুখেতে হব সুখী,
সে মন নয় গো মনের মত ॥

চিনি ব'লে নিম খাওয়ালে,
ঘুচলো নাকো মুখের তিত।
কেন ভিষক্ প্রসাদ, মনে বিষাদ,
হয়ে কালীর শরণাগত ॥৮

(৯)

প্রসাদী সুর—একতালা।

সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না।
ভাল পেয়েছ ভবে কাল বিছানা ॥
এই যে সুখের নিশি,
জেনেছ কি ভোর হবে না।
তোমার কোলেতে কামনা কান্তা,
তারে ছেড়ে পাশ ফের না ॥
আশার চাদর দিয়াছ গায়,
মুখ ঢেকে তাই মুখ খুল না।
আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে,
রজক ঘরে তায় কাচ না ॥
খেয়েছ বিষয় মদ,
সে মদের কি ঘোর ঘোচে না ॥
আছ দিবানিশি মাতাল হয়ে,
ভ্রমেও কালী বল না ॥
অতি মূঢ় প্রসাদ রে তুই,
ঘুমায়ে আশা পূরে না।
তোর ঘুমে মহা-ঘুম আসিবে,
ডাকলে আর চেতন পাবে না ॥৯

(১০)

প্রসাদী স্থর—একতালা।

আমার উমা সামান্যা মেয়ে নয়।
গিরি, তোমারি কুমারী, তা নয় তা নয়॥
স্বপ্নে যা দেখেছি গিরি,
কহিতে মনে বাসি ভয়,
ওহে কার চতুর্ম্মুখ, কার পঞ্চ মুখ,
উমা তাদের মস্তকে রয়॥
রাজরাজেশ্বরী হয়ে, হাস্য-বদনে কথা কয়।
ও কে গরুড়-বাহন-কালো বরণ,
যোড় হাতেতে করে বিনয়॥
প্রসাদ ভণে মুনিগণে,
যোগ-ধ্যানে যাঁরে না পায়।
তুমি গিরি ধন্য, হেন কন্যা,
পেয়েছ কি পুণ্য-উদয়॥১০

(১১)

প্রসাদী স্থর—একতালা।

শমন হে আছি দাঁড়ায়ে।
আমি কালী নামের গণ্ডী দিয়ে॥
কালোপরে কালীপদ, সে পদ হৃদে ভাবিয়ে।
মায়ের অভয় চরণ যে করে স্মরণ,
কি করে তার মরণভয়ে॥১১

(১২)

প্রসাদী স্থর—একতালা।

মা বিরাজে ঘরে ঘরে।
এ কথা ভাঙ্গিব কি হাঁড়ি চাতরে॥
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে শিশু সঙ্গে কুমারীরে॥

যেমন অনুজ লক্ষ্মণ সঙ্গে,
জানকী তার সমিভ্যারে,
জননী তনয়া জায়া, সহোদরা কি অপরে।
রামপ্রসাদ বলে বল্‌ব কি আর,
বুঝে লও গো ঠারে ঠোরে ॥১২

(১৩)

প্রসাদী স্থর—একতালা।
মা আমার খেলান হলো।
খেলা হলো গো আনন্দময়ি ॥
ভবে এলেম কর্ত্তে খেলা, করিলাম ধূলাখেলা,
এখন কাল পেয়ে পাষাণের বালা,
কাল যে নিকটে এলো ॥
বাল্যকালে কত খেলা,
মিছে খেলায় দিন গোঁয়ালো।
পরে জায়ার সঙ্গে লীলা-খেলায়,
অজপা ফুরায়ে গেলো ॥
প্রসাদ বলে বৃদ্ধকালে, অশক্তি কি করি বল
ও মা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়া
মুক্তি-জালে টেনে ফেলো ॥১৩

(১৪)

প্রসাদী স্থর—একতালা।
মন গরিবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা,
যেম্নি নাচাও, তেম্নি নাচে ॥
তুমি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্মকথা বুঝা গেছে।

ও মা তুমি ক্ষিতি তুমি জল,
ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে ॥
তুমি শক্তি তুমি ভক্তি
তুমিই মুক্তি শিব বলেছে ।
ও মা, তুমি দুঃখ তুমিই সুখ
চণ্ডীতে তা লেখা আছে ॥
প্রসাদ বলে কর্ম্মসূত্র,
সে সূতার কাটনা কেটেছে ।
ও মা, মায়াসূত্রে বেঁধে জীব,
ক্ষেপা-ক্ষেপি খেল খেলিছে ॥ ১৪

(১৫)

প্রসাদী সুর—একতালা ।

সামাল ভবে ডুবে তরী ।
তরী ডুবে যায় জনমের মত—
জীর্ণ তরী তুফান ভারি
বাইতে নারি ভয়ে মরি ।
ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু,
এবার এরাই কচ্ছে দাগাদারি ॥
এনেছিলে, বসে খেলে মন,
মহাজনের মূল খোয়ালি ।
যখন হিসাব ক'রে দিতে হবে মন,
তখন তহবিল হবে হারি ॥
দীন রামপ্রসাদ বলে মন,
নীরে বুঝি ডুবায় তরী ।
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর,
আপন ঘরে যায় যে চুরি ॥ ১৫

(১৬)

প্রসাদী স্থর—একতালা।

কে রে বামা কার কামিনী।
ব'সে কমলে ঐ একাকিনী॥
বামা হাস্‌ছে বদনে, নয়ন-কোণে,
নির্গত হয় সৌদামিনী॥
এ জনমে এমন কন্যে,
না দেখি, না কর্ণে শুনি।
গজ খাচ্ছে ধ'রে, ফিরে উগরে,
ষোড়শী নবযৌবনী॥ ১৬

---

(১৭)

প্রসাদী স্থর—একতালা।

পূর্‌লো নাকো মনের আশা।
আমার মনের দুঃখ রৈল মনে॥
দুঃখে দুঃখে কাল কাটালেম,
স্থখের আর কিসে ভরসা।
আমি বল্‌ব কি করুণাময়ী,
সঙ্গে ছয়টা কর্ম্মনাশা॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা ভেবে পাইনে দিশা।
আমি অভয় পদে শরণ নিয়ে,
ঘটল আমার উল্টা দশা॥ ১৭

(১৮)

প্রসাদী স্থর—একতালা

ভবে আর জন্ম হবে না,
হবে না জননী-জঠরে।

ভবানী ভৈরবী শ্যামা, বেদশাস্ত্রে নাইক সীমা,
তারার মহিমা আপনি মাত্র,
জেনেছেন শিব শঙ্করে ॥
আমার মায়ের নাম গান করি,
কত পাপী গেল তরে ।
ও মা কৈলাস গিরি দিব্য পুরী,
দেখাও এবার মা আমারে ॥ ১৮

(১৯)

পিলু-বাহার—যৎ ।

বল ইহার ভাব কি, নয়নে ঝরে জল ;
(গ্রহণে কালীর নাম) ।
তুমি বহুদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ, স্থির ক'রে বল ॥
একটা করি অভিপ্রায়, ডুবা কাষ্ঠ বটে কায়,
কালী-নামাগ্নি রসনায় জ্বলে,
সেই জল ঢল ঢল ।
কাল ভাবি চক্ষু মুদি, নিদ্রা আবির্ভাব যদি,
শিব-শিরে গঙ্গা তারি, প্রবাহ নির্ম্মল ॥
আজ্ঞা করেছেন গুরু, বেণী তীর্থ বটে ভূরু,
গঙ্গা যমুনার ধারার নিতান্ত এই ফল ।
প্রসাদ বলে মন ভাই, এই আমি ভিক্ষা চাই,
বেণীতটে আপন নিকটে দিও স্থল ॥ ১৯

(২০)

মূলতানী—একতালা ।

জননি ! পদপঙ্কজং দেহি শরণাগত জনে,
কৃপাবলোকনে তারিণী ।

তপন-তনয়-ভয়চয়-বারিণী।
প্রণবরূপিণী সারা, কৃপানাথ-দারা তারা,
ভব-পারাবার-তারিণী।
সগুণা নির্গুণা স্থূলা, সূক্ষ্মা, মূলা, হীনমূলা,
মূলাধার-অমলকমল-বাসিনী॥
আগম-নিগমাতীত খিল মাতাখিল পিতা,
পুরুষ-প্রকৃতি-রূপিণী।
হংসরূপে সর্ব্বভূতে, বিহরসি শৈলসুতে,
উৎপত্তি-প্রলয়-স্থিতি ত্রিধাকারিণী॥
সুধাময় দুর্গা নাম, কেবল কৈবল্যধাম,
অজ্ঞানে জড়িত যেই প্রাণী।
তাপত্রয়ে সদা ভজে, হলাহল-কূপে মজে,
ভণে রামপ্রসাদ তার, বিষফল জানি॥ ২০

(২১)

মূলতানী—একতালা।

মন আমার যেতে চায় গো, আনন্দ-কাননে।
বট মনোময়ী, সান্ত্বনা কেন কর না এই মনে॥
শিবকৃত বারাণসী, সেই শিব পদবাসী,
তবু মন ধায় কাশী, রব কেমনে।
অন্নপূর্ণা-রূপ ধর, পঞ্চক্রোশী পদে কর,
নখজালে গঙ্গা মণিকর্ণিকার সনে॥
দ্বিপদে অলক্ত আভা, অসি বরুণার শোভা,
হউক পদারবিন্দে হেরি নয়নে।
প্রসাদ আছে খেদযুক্ত, শাস্ত্র করা উপযুক্ত,
কিবা কাজ অভিযুক্ত পুরী গমনে॥ ২১

(২২)

প্রসাদী সুর—একতালা।

কালী গো কেন লেংটা ফির।
ছি ছি কিছু লজ্জা নাই তোমার
বসন-ভূষণ নাই তোমার মা,
রাজার মেয়ে গৌরব কর।
মা গো এই কি তোমার কুলের ধর্ম্ম,
পতির উপর চরণ ধর॥
আপনি লেংটা. পতি লেংটা, শ্মশানে মশানে চর।
মা গো, আমরা সবে মরি লাজে,
এবার মেয়ে বসন পর॥
ত্যজে রত্নহার মা তোমার,
ও কণ্ঠে শোভে নরশির,
প্রসাদ বলে ঐ রূপে মা,
ভয় পেয়েছেন দিগম্বর॥ ২২

(২৩)

প্রসাদী সুর—একতালা।

হয়েছি মা জোর ফরিয়াদী।
এবার বুঝে বিচার কর শ্যামা,
ঐ যে মন করিছে জামিনদারী,
নেচে উঠে ছটা বাদী॥
অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা,
তারা ছটা কাম আদি।
যদি তুমি আমি এক হই তো,
পুর হতে দূর করে দি॥
বিমাতা মরেন শোকে,
ছয়টায় যদি আমল না দি।

সুখে নিত্যানন্দপুরে থাকি,
পার হয়ে যাই ভবনদী ॥
হুজুরে তজবিজ কর মা,
হাজির ফরিয়াদী দায়ী।
এই স্বোপার্জ্জিত ভজনের ধন
সাধারণ নয় হে তা যদি ॥
মাতা আগ্যা মহাবিগ্যা,
অদ্বিতীয় বাপ অনাদি।
ও যা তোমার পুতে, সতীনসুতে,
জোর করে, কার কাছে কাঁদি।
প্রসাদ ভণে ভরসা মনে
বাপ তো নহেন মিথ্যাবাদী।
ঠেকে বারে বারে খুব চেতেছি,
আর কি ফাঁদে পা দি ॥ ২৩

(২৪)

প্রসাদী সুর—একতালা।

পতিতপাবনী পরা,
পরামৃতফলদায়িনী।
সু-দীনে চরণ-ছায়া, বিতর শঙ্কর-জায়া,
কৃপাং কুরু স্বগুণে মা, নিস্তারকারিণী ॥
কৃতপাপ হীনপুণ্য, বিষয় ভজনা শূন্য,
তারারূপে তারয় মাং, নিখিল জননী।
ত্রাণ হেতু ভবার্ণবে চরণ-তরণী তব,
প্রসাদে প্রসন্না ভব ভবের গৃহিণী ॥ ২৪

(২৫)

জংলা—একতালা।

অপরা জন্মহরা জননী।
অপারে ভবসংসারে এক তরণী ॥
অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব, ভেদ ভাবে শিবা শিব,
উভয়ে অভেদ পরমাত্মস্বরূপিণী।
মায়াতীত নিজে মায়া, উপাসনা হেতু কায়া,
দীনদয়াময়ী বাঞ্ছাধিক ফলদায়িনী ॥
আনন্দ-কাননে ধাম ফল কি তারিণী নাম,
যদি জপে দেহ অন্তে, শিব বলে মানি।
কহিছে প্রসাদ দীন, বিষয় সুক্রিয়া-হীন,
নিজ গুণে তিন লোক তারয় তারিণী ॥ ২৫

(২৬)

জংলা—খয়রা।

কালী হলি মা রাসবিহারী।
নটবর-বেশে বৃন্দাবনে—
পৃথক্ প্রণব নানা লীলা তব,
কে বুঝে এ কথা বিষম ভারী ॥
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা,
আপনি পুরুষ আপনি নারী ;—
ছিল বিবসন কটি, এবে পীত ধটী,
এলো চুল চূড়া বংশীধারী ॥
আগেতে কুটিল নয়ন-অপাঙ্গে,
মোহিত করেছ ত্রিপুরারি।
এবে নিজ কাল, তনু রেখা ভাল,
ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি ॥

ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন-ত্রাস,
এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজকুমারী।
পূর্ব্বে শোণিত-সাগরে নেচেছিলে শ্যামা,
এবে প্রিয় তব যমুনা-বারি ॥
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে,
বুঝেছি জননী মনে বিচারি।
মহাকাল কানু, শ্যাম শ্যামা তনু,
একই সকল বুঝিতে নারি ॥ ২৬

(২৭)

প্রসাদী সুর—একতালা।

কেন গঙ্গাবাসী হব।
ঘরে বসে মায়ের নাম গাইব ॥
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন
পরের রাজ্যে বাস করিব।
কালীর চরণতলে কত শত গয়া গঙ্গা
দেখতে পাব ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, কালীর পদে শরণ লব।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে,
বিমাতাকে মা বলিব ॥ ২৭

---

(২৮)

প্রসাদী সুর—একতালা।

সামাল্ সামাল্ ডুবলো তরী।
আমার মন রে ভোলা, গেল বেলা,
ভজ্‌লে না হরসুন্দরী ॥

প্রবঞ্চনার বিকিকিনি ক'রে
ভরা কৈলে ভারী।
সারা দিন কাটালে ঘাটে ব'সে,
সন্ধ্যাবেলা ধরলে পাড়ী ॥
একে তোর জীর্ণ তরী,
কলুষেতে হল ভারী।
যদি পার হবি মন ভবার্ণবে,
শ্রীনাথে কর কাণ্ডারী ॥
তরঙ্গ দেখিয়া ভারী,
পলাইল ছয়টা দাঁড়ী।
এখন গুরু ব্রহ্ম সার কর মন,
যিনি হন ভব-কাণ্ডারী ॥২৮

(২৯)

প্রসাদী সুর—একতালা।
অসকালে যাব কোথা।
আমি ঘুরে এলেম যথা তথা ॥
দিবা হলো অবসান,
তাই দেখে কাঁপিছে প্রাণ,
তুমি নিরাশ্রয়ে আশ্রয় হয়ে,
স্থান দাও গো জগন্মাতা ॥
শুনেছি শ্রীনাথের কথা, বট চতুর্ব্বর্গদাতা,
রামপ্রসাদ বলে চরণতলে
রাখবে রাখ এই কথা ॥২৯

(৩০)

জংলা—একতালা।
মোরে তরা ব'লে কেন না ডাকিলাম।
আমার এ তনু-তরণী ভব-সাগরে ডুবাইলাম

এ ভব-তরঙ্গে তরী বাণিজ্যে আনিলাম।
তাতে ত্যজিয়া অমূল্য নিধি পাপে পুরাইলাম
বিষম-তরঙ্গ-মাঝে চেয়ে না দেখিলাম।
মন-ডোরে ও চরণ হেলে না বাঁধিলাম॥
প্রসাদ বলে মা গো আমি কি কাজ করিলাম,
আমার তুফানে ডুবিল তরী
আপনি মজিলাম॥৩০

(৩১)

প্রসাদী সুর—একতালা।

পতিতপাবনী তারা।
ও মা কেবল তোমার নামটি সারা॥
ঐ যে তরাসে আকাশে বাস,
বুঝেছি মা কাজের ধারা॥
বশিষ্ঠ চিনিয়াছিল, হাড় ভেঙ্গে শাপ দিল,
তদবধি হইয়াছ ফণী যেন মণিহারা॥
ঠেকেছিলে মুনির ঠাঁই,
কার্য্য কারণ তোমার নাই,
ওয়ায় সয় তর রয় সেইরূপ বর্ণ পারা॥
দশের লাঠি একের বোঝা,
লেগেছে দশের ভার, মনে শুধু চক্ষু ঠারা॥
পাগল বেটার কথায় মজে,
এত কাল মলাম ভজে,
দিয়াছি গোলামী খৎ,
এখন কি আর আছে চারা॥
আমি দিলাম নাকে খৎ, তুমি দেও মা ফারখৎ,
কালায় কালায় দাওয়া ঝুটা,
সাক্ষী তোমার ব্যাটা যারা॥

বসতি ষোড়শ দলে, ব্যক্ত আছে ভূমণ্ডলে,
প্রসাদ বলে কুতূহলে,
তারায় লুকায় তারা ॥৩১

(৩২)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন করো না দ্বেষাদ্বেষি।
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী ॥
আমি বেদাগম পুরাণে,
করিলাম কত খোঁজ-তালাসি।
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম,
সকল আমার এলোকেশী ॥
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।
ও মা রামরূপে ধর ধনু,
কালীরূপে করে অসি ॥
দিগম্বরী দিগম্বর, পিতার চরণবিলাসী
শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুলনিবাসী ॥
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে শিশু সঙ্গে একবয়সী।
যেমন অনুজ ধানুকী সঙ্গে
জানকী পরম রূপসী ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের
কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে,
পদে গঙ্গা গয়া কাশী ॥৩২

(৩৩)

ঝিংলা—একতালা।

মা আমি পাপের আসামী।
এই লোকসানি মহাল লয়ে বেড়াই আমি ॥
পতিতের মধ্যে লেখা যায় এই জমি।
তাই বারে বারে নালিস করি,
দিতে হবে কমী ॥
আমি মলে এ মহলে, আর নাই হামি।
মা গো এখন ভাল না রাখ তো,
থাকুক রামরামি ॥
গঙ্গা যদি গর্ভে টানে, লইল এই ভূমি।
কেবল কথা রবে, কোথা রব,
কোথা রবে তুমি ॥৩৩

(৩৪)

প্রসাদী স্থর—একতালা।

আমি ক্ষেমার খাস তালুকের প্রজা।
ঐ যে ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা ॥
চেনে না আমারে শমন,
চিনলে পরে হবে সোজা।
আমি শ্যামা মার দরবারে থাকি,
অভয় পদের বই রে বোঝা ॥
ক্ষেমার খাসে আছি ব'সে,
নাই মহালে শুকা হাজা।
দেখ বালি চাপা সিকস্ত নদী,
তাতেও মহাল আছে তাজা ॥
প্রসাদ বলে শমন তুমি,
বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা।

ওরে যে পদে ও পদ পেয়েছ,
জান না সেই পদের মজা ॥ ৩৪

(৩৫)

প্রসাদী সুর—একতালা।
তুই যা রে কি করবি শমন,
শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি।
মনবেড়ী তাঁর পায়ে দিয়ে,
হৃদ্-গারদে বসায়েছি ॥
হৃদিপদ্ম প্রকাশিয়ে, সহস্রারে মন রেখেছি।
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে
আমি আমার প্রাণ সঁপেছি ॥
এমনি করেছি কায়দা,
পলাইতে নাইকো ফায়দা,
হামেশ রুজু ভক্তি প্যায়দা,
দুনয়ন দরোয়ান দিয়েছি ॥
মহাজ্বর হবে জেনে, আগে আমি ঠিক করেছি,
তাই সর্ব্বজ্বরহর লৌহ গুরুতত্ত্ব পান করেছি।
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, তোর জারি ভেঙ্গে দিয়েছি,
মুখে কালী কালী কালী, ব'লে,
যাত্রা ক'রে ব'সে আছি ॥৩৫

(৩৬)

প্রসাদী সুর—একতালা।
যা রে শমন যা রে ফিরি।
ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি ॥

পাপ-পুণ্যের বিচারকারী,
তোর যম হয় কালেক্টরি।
আমার পুণ্যের দফা সর্ব্বে শূন্য,
পাপ নিয়ে যা নিলাম করি ॥
শমন-দমন শ্রীনাথচরণ, সর্ব্বদাই হৃদে ধরি
আমার কিসের শঙ্কা, মেরে ডঙ্কা,
চলে যাব কৈলাসপুরী ॥
রামপ্রসাদের মা শঙ্করী,
দেখ না চেয়ে মা ভয়ঙ্করী।
আমার পিতা বটেন শূলপাণি,
ব্রহ্মা বিষ্ণু দ্বারের দ্বারী ॥৩৬

(৩৭)

প্রসাদী সুর—একতালা।
অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি শমনভয় রেখেছি ॥
কালী নাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি।
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে,
দুর্গা নাম কিনে এনেছি।
দেহের মধ্যে সুজন যে জন,
তাঁর ঘরেতে ঘর করেছি।
এবার শমন এলে, হৃদয় খুলে,
দেখাব ভেবে রেখেছি ॥
সারাৎসার তারা নাম,
আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে, দুর্গা ব'লে,
যাত্রা ক'রে বসে আছি ॥৩৭

(৩৮)

প্রসাদী স্থর—একতালা।

ইথে কি আর আপদ্ আছে।

এই যে তারার জমী আমার দেহ-মাঝে

যাতে দেবের দেব স্থকৃষাণ হয়ে,

মহামন্ত্রে বীজ বুনেছে ॥

দৈর্ঘ্য খুঁটা, জন্ম বেড়া, এ দেহের চৌদিক্ ঘেরেছে।

এখন কাল চোরে কি কর্ত্তে পারে,

মহাকাল রক্ষক রয়েছে ॥

দেখে শুনে ছয়টা বলদ,

ঘর হ'তে বাহির হয়েছে।

কালী নাম অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধারে,

পাপ তৃণ সব কেটেছে ॥

প্রেমভক্তি স্থবৃষ্টি তায়, অহর্নিশি বর্ষিতেছে।

কালী কল্পতরুবরে রে ভাই,

(প্রসাদ বলে কালী বৃক্ষে)

চতুর্ব্বর্গ ফল ধরেছে ॥৩৮

(৩৯)

পিলু-বাহার—যৎ

জানিলাম বিষম বড়,

শ্যামা মায়েরি দরবার রে।

সদা ফুকারে ফরিয়াদী বাদী না হয় সঞ্চার রে ॥

আরজ বেগী যার শিরে ॥

সে দরবারের ভাস্ত কি রে,

দেওয়ান যে দেওয়ানা নিজে,

আস্থা কি কথার রে ॥

লাখ উকীল করেছি খাড়া,

সাধ্য কি মা ইহার বাড়া,

তোমায় তারা ডাকে, আমি ডাকি,
কান নাই বুঝি মার রে ॥
গালাগালি দিয়ে বলি,
কান খেয়ে হয়েছে কালী,
রামপ্রসাদ বলে প্রাণ কালী
করিল আমার রে ॥ ৩৯

(৪০)

ঝংলা—একতালা।

মন্ রে পেয়েছ এত ভয়।
ও তুমি কেন রে পেয়েছ এত ভয় ॥
তুফান দেখে ডরো না রে, ও তুফান নয়।
দুর্গা নাম তরণী করে বেয়ে গেলে হয় ॥
পথে যদি চৌকিদারে, তোরে কিছু কয়।
তখন ডেকে বলো আমি শ্যামা মায়েরি তনয় ॥
প্রসাদ বলে ক্ষেপা মন তুই কারে করিস্ ভয়।
আমার এ তনু দক্ষিণার
পদে করেছি বিক্রয় ॥ ৪০

(৪১)

প্রসাদী সুর—একতালা।

বড়াই কর কিসে গো মা,
জানি তোমার আদি মূল, বড়াই কর কিসে ॥
আপনে ক্ষেপা পতি ক্ষেপা ক্ষেপা সহবাসে।
তোমার আদি মূল সকলই জানি,
দাতা কোন্ পুরুষে ॥
মাগী মিন্সে ঝগড়া করে, রৈতে নার বাসে।
মা গো তোমার ভাতার ভিক্ষা করে
ফিরে দেশে দেশে ॥

প্রসাদ বলে মন্দ বলি তোমার বাপের দোষে
মা গো আমার বাপের নাম লইয়ে
বিরাজ কৈলাসে ॥ ৪১

---

(৪২)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা গো আমার কপাল দোষী।
দোষী বটে আনন্দময়ী—
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে,
যেতে নারিলাম বারাণসী।
নৈলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে,
মোর ভাগ্যেতে একাদশী ॥
অন্নত্রাসে প্রাণে মরি নানাবিধ কৃষি করি।
আমার কৃষি সকল নিল জলে,
কেবলমাত্র লাঙ্গল চষি ॥
না করিলাম ধর্ম্মকর্ম্ম
পাপ করেছি রাশি রাশি।
আমি যাবার পথে কাঁটা দিয়ে
পথ ভুলে রয়েছি বসি ॥
জনমি ভারতভূমে মা!
কি কর্ম্ম করিলাম আসি।
আমার এ কূল ও কূল দুকূল গেল,
অকুল পাথারে ভাসি;
শ্রীরামপ্রসাদ বলে ভাবতে নারি দিবানিশি।
ও মা যখন শমন জোর করিবে
দুর্গা নামে দিব ফাঁসি ॥
পরের হরণ পরগমন মনে তখন হাসি খুসী।
সাজাই যখন করে রোদন
প্রসাদ নয়নজলে ভাসি ॥ ৪২

(৪৩)

প্রসাদী সুর—একতালা।

তারা তরী লেগেছে ঘাটে।
যদি পারে যাবি মন আয় রে ছুটে।
তারা নামে পাল খাটায়ে ত্বরায় তরী চল বেয়ে,
যদি পারে যাবি দুখ মিটাবি,
মনের গিরা দে রে কেটে॥
বাজারে বাজার কর মন,
মিছে কেন বেড়াও ছুটে।
ভবের বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'ল
কি করবে আর ভবের হাটে॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, বাঁধ রে বুক এঁটে সেঁটে।
ওরে, এবার আমি ছুটিয়াছি,
ভবের মায়া বেড়ী কেটে॥ ৪৩

(৪৪)

প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার আমি করব কৃষি।
ওগো, এ ভবসংসারে আসি॥
তুমি কৃপাবিন্দু পাত করিয়ে,
ব'সে দেখ রাজমহিষী॥
দেহ জমীর জঙ্গল বেশী,
সাধ্য কি মা সকল চষি।
মা গো যৎকিঞ্চিৎ আবাদ হইলে
আনন্দ-সাগরে ভাসি॥
হৃদয়মধ্যেতে আছে পাপরূপী তৃণরাশি।
তুমি তীক্ষ্ণ কাটারিতে
(কত দুঃখ কাঁটা পায়ে ফোটে)
মুক্ত কর গো মুক্তকেশী॥

কাম আদি ছয়টা বলদ বহিতে পারে অহর্নিশি।
আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে,
শস্য পাব রাশি রাশি ॥
প্রসাদ বলে চাষে বাসে,
মিছে মনে অভিলাষী,
আমার মনের বাসনা তোমার (তারার),
ও রাঙ্গা চরণে মিশি ॥ ৪৪

(৪৫)

ঝংলা—একতালা।

জয় কালী জয় কালী ব'লে জেগে থাক রে মন।
তুমি ঘুম যেয়ো না রে ভোলা মন,
ঘুমেতে হারাবে ধন ॥
নবদ্বার ঘরে সুখে শয্যা ক'রে,
হইবে যখন অচেতন।
তখন আসিবে নিদ, চোরে দিবে সিঁধ,
হরে লবে সব রতন ॥ ৪৫

(৪৬)

সিন্ধু—ঠুংরী।

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে,
তারা বেয়ে পড়বে ধারা ॥
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে,
তারা বলে হব সারা ॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ও রে, শত শত সত্য বেদ,
তারা আমার নিরাকারা ॥

শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্বঘটে,
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে,
তিমিরে তিমিরহারা ॥ ৪৬

(৪৭)

প্রসাদী স্থর—একতালা।

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরুতলে গিয়া,
চারি ফল কুড়ায়ে খাবি॥

তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ও রে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র,
তত্ত্বকথা তায় সুধাবি॥
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন ছুই সতীনে পিরীত হবে,
তখন শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর,
পিতা-মাতায় তাড়ায়ে দিবি।
যদি মোহগর্ত্তে টেনে লয়,
ধৈর্য্য-খুঁটা ধ'রে রবি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম ছুটো অজা তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ
তবে জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূরে হইতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ,
জ্ঞান-সিন্ধুমাঝে ডুবাইবি॥
প্রসাদ বলে এমন হ'লে,
কালের কাছে জবাব দিবি।

তবে বাপু! বাছা! বাপের ঠাকুর,
মনের মতন মন হবি ॥ ৪৭

(৪৮)

প্রসাদী স্থর—একতালা।

আছি তেঁই তরুতলে ব'সে।
মনের আনন্দে আর হরষে ।।
আগে ভাঙ্গাব গাছের পাতা
ডাটিফল ধরিবে শেষে ॥
রাগ দ্বেষ লোভ আদি,
পাঠাব সব বনবাসে।
র'ব রসাভাষে হা প্রত্যাশে ফলিতার্থ সেই রসে ॥
ফলে ফলে স্থফল লয়ে,
যাইব আপন নিবাসে।
আমার বিফলকে ফল দিয়ে,
ফলাফল ভাষাও নৈরাশে ॥
মন কর কি লও রে স্থধা,
ত্বজনাতে মিলে মিশে।
থাবে একই নিশ্বাসে যেন,
স্থর্য্য-তেজে সকল শোষে ॥
রামপ্রসাদ বলে আমার কোষ্ঠী
শুদ্ধ তারাবেশে।
মাগী জানে না যে মন-কপাটে,
খিল দিয়েছি বড় কসে॥ ৪৮

(৪৯)

প্রসাদী সুর—একতালা

আর ভুলালে ভুল্‌ব না গো
আমি অভয় পদ সার করেছি,
ভয়ে হেলব দুল্‌ব না গো ॥
বিষয়ে আসক্ত হয়ে,
বিষের কূপে উল্‌ব না গো ।
সুখ দুঃখ ভেবে সমান
মনের আগুন তুল্‌বো না গো ।
ধনলোভে মত্ত হয়ে
দ্বারে দ্বারে বল্‌বো না গো ।
আশাবায়ুগ্রস্ত হয়ে
মনের কথা খুল্‌ব না গো ।
মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে
প্রেমের গাছে ঝুল্‌বো না গো ।
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি,
ঘোলে মিশে ঘুল্‌ব না গো ॥ ৪৯

---

(৫০)

প্রসাদী সুর—একতালা ।

ছি ছি মন তুই বিষয়-লোভা ।
কিছু জান না, মান না, শুন না কথা ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খুঁটায় বেঁধে থোবা
ওরে জ্ঞান-খড়্গে বলি দান
করিলে কৈবল্য পাবা ॥
কল্যাণকারিণী বিদ্যা, তার ব্যাটার মত লবা ।
ওরে, মায়াসূত্র, ভেদ-সূত্র
তারে দূরে হাঁকায়ে দেবা ॥

আত্মারামের অন্নভোগ, ভুটা সেই মাকে দেবা।
রামপ্রসাদ দাসে কয়,
শেষে ব্রহ্মরসে মিশাইবা ॥ ৫০

(৫১)

প্রসাদী স্থর—একতালা।

মন রে শ্যামা মাকে ডাক।
ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ ॥
পরিহরি ধন-মদ, ভজ পদ কোকনদ,
কালেতে নৈরাশ কর, কথা শুন কথা রাখ ॥
কালী কৃপাময়ী নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
অষ্ট যামের অর্দ্ধ যাম, আনন্দেতে স্থখে থাক
রামপ্রসাদ দাস কয়, রিপু ছয় কর জয়,
মার ডঙ্কা ত্যজ শঙ্কা,
দূর ছাই ক'রে ক'রে হাঁক ॥ ৫১

(৫২)

পিলু বাহার—যৎ।

কালী নাম জপ কর, যাবে কালীর কাছে।
কালী-ভক্ত, জীবন্মুক্ত, যে ভাবে যে আছে ॥
শ্রীনাথ করুণাসিন্ধু, অকিঞ্চন দীনবন্ধু,
দেখালেন কালী-পাদপদ্ম কল্প-গাছে ॥
গৃহে মুক্তি মূর্ত্তিমতী, রসনাগ্রে সরস্বতী,
শিব শিবা, রাত্রি দিবা, রক্ষাহেতু আছে ॥
যোগী ইচ্ছা করে যোগ, গৃহীর বাসনা ভোগ,
মার ইচ্ছা যোগ ভোগ, ভক্ত জনে আছে।

আনন্দে প্রসাদ কয়, কালী কিঙ্করের জয়,
অণিমাদি আজ্ঞাকারী, প'ড়ে থাক্ পাছে ॥ ৫২

(৫৩)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন ভেবেছ তীর্থে যাবে।
কালী-পাদপদ্ম-সুধা ত্যজি
কূপে প'ড়ে আপন খাবে ॥
ভবজরা পাপ রোগ, নীলাচলে নানা ভোগ,
ওরে জ্বরে কাশী সর্ব্বনাশী
ত্রিবেণী স্নানে রোগ বাড়াবে।
কালী নামে মহৌষধি,
ভক্তিভাবে পান বিধি,
ওরে পান কর পান কর
আত্মারামের আত্মা হবে ॥
মৃত্যুঞ্জয়ে উপযুক্ত,
সেবায় হবে আশু মুক্ত,
ওরে সকলি সম্ভবে তাঁতে
পরমাত্মায় মিশাইবে ॥
প্রসাদ বলে মন ভায়া, ছাড়ি কল্পতরু-ছায়া,
ওরে কাঁটাবৃক্ষের তলে গিয়ে
মৃত্যুভয়টা কি এড়াবে ॥ ৫৩

(৫৪)

পিলু বাহার—যৎ

এ শরীরে কাজ কি রে ভাই
দক্ষিণা-প্রেমে না গলে।

এ রসনায় ধিক্ ধিক্
কালী নাম নাহি বলে ॥
কালীরূপ যে না হেরে, পাপ চক্ষু বলি তারে
ওরে সেই দুরন্ত মন, না ডুবে চরণতলে ॥
সে কর্ণে পড়ুক বাজ, থেকে তার কিবা কাজ
ওরে সুধাময় নাম শুনে চক্ষু না ভাসালে জলে
যে করে উদর তরে,
সে করে কি সাধ করে,
ওরে না পূরে অঞ্জলি চন্দন,
জবা আর বিল্বদলে ॥
সে চরণে কাজ কিবা, মিছা শ্রম রাত্রি-দিবা,
ওরে কালীমূর্ত্তি যথা তথা
ইচ্ছা সুখে নাহি চলে ॥
ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার,
রামপ্রসাদ বলে বাবই-গাছে
আম্র কি কখন ফলে ॥ ৫৪

(৫৫)

প্রসাদী সুর—একতালা।
ছি ছি মন ভ্রমরা দিলি বাজী।
কালীপাদপদ্ম-সুধা ত্যজে
বিষয়-বিষে হলি রাজী ॥
দেশে মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ
লোকে তোমায় কয় রাজাজি।
সদা নীচ সঙ্গে থাক তুমি
রাজা বট রীতি পাজি ॥
অহঙ্কারমদে মত্ত বেড়াও যেন কাজির তাজী
তুমি ঠেক্‌বে যখন শিখবে তখন
কর্‌বে কালে পাপোষ বাজি ॥

বাল্য জরা বৃদ্ধ দশা ক্রমে ক্রমে হয় গতাজি
পড়ে চেরের কোঠায় মন টুটায়
যে ভজে সে মত্ত গাঁজি ॥
কুতূহলে প্রসাদ বলে
জরা এলে আস্‌বে হাজী।
যখন দণ্ডপাণি লবে টানি
কি করিবে ও বাবাজি ॥ ৫৫

(৫৬)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে ভালবাস তাঁরে।
যে ভবসিন্ধুপারে তারে ॥
এই কর ধার্য্য কিবা কার্য্য অসার পসারে,
ধনে জনে আশা বৃথা, বিস্মৃত সে পূর্ব্বকথা,
তুমি ছিলে কোথা এলে কোথা
যাবে কোথাকারে ॥
সংসারে কেবল কাচ, কুহকে নাচায় নাচ,
মায়াবিনী কোলে আছ প'ড়ে কারাগারে ॥
অহঙ্কার দ্বেষ রাগ, অনুকূলে অনুরাগ,
দেহ রাজ্য দিলে ভাগ বল কি বিচারে ॥
যা করেছ চারা কিবা, প্রায় অবসান দিবা,
মণিদ্বীপে ভাব শিবা সদা শিবাগারে ॥
প্রসাদ বলে দুর্গানাম, সুধাময় মোক্ষধাম,
জপ কর অবিরাম সুধাও রসনারে ॥ ৫৬

(৫৭)

প্রসাদী সুর—একতালা।

তারা আর কি ক্ষতি হবে।
হাদে গো জননী শিবে।

তুমি লবে লবে বড়ই লবে
প্রাণকে আমার লবে ॥
থাকে থাক, যায় যাক্‌, এ প্রাণ যায় যাবে
যদি অভয় পদে মন থাকে তো
কাজ কি আমার ভবে ॥
বাড়ায়ে তরঙ্গ রঙ্গ আর কি দেখাও শিবে।
এ কি পেয়েছ আনাড়ী দাঁড়ি তুফানে ডরাবে
আপনি যদি আপন তরী ডুবাই ভবার্ণবে।
আমি ডুব দিয়ে জল খাব তবু অভয়পদে ডুবে ॥
গিয়েছি না যেতে আছি আর কি পাবে ভবে ॥
আমি কাঠের মুরাদ খাঁড়া মাত্র গণনাতে সবে।
প্রসাদ বলে আমি গেলে, তুমি ত মা রবে।
তখন আমি ভাল কি তুমি ভাল,
তুমিই বিচারিবে ॥৫৭

(৫৮)

জংলা—একতালা।

আমার অন্তরে আনন্দময়ী
সদা করিতেছেন কেলি।
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি,
নামটি কভু নাহি ভুলি ॥
আমার দু আঁখি মুদিলে দেখি,
অন্তরেতে মুণ্ডমালী।
বিষয়বুদ্ধি হইল হত,
আমায় পাগল বোল বলে সকলি ॥
আমায় যা বলে বলুক তারা,
অন্তে যেন পাই পাগলী।

শ্রীরামপ্রসাদে বলে, মা বিরাজে শতদলে,
আমি শরণ নিলাম চরণতলে,
অন্তে না ফেলিও ঠেলি ॥ ৫৮

(৫৯)

প্রসাদী স্থর—একতালা।

আমায় কি ধন দিবি তোর কি ধন আছে।
তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদপদ্ম,
বাঁধা আছে হরের কাছে ॥
ও চরণ উদ্ধারের মা,
আর কি কোন উপায় আছে।
এখন প্রাণপণে খালাস কর,
টাটে বা ডুবায় পাছে ॥
যদি বল অমূল্য পদ,
মূল্য আবার কি তার আছে।
ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে,
শিব বাঁধা রাখিয়াছে ॥
বাপের ধনে বেটার স্বত্ব,
কাহার বা কোথা ঘুচেছে।
রামপ্রসাদ বলে, কুপুত্র ব'লে,
আমায় নিরাশী করেছে ॥ ৫৯

(৬০)

প্রসাদী স্থর—একতালা।

কাজ কি মা সামান্ত ধনে।
ও কে কাঁদ্‌ছে তোর ধন বিহনে।
সামান্ত ধন দিবে তারা,
প'ড়ে রবে ঘরের কোণে।

যদি দেও মা আমায় অভয় চরণ,
রাখি হৃদি পদ্মাসনে ॥
গুরু আমায় কৃপা ক'রে মা,
যে ধন দিলে কানে কানে।
এমন গুরু-আরাধিত মন্ত্র,
তাও হারালেম সাধন বিনে॥
প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা হবে
তোমার নিজ গুণে।
আমি অন্তিম কালে জয় দুর্গা ব'লে,
স্থান পাই যেন ঐ চরণে ॥ ৬০

---

(৬১)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মায়ের এম্নি বিচার বটে।
যে জন দিবানিশি দুর্গা বলে,
তারি কপালে বিপদ্ ঘটে ॥
হুজুরেতে আরজি দিয়ে মা,
দাঁড়াইয়ে আছি করপুটে।
কবে আদালত শুনানী হবে মা,
নিস্তার হবে মা এ সঙ্কটে ॥
সওয়ালজবাব কর্‌ব কি মা,
বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে।
ও মা ভরসা কেবল শিববাক্য
ঐক্য বেদাগমে রটে ॥
প্রসাদ বলে শমনভয়ে মা,
ইচ্ছা হয় যে পালাই ছুটে।
যেন অন্তিমকালে দুর্গা বলে,
প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে ॥ ৬১

(৬২)

প্রসাদী সুর—একতালা।

দীন-দয়াময়ী কি হবে শিবে।
বড় নিশ্চিন্তে রয়েছ তোমার
পতিত তনয় ডুবল ভবে॥
এ ঘাটে তরণী নাইকো
কিসে পার হব মা ভবে।
মা তোর দুর্গা নামে কলঙ্ক রবে মা,
নইলে খালাস কর তবে॥
ডাকি পুনঃপুনঃ, শুনিয়া না শুন,
পিতৃ-ধর্ম্ম রাখলে ভবে॥
অতি প্রাতঃকালে জয়দুর্গা ব'লে
শরণ নিবার কাজ কি তবে॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা মোর
ক্ষতি কিছু না হবে।
মা তোর কাশী মোক্ষধাম অন্নপূর্ণা নাম
জগজ্জনে নাম নাহি লবে॥ ৬২

(৬৩)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন তুমি দেখ রে ভেবে।
ওরে আজি অব্দ শতান্তে বা
অবশ্য মরিতে হবে
ভবঘোরে রয়ে রে মন ভাবলিনে ভবানীভবে
সদা ভাব সেই ভবানী-পদ
যদি ভবপারে যাবে॥ ৬৩

(৬৪)

প্রসাদী সুর—একতালা।

জয়কালী জয়কালী বল।
লোকে বলে বল্‌বে পাগল হলো॥
লোকে মন্দ বলে বল্‌বে,
তায় কিরে তোর বয়ে গেল।
আছে ভাল মন্দ দুটো কথা,
যা ভাল তাই করা ভাল॥
কালী নামের খড়্গ তুলে মায়া-মোহ কেটে ফেল।
ক'রে মিছা মায়ায় টানাটানি রামপ্রসাদের প্রমাদ হলো॥ ৬৪

(৬৫)

ইমন—একতালা।

কাজ কি আমার কাশী।
যাঁর কৃত কাশী, তত্ত্বরসি বিগলিতকেশী॥
সেই জগদম্বার কুণ্ডল, পড়েছিল খসি।
সেই হতে মণিকর্ণি ব'লে তারে ঘুষি॥
অসি বরুণার মধ্যে তীর্থ বারাণসী।
মায়ের করুণা বরুণা ধারা, অসিধারা অসি॥
কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্বমসি।
ওরে তত্ত্বমসির উপরে সেই মহেশ-মহিষী॥
রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভাল ত না বাসি
ঐ যে গলাতে বেঁধেছ আমার
কালী মায়ের ফাঁসী॥ ৬৫

(৬৬)

প্রসাদী স্থর—একতালা।

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি।
(ভব-সংসারে বাজারের মাঝে)
ঐ যে মন ঘুড়ি, আশা বায়ু,
বাঁধা তাহে মায়া দড়ি ॥
কাক গণ্ডী মণ্ডি গাঁথা, তাতে পঞ্জরাদি নাড়ী।
ঘুড়ি স্বগুণে নির্ম্মাণ করা,
কারিগরি বাড়াবাড়ি ॥
বিষয়ে মেজেছে মাজা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।
ঘুড়ি লক্ষে দুটা একটা কাটে,
হেসে দেও মা হাত চাপড়ি ॥
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি
ভবসংসার সমুদ্র পারে,
পড়বে ধেয়ে তাড়াতাড়ি ॥ ৬৬

---

(৬৭)

প্রসাদী স্থর—একতালা।

এই দেখ সব মাগীর খেলা।
মাগীর আপ্ত ভাবে গুপ্ত লীলা ॥
সগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ,
ডেলা দিয়া ভাঙ্গে ডেলা।
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজি,
নারাজ হয় সে কাজের বেলা।
প্রসাদ বলে থাক ব'সে,
ভবার্ণবে ভাসাইয়া ভেলা।
যখন জোয়ার আসবে উজায়ে যাবে,
ভাটিয়া যাবে ভাটার বেলা ॥ ৬৭

(৬৮)

প্রসাদী সুর—একতালা।

সে কি সুধু শিবের সতী।
যারে কালের কাল করে প্রণতি॥
ষট্‌চক্রে চক্র করি, কমলে করে বসতি॥
সে যে সর্ব্বদলের দল-পতি
সহস্রদলে করে স্থিতি॥
নেঙ্গটা বেশে শত্রু নাশে,
মহাকাল-হৃদয়ে স্থিতি।
ওরে বল দেখি মন সে বা কেমন,
নাথের বুকে মারে নাথি॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা,
সকলি জানি ডাকাতি।
ওরে সাবধানে মন কর যতন,
হবে তোমার শুদ্ধ মতি॥ ৬৮

৬৯)

প্রসাদী সুর—একতালা।

শমন আসার পথ ঘুচেছে।
আমার মনের সন্ধ দূরে গেছে॥
ওরে আমার ঘরের নবদ্বারে,
চারি শিব চৌকী রয়েছে॥
এক খুঁটিতে ঘর রয়েছে,
তিন রজ্জুতে বাঁধা আছে।
সহস্রদলকমলে শ্রীনাথ,
অভয় দিয়ে ব'সে আছে॥
দ্বারে আছে শক্তি বাঁধা,
চৌকিদারী ভার লয়েছে।

সে শক্তির জোরে চেতন ক'রে,
তাইতে প্রাণ নির্ভয়ে আছে ॥
মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে কণ্ঠমূলে ভুরুমাঝে।
এ চারিস্থানে চারি শিব,
নবদ্বারে চৌকি আছে ॥
রামপ্রসাদ বলে এই ঘরে
চন্দ্র সূর্য্য উদয় আছে।
ওরে তমো নাশ করি তারা
হৃদ্‌মন্দিরে বিরাজিছে ॥ ৬৯

(৭০)

প্রসাদী সুর—একতালা।

ভাব কি ? ভেবে পরাণ গেল।
যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল,
তার কেন কালরূপ হ'ল !
কাল বড় অনেক আছে এ বড় আশ্চর্য্য কালো।
যাকে হৃদয়মাঝে রাখিলে,
হৃদয়-পদ্ম করে আলো ॥
রূপে কালী নামে কালী
কাল হইতে অধিক কালো।
ও রূপ যে দেখেছে সেই মজেছে,
অন্যরূপ লাগে না ভালো ॥
প্রসাদ বলে কুতূহলে,
এমন মেয়ে কোথায় ছিল।
না দেখে নাম শুনে কানে
মন গিয়া তায় লিপ্ত হলো ॥৭০

(৭১)

জংলা—একতালা।

আমি কি এমতি রব (মা তারা)
আমার কি হবে গো দীন-দয়াময়ী ॥
আমি ক্রিয়াহীন, ভজন-বিহীন,
দীন-হীন অসম্ভব ॥
আমার অসম্ভব আশা পূরাবে কি তুমি,
আমি কি ও পদ পাব (মা তারা) ॥
সুপুত্র কুপুত্র যে হই সে হই,
চরণে বিদিত সব।
কুপুত্র হইলে, জননী কি ফেলে,
এ কথা কাহারে কব ॥
(মা তারা)
প্রসাদ কহিছে তারা ছাড়া,
নাম কি আছে যে আর তা লব।
তুমি তরাইতে পার তেঁই সে তারিণী,
নামটি রেখেছেন ভব (মা তারা) ॥৭১

(৭২)

ঝিঁঝিট—একতালা।

দিবানিশি ভাব রে মন, অন্তরে করালবদনা।
নীল-কাদম্বিনী রূপ মায়ের,
এলোকেশী দিগ্‌বসনা ॥
মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে, মন জান না।
সদা পদ্মবনে হংসীরূপে, আনন্দরসে মগনা ॥
আনন্দে আনন্দময়ী, হৃদয়ে কর স্থাপনা।
জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন, ব্রহ্মময়ীরূপ দেখ না ॥

প্রসাদ বলে ভক্তের আশা,
পুরাইতে অধিক বাসনা।
সাকারে সাযুজ্য হবে,
নির্ব্বাণে কি গুণ বলনা ॥৭২

(৭৩)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন যদি মোর ঔষধ খাবা।
আছে শ্রীনাথ-দত্ত, পটল-সত্ত্ব,
মধ্যে মধ্যে ঐটি চাবা॥
সৌভাগ্য কর রে দূর্‌রে,
মৃত্যুঞ্জয়ের কর সেবা।
রামপ্রসাদ বলে তবেই সে মন,
ভব-রোগে মুক্ত হবা॥ ৭৩

(৭৪)

ঝংলা—একতালা।

সে কি এমনই মেয়ের মেয়ে।
যার নাম জপিয়া মহেশ বাঁচেন হলাহল খেয়ে
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করে, কটাক্ষে হেরিয়ে।
সে যে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পূরিয়ে॥
যে চরণে শরণ ল'য়ে, দেবতা বাঁচে দায়ে।
দেবের দেব মহাদেব, যাঁহার চরণে লুটায়ে॥
প্রসাদ বলে রণে চলে রণময়ী হ'য়ে।
শুম্ভ নিশুম্ভকে বধে হুঙ্কার ছাড়িয়ে॥ ৭৪

(৭৫)

গাড়া-ভৈরবী—যৎ।

ভেবে দেখ মন কেউ কার নয়,
মিছে ফের ভূমণ্ডলে।
দিন দুই তিনের জন্য ভবে,
কর্ত্তা ব'লে সবাই বলে॥
আবার সে কর্ত্তারে দিবে ফেলে,
কালাকালের কর্ত্তা এলে॥
যার জন্যে মর ভেবে সে কি সঙ্গে যাবে চলে।
সেই প্রেয়সী দিবে গোবর ছড়া,
অমঙ্গল হবে ব'লে॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, শমন যখন ধর্‌বে চুলে।
তখন ডাক্‌বি কালী কালী ব'লে,
কি করিতে পার্‌বে কালে॥ ৭৫

---

(৭৬)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন হারালি কাজের গোড়া।
তুমি দিবানিশি ভাব বসি,
কোথায় পাব টাকার তোড়া॥
চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র,
শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া॥
তুই কাঁচমূল্যে কাঞ্চন বিকালি
ছি ছি মন তোর কপাল-পোড়া॥
কর্ম্ম-সূত্রে যা আছে মন,
কেবা পাবে তার বাড়া।
মিছে এ দেশ সে দেশ ক'রে বেড়াও,
বিধির লিপি কপাল জোড়া॥

কাল করিছে হৃদয়ে বাস,
বাড়্ছে যেন শালের কোঁড়া।
ওরে সেই কালের কর বিনাশ,
ন্যাস ধররে মন্ত্র সোঁড়া॥
প্রসাদ বলে ভাবছ কি মন,
পাঁচ শোয়ারের তুমি ঘোড়া।
সেই পাঁচের আছে পাঁচা পাঁচি,
তোমায় কর্‌বে তোলা পাড়া॥ ৭৬

(৭৭)

খাম্বাজ—একতালা।

যদি ডুবলো না ডুবায়ে বা ওরে মন-নেয়ে।
মন হালি ছেড় না ভরসা বাঁধ
পার্‌বি যেতে বেয়ে॥
মন! চক্ষু দাঁড়ি বিষম হাড়ি,
মজায় মজে চেয়ে।
ভাল ফাঁদ পেতেছে শ্যামা বাজিকরের মেয়ে
মন! শ্রদ্ধা-বায়ে ভক্তি-বাদাম,
দেও রে উড়াইয়ে।
রামপ্রসাদ বলে কালী নামের
যাও রে সারি গেয়ে॥ ৭৭

(৭৮)

গৌরী—একতালা।

জগত-জননী তরাও গো তারা।
জগৎকে তরালে, আমাকে ডুবালে,
আমি কি জগৎ-ছাড়া গো তারা॥

দিবা অবসানে রজনী-কালে,
দিয়েছি সাঁতার শ্রীদুর্গা ব'লে,
মম জীর্ণ তরী মা আছ কাণ্ডারী,
তবু ডুবিল ডুবিল ডুবিল ভরা ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে ভাবিয়ে সারা,
মা হয়ে পাঠাইলে মাসীর পাড়া।
কোথা গিয়েছিলে এ ধর্ম্ম শিখিলে,
মা হয়ে সন্তান ছাড়া গো তারা ॥ ৭৮

---

(৭৯)

প্রসাদীসুর—একতালা।

মুক্ত কর মা মুক্তকেশী।
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি ॥
কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা,
ভুলেছ কি রাজ-মহিষী।
তারা, কত দিনে কাট্‌বে আমার,
এ দুরন্ত কালের ফাঁসি।
প্রসাদ বলে কি ফল হবে
হই যদি গো কাশীবাসী।
ঐ যে বিমাতাকে মাথায় ধ'রে,
পিতা হলেন শ্মশানবাসী ॥ ৭৯

(৮০)

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমি নয় পলাতক আসামী।
ও মা কি ভয়, আমায় দেখাও তুমি
বাজে জমা পাওনি যে মা,
ছাটে জমি আছে কমি।

আমি মহা মন্ত্র মোহর করা,
কবচ রাখি সাল তামামি ॥
আমি মায়ের খাসে আছি ব'সে,
আসল কসে সারে জমি।
এবার তোমার নামের জোরে, থাক্‌বো ধরে,
নিষ্কর করে লব ভূমি ॥
প্রসাদ বলে খাজনা বাকী,
নাইকো রাখি কড়া কমি।
যদি ডুবাও দুঃখ-সিন্ধু-মাঝে,
ডুবেও পদে হব হামি ॥ ৮০

(৮১)

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমক্‌হারাম নই শঙ্করী ॥
পদ-রত্নভাণ্ডার সবাই লুটে,
ইহা আমি সইতে নারি ॥
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা,
সে যে ভোলা ত্রিপুরারি ॥
শিব আশুতোষ স্বভাব-দাতা,
তবু জিম্মা রাখ তাঁরি।
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির, তবু শিবের মাইনে ভারী
আমি বিনা মাইনার চাকর,
কেবল চরণধূলার অধিকারী ॥
যদি তোমার বাপের ধারা ধর
তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তো মা
পেতে পারি ॥

প্রসাদ বলে এমন পদের,
বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাই তো,
সে পদ ল'য়ে বিপদ সারি ॥ ৮১

(৮২)

প্রসাদী সুর—একতালা।

ডুব দে মন কালী ব'লে।
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দুচার ডুবে ধন না পেলে
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও
কুলকুণ্ডলিনীর কূলে ॥
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন,
শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি ক'রে কুড়ায়ে পাবে,
শিব-যুক্তি মতন চাইলে ॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে,
আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক-হলদি গায়ে মেখে যাও,
ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে ॥
রতন-মাণিক্য কত,
পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে, ঝম্প দিলে,
মিলবে রতন ফলে ফলে ॥ ৮২

(৮৩)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন কেন রে ভাবিস্ এত
যেমন মাতৃহীন বালকের মত।
ভবে এসে ভাবছো ব'সে,
কালের ভয়ে হয়ে ভীত।
ওরে, কালের কাল মহাকাল,
সে কাল মায়ের পদানত॥
ফণী হয়ে ভেকেরে ভয়, এ যে বড় অদ্ভুত।
ওরে তুই করিস্ কি কালের ভয়,
হয়ে ব্রহ্মময়ী-সুত॥
এ কি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই,
হলি রে পাগলের মত।
ও মন, মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী,
কার ভয়ে সে হয় রে ভীত॥
মিছে কেন ভাব দুঃখে,
দুর্গা বল অবিরত।
যেমন জাগরণে ভয়ং নাস্তি,
হবে রে তোর তেম্নি মত॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে,
মন কর রে মনের মত।
ও মন গুরুদত্ত তত্ত্ব ধর,
কি করিবে রবিসুত॥ ৮৩

(৮৪)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা আমায় ঘুরাবে কত?
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত॥

ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা,
পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়,
ছ'টা কলুর অনুগত ॥
আশীলক্ষ যোনি ভ্রমি,
পশু-পক্ষী আদি যত।
তবু গর্ভধারণ নয় নিবারণ,
যাতনাতে হলেম হত ॥
মা শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত,
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা,
আমি কি ছাড়া জগত ॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে চক্ষের ঠুলি
দেখি শ্রীপদ মনের মত ॥
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন ত।
রামপ্রসাদের এই আশা, মা,
অন্তে থাকি পদানত ॥ ৮৪

---

(৮৫)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মর্‌লেম ভূতের বেগার খেটে।
আমার কিছু সম্বল নাইক গেঁটে।
নিজে হই সরকারী মুটে,
মিছে মরি বেগার খেটে।
আমি দিনমজুরি নিত্য করি,
পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে ॥
পঞ্চভূত ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে।
তারা কারো কথা কেউ শুনে না,
দিন তো আমার গেল ঘেঁটে ॥

যেমন অন্ধ জনে হারা দণ্ড,
পুন পেলে ধরে এঁটে।
আমি তেম্নি মত ধর্ত্তে চাই মা,
কর্ম্ম দোষে যায় গো ছুটে॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী, কর্ম্মডুরি দে না কেটে!
প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা,
যেন ব্রহ্মরন্ধ্র যায় গো ফেটে॥ ৮৫

(৮৬)

জংলা—একতালা।

আর কাজ কি আমার কাশী?
মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়া গঙ্গা বারাণসী॥
হৃৎকমলে ধ্যানকালে, আনন্দ-সাগরে ভাসি।
ওরে কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি॥
কালী নামে পাপ কোথা,
মাথা নাই তার মাথাব্যথা,
ওরে অনলে দাহন যথা, হয় রে তূলারাশি॥
গয়ায় করে পিণ্ড দান, বলে পিতৃঋণে পাবে ত্রাণ,
ওরে যে করে কালীর ধ্যান,
তার গয়া শুনে হাসি॥
কাশীতে মোলেই মুক্তি,
এ বটে শিবের উক্তি,
ওরে সকলের মূল ভক্তি,
মুক্তি হয় মন তার দাসী॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন,
চিনি খেতে ভালবাসি॥

কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে,
ওরে চতুর্ব্বর্গ করতলে,
ভাবিলে রে এলোকেশী ॥ ৮৬

(৮৭)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন্ রইলো পতিত,
আবাদ করলে ফল্‌তো সোনা ॥
কালীর নামে দেও রে বেড়া,
ফসলে তছরুপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর (মন রে আমার) শক্ত বেড়া,
তার কাছেতে যম ঘেঁসে না ॥
অদ্য অব্দ-শতান্তে বা বাজেয়াপ্ত হবে জান না।
এখন আপন ভেবে,
(মন রে আমার) যতন ক'রে
চুটিয়ে ফসল কেটে নে না ॥
গুরু রোপণ করেছেন বীজ,
ভক্তি-বারি তায় সেঁচ না।
ওরে একা যদি (মন রে আমার)
না পারিস্ মন,
রামপ্রসাদকে ডেকে নে না ॥ ৮৭

(৮৮)

প্রসাদী সুর—একতালা।

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করি হেথা ॥

নমস্তৎকর্ম্মভ্যো ব'লে, চলে যাব যথা তথা।
আমি সাধু সঙ্গে নানারঙ্গে,
দূর করিব মনের ব্যথা॥
তুমি গো পাষাণের সুতা,
আমার যেম্নি পিতা তেম্নি মাতা।
রামপ্রসাদ বলে, হৃদিস্থলে,
গুরুতত্ত্ব রাখ গাঁথা॥ ৮৮

---

(৮৯)

প্রসাদী সুর—একতালা।

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করি হেথা॥
মার সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা তথা।
যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে,
এমন বাপের ভরসা বৃথা॥
তুমি না করিলে কৃপা, যাব কি বিমাতা যথা।
যদি বিমাতা আমায় করেন কোলে,
দেখা নাই আর হেথা সেথা॥
প্রসাদ বলে এই কথা, বেদাগমে আছে গাঁথা।
ও মা যে জন তোমার নাম করে,
তার হাড় মালা আর ঝুলি কাঁথা॥ ৮৯

---

(৯০)

প্রসাদী সুর—একতালা।

ভাব না কালী ভাবনা কিবা।
পরে মোহ-ময়ী রাত্রি গতা,
সংপ্রতি প্রকাশে দিবা॥
অরুণ-উদয় কাল, ঘুচিল তিমির জাল,
ওরে কমলে-কমল ভাল প্রকাশ করিলা শিবা॥

বেদে দিলে চক্ষে ধূলা, ষড়দর্শনের সেই অন্ধগুলা,
ওরে না চিনিল জ্যেষ্ঠামূলা,
খেলাধূলা কে ভাঙ্গিবা ॥
যেখানে আনন্দ হাট, গুরু শিষ্য নাস্তি পাঠ,
ওরে যার নেটো তার নাট,
তত্ত্বে তত্ত্ব কে পাইবা।
যে রসিক ভক্ত শূর, সে প্রবেশে সেই পুর
রামপ্রসাদ বলে ভাঙলো ভোর,
আগুন বেঁধে কে রাখিবা ॥ ৯০

(৯১)

ললিত-বিভাস—একতালা।

কেবল আশার আশা, ভবে আসা
আশা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে র'লো ॥
মা, নিম খাওয়ালে চিনি ব'লে,
কথায় ক'রে ছলো।
ও মা! মিঠার লোভে তিত মুখে,
সারা দিনটা গেলো ॥
মা, খেল্‌বি বলে ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলে।
এবার যে খেলা খেলালে মা গো,
আশা না পূরিলো ॥
রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায়,
যা হবার তাই হলো।
এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে,
ঘরে নিয়ে চলো ॥ ৯১

(৯২)

প্রসাদী সুর—একতালা।

গেল দিন মিছে রঙ্গ-রসে।
আমি কাজ হারালেম কালের বশে॥
যখন ধন উপার্জ্জন, করেছিলেম দেশ-বিদেশে।
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত,
সবাই ছিল আমার বশে,
এখন ধন উপার্জ্জন, না হইল দশার শেষে।
সেই ভাই বন্ধু দারা সুত,
নির্ধন ব'লে সবাই রোষে॥
যমদূত আসি শিয়রেতে বসি ধর্‌বে যখন অগ্রকেশে,
তখন সাজায়ে মাচা, কলসী কাচা,
বিদায় দিবে দণ্ডি বেশে॥
হরি হরি বলি শ্মশানে ফেলি,
যে যার যাবে আপন বাসে।
রামপ্রসাদ মলো, কান্না গেল,
অন্ন খাবে অনায়াসে॥ ৯২

(৯৩)

পিলুবাহার—যৎ।

ভবে আশা খেল্‌ব পাশা,
বড়ই আশা মনে ছিল।
মিছে আসা ভাঙ্গা দশা
প্রথমে পঞ্জুড়ি পলো॥
পোবার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলেম ভাল।
শেষে কচে বার পেয়ে মা গো,
পাঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হলো॥

ছ দুই আট, ছ চার দশ, কেহ নয় মা আমার বশ,
আমার খেলাতে না হলো যশ,
এবার বাজী ভোর হইল।
হদ্দ হলো চোদ্দ পোয়া বদ্ধ পথে যায় না যাওয়া,
রামপ্রসাদের বুদ্ধিদোষে পেকেও ফিরে কেঁচে এল ॥ ৯৩

---

(৯৪)

প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার বাজী ভোর হলো।
মন কি খেলা খেলাবে বল ॥
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ পঞ্চে আমায় দাগা দিল।
এবার বড়ের ঘরে ভর ক'রে
মন্ত্রীটি বিপাকে মলো ॥
দুটা অশ্ব দুটা গজ ঘরে ব'সে কাল কাটালো।
তারা চল্‌তে পারে সকল ঘরে,
তবে কেন অচল হলো ॥
দুখান তরী নিমক ভরি বাদাম তুলি না চলিল,
ওরে এমন সুবাতাস পেয়ে
ঘাটের তরী ঘাটে র'লো ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মোর কপালে অবশেষে এই কি ছিল।
ওরে অতঃপরে কোণের ঘরে
পিলের কিস্তি মাত হইল ॥ ৯৪

(৯৫)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন করো না সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা ॥

হয়ে ধর্ম্ম-তনয়, ত্যজে আলয়,
বনে গমন হেরে পাশা।
হয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক
তেঁইতো শিবের দৈন্যদশা॥
সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে,
মন সুখের আশে বড় কসা।
হরিষে বিষাদ আছে মন,
করো না এ কথায় গোসা॥
ওরে সুখেই দুখ, দুখেই সুখ,
ডাকের কথা আছে ভাষা।
মন ভেবেছ কপট ভক্তি,
ক'বে পুরাইবে আশা॥
লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া
এড়াবে না রতি মাষা।
প্রসাদের মন হও যদি ঘন
কর্ম্মে কেন রও রে চাষা॥
ওরে মনের মতন কর যতন,
রতন পাবে অতি খাসা॥ ৯৫

(৯৬)

বিভাস—ঝাঁপতাল।

তাই বলি মন জেগে থাক,
পাছে আছে রে কাল চোর।
কালী নামের অসি ধর,
তারা নামের ঢাল,
ওরে সাধ্য কি শমনে তোরে
কর্‌তে পারে জোর॥

কালী নামে নহবৎ বাজে করি মহা সোর।
ওরে, শ্রীদুর্গা বলিয়া রে রজনী কর ভোর॥
কালী যদি না তরাবে কলি মহা ঘোর।
কত মহাপাপী তরে গেল,
রামপ্রসাদ কি চোর॥ ৯৬

(৯৭)

মা গো তারা ও শঙ্করী।
কোন্ অবিচারে আমার পরে,
কর্‌লে দুঃখের ডিক্রী জারী॥
এক আসামী ছয়টা প্যায়দা,
বল মা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে ঐ ছ'টারে,
বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি॥
প্যায়দার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র,
তার নামেতে নিলাম জারি।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি,
তারে দিলে জমিদারী॥
হুজুরে দরখাস্ত দিতে,
কোথা পাব টাকা কড়ি।
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে,
ব'সে আছ রাজকুমারী॥
হুজুরে উকীল যে জনা,
ডিসমিসে তার আশয় ভারি।
ক'রে আসল সন্দি, সওয়াল বন্দী,
যেরূপে মা আমি হারি॥

পলাইতে স্থান নাই মা,
বল কিবা উপায় করি।
ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ,
তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি॥ ৯৭

(৯৮)

প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীন-দয়াময়ি)
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার।
গণ্ডযোগে জনমিলে,
সে হয় যে মা-খেকো ছেলে,
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা,
দুইটার একটা ক'রে যাব॥
ডাকিনী যোগিনী দুটা,
তরকারী বানায়ে খাব।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে,
অম্বলে সম্বরা দিব।
হাতে কালী মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব,
যখন আস্‌বে শমন, বাঁধবে ক'সে,
সেই কালী তার মুখে দিব॥
খাব খাব বলি মা গো, উদরস্থ না করিব।
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব॥
যদি বল কালী খেলে,
কালের হাতে ঠেকা যাব।
আমার ভয় কি তাতে,
কালী ব'লে কালেরে কলা দেখাব॥

কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ,
ভালমতে তাই জানাব।
তাতে মন্ত্রের সাধন, শরীরপতন,
যা হবার তাই ঘটাইব॥ ৯৮

---

(৯৯)

সোহিনী-বাহার—আড়খেম্‌টা।

ও মা! হর গো তারা, মনের দুঃখ,
আর তো দুঃখ সহে না।
যে দুঃখ গর্ভ-যাতনে, মা গো,
জন্মিলে থাকে না মনে,
মায়ামোহে পড়ে ভ্রমে, জন্মি বলে ওমা ওমা।
জন্ম মৃত্যু যে যন্ত্রণা,
মাগো, যে জন্মে নাই সে জানে না।
তুই কি জানিবি যে যন্ত্রণা,
জন্মিলে না মরিলে না॥
রামপ্রসাদ এই ভণে, দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে,
তবু রব মার চরণে,
আর ত ভবে জন্মিব না॥ ৯৯

---

(১০০)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন কেন মার চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি,
বাঁধ দিয়া ভক্তি-দড়া॥
সময় থাকতে না দেখলে মন,
কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে তনয়ারূপেতে,
বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া॥

মায়ে যত ভালবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যু শেষে,
মোলে দণ্ড দুচার কান্নাকাটী,
শেষে দিবে গোবরছড়া ॥
ভাই বন্ধু দারা সুত,
কেবলমাত্র মায়ার গোড়া।
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী,
কড়ি দিবে অষ্ট কড়া ॥
অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ,
দোসর বস্ত্র গায় দিবে চার কোণা,
মাঝখানে ফাড়া ॥
যেই ধ্যানে একমনে,
সেই পাবে কালিকা তারা।
বের হয়ে দেখ কন্যারূপে,
রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া ॥ ১০০

(১০১)

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমি এত দোষী কিসে।
ঐ যে প্রতিদিন হয় দিন যাওয়া ভার,
সারাদিন মা কাঁদি ব'সে ॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি,
থাকব না আর এমন দেশে।
তাতে কুলালচক্র ভ্রমাইল,
চিন্তারাম চাপরাশী এসে ॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি, নাম-সাধনা করি ব'সে
কিন্তু এমন কল করেছে কালী,
বেঁধে রাখে মায়া-পাশে ॥

কালীর পদে মনের খেদে,
দীন রামপ্রসাদে ভাষে।
আমার সেই যে কালী, মনের কালী,
হলেম কালী তার বিষয় বশে ॥ ১০১

(১০২)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে আমার এই মিনতি ॥
তুমি পড়া পাখী হও, করি স্তুতি ॥
যা পড়াই তাই পড় মন,
পড়লে শুন্‌লে ছুধি ভাতি।
ওরে, জান না কি ডাকের কথা,
না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি ॥
কালী কালী কালী পড় মন,
কালীপদে রাখ প্রীতি।
ওরে পড় বাবা আত্মারাম,
আত্মজনের কর গতি ॥
উড়ে উড়ে বেড়ে বেড়ে,
বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি।
ওরে, গাছের ফলে কদিন চলে,
·কর রে চার ফলের স্থিতি ॥
প্রসাদ বলে ফলা গাছে,
ফল পাবি মন শুন যুকতি।
ওরে ব'সে মূলে, কালী ব'লে,
গাছ নাড়া দেও নিতি নিতি ॥ ১০২

(১০৩)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা আমার অন্তরে আছ।
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা,
তুমি পাষাণ-মেয়ে বিষম মায়া,
কতই মা কাচাও গো কাচ॥
উপাসনাভেদে তুমি, প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ।
যে জন পাঁচেরে এক কোরে ভাবে,
তার হাতে মা কোথা বাঁচ॥
বুঝে ভার দেয় না যে জন,
তার ভার নিতে হাঁচ।
যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে,
সে কি ভুলে পেয়ে কাঁচ॥
প্রসাদ বলে আমার হৃদয়,
অমল কমল সাঁচ।
তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মিতা হয়ে,
মনোময়ী হয়ে নাচ॥ ১০৩

(১০৪)

মূলতান—একতালা।

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর-অম্বরে।
নৃত্যতি মানস-শিখী কৌতুকে বিহরে॥
মা শব্দে ঘন ঘন গর্জ্জে ধরাধরে।
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি,
তড়িৎ শোভা করে॥
নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে।
তাহে প্রাণ চাতকের তৃষা ভয় ঘুচিল সত্বরে॥

ইহ জন্ম, পর জন্ম, বহু জন্ম পরে।
রামপ্রসাদ বলে আমার জন্ম,
হবে না জঠরে॥ ১০৩

(১০৪)

প্রসাদী স্থর—একতালা।

এবার আমি ভাল ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি॥
যে দেশেতে রজনী নাই,
সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা,
সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি॥
ঘুম ছুটেছে, আর কি ঘুম'ই,
যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে,
ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে,
সোনাতে রং ধরায়েছি।
মণি-মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে,
ধর্ম্মকর্ম্ম সব ছেড়েছি॥ ১০৪

(১০৫)

গারা-ভৈরবী—আড়া।

হৃৎকমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা
মন-পবনে দুলাইছে দিবস রজনী ও মা।

ইড়া পিঙ্গলা নামা স্বষুম্না মনোরমা,
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী ও মা ॥
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়,
কাম আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি ও মা ॥
যে দেখেছে মায়ের দোল,
সে পেয়েছে মায়ের কোল,
রামপ্রসাদের এই বোল,
ঢোলমারা বাণী ও মা ॥ ১০৫

(১০৬)

প্রসাদী স্থর—একতালা।

কালীপদ মরকত আলানে,
মন-কুঞ্জরেরে বাঁধ এঁটে।
ওরে কালী নাম তীক্ষ্ণ খড়্গে
কর্ম্ম-পাশ ফেল কেটে ॥
নিতান্ত বিষয়াসক্ত মাথায় কর বেসার বেটে।
ওরে একে পঞ্চ ভূতের ভার,
আবার ভূতের বেগার মর খেটে ॥
সতত ত্রিতাপের তাপে হৃদি-ভূমি গেল ফেটে।
নব কাদম্বিনীর বিড়ম্বনা,
পরমায়ু যায় ঘেটে ॥
নানা তীর্থ পর্য্যটনে শ্রম মাত্র পথ হেঁটে।
পাবে ঘরে ব'সে চারি ফল,
বুঝ না রে দুঃখ চেটে ॥
রামপ্রসাদ কয় কিসে কি হয়,
মিছে মোলেম শাস্ত্র ঘেঁটে।
এখন ব্রহ্মময়ীর নাম কোরে,
ব্রহ্মরন্ধ্র যাক ফেটে ॥ ১০৬

(১০৭)

প্রসাদী সুর—একতালা।

কে জানে গো কালী কেমন।
ষড়দর্শনে না পায় দরশন ॥
কালী পদ্মবনে হংস সনে,
হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে,
সদা যোগী করে মনন ॥
আত্মারামের আত্মা কালী,
প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন,
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড,
প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম;
অন্য কেবা জানে তেমন ॥
প্রসাদ ভাষে লোক হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন।
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝে না,
ধর্‌বে শশী হয়ে বামন ॥ ১০৭

(১০৮)

প্রসাদী সুর—একতালা।

আর বাণিজ্যে কি বাসনা।
ওরে আমার মন বল না ॥
ওরে ঋণী আছেন ব্রহ্মময়ী,
সুখে সাধ সেই লহনা ॥

ব্যজনে পবন বাস, চালনেতে সুপ্রকাশ,
মন রে ওরে, শরীরস্থা ব্রহ্মময়ী,
নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা ॥
কানে যদি ঢোকে জল,
বার করে যে জানে কল,
মন রে ওরে, সে জলে মিশায়ে জল,
ঐহিকের এরূপ ভাবনা ॥
ঘরে আছে মহারত্ন, ভ্রান্তিক্রমে কাঁচে যত্ন,
মন রে ওরে, শ্রীনাথদত্ত মহা তত্ত্ব
কলের কপাট খোল না ॥
অপূর্ব্ব জন্মিল নাতি, বুড়া দাদা দিদি-ঘাতী,
মন রে ও রে, জনম মরণাশৌচ,
সন্ধ্যা পূজা বিড়ম্বনা।
প্রসাদ বলে বারে বারে,
না চিনিলে আপনারে,
মন রে ওরে, সিন্দূর বিধবার ভালে,
মরি কিবা বিবেচনা ॥ ১০৮

---

(১০৯)

গারা-ভৈরবী—ঠুংরী।

অপার সংসার, নাহি পারাপার।
ভরসা শ্রীপদ, সঙ্গের সম্পদ্, বিপদে তারিণী,
কর গো নিস্তার ॥
যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি,
ভয়ে কাঁপে অঙ্গ, ডুবে বা মরি,
তার কৃপা করি, কিঙ্কর তোমারি,
দিয়ে চরণতরী, রাখ এইবার ॥

বহিছে তুফান নাহিক বিরাম,
থর থর অঙ্গ কাঁপে অবিরাম,
পূরাও মনস্কাম, জপি তারা নাম,
তারা তব নাম সংসারের সার।
কাল গেল কালী হ'ল না সাধন,
প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন,
এ ভব-বন্ধন, কর বিমোচন,
মা বিনে তারিণী কারে দিব ভার॥ ১০৯

(১১০)

প্রসাদী সুর—একতালা।

কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী॥
কালীর চরণ কৈবল্যরাশি॥
সার্দ্ধ ত্রিশ কোটি তীর্থ মায়ের চরণবাসী॥
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান,
কাজ কি হয়ে কাশীবাসী॥
হৃৎকমলে ভাব ব'সে, চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি,
পাবে কাশী দিবানিশি॥ ১১০

(১১১)

জংলা—একতালা

রসনে কালী নাম রট রে।
কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে,
এ কেবল বাদার্থ মাত্র, খুঁজিতেছে ঘট পট রে॥
রসনারে কর বশ, শ্যামা নামামৃত রস,
তুমি গান কর পান কর,
সে পাত্রের পাত্র বট রে।

স্থধাময় কালীর নাম, কেবল কৈবল্যধাম,
করে জপ না কালীর নাম, কি তব উৎকট রে।
শ্রুতি রাখ সত্ত্বগুণে, দ্বি অক্ষর কর মনে,
প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া,
কালী বলে কাল কাট রে॥ ১১১

(১১২)

প্রসাদী স্থর—একতালা।

মন ভুল না কথার ছলে।
লোকে বলে বলুক মাতাল ব'লে॥
স্থরাপান করিনে রে, স্থধা খাই যে কুতূহলে।
আমার মন-মাতালে মেতেছে আজ,
মদ-মাতালে মাতাল বলে॥
অহর্নিশি থাক বসি, হরমহিষীর চরণতলে।
নৈলে ধর্‌বে নেশা, ঘুচবে দিশা,
বিষম বিষয়-মদ খাইলে॥
যন্ত্র ভরা মন্ত্র সোঁঢ়া অণ্ড ভাসে যেই জলে।
সে যে অকূলতারণ, কূলের কারণ,
কূল ছেড় না পরের বোলে॥
ত্রিগুণে তিনের জন্ম,
মাদক বলে মোহের ফলে।
সত্ত্বে ধর্ম্ম, তমে মর্ম্ম, কর্ম্ম হয় মন রজ মিশালে॥
মাতাল হ'লে বেতাল পাবে,
বৈতালী করিবে কোলে।
রামপ্রসাদ বলে নিদানকালে,
পতিত হবে কূল ছাড়িলে॥ ১১২

(১১৩)

প্রসাদী সুর—একতালা।

রসনায় কালী কালী ব'লে।
আমি ডঙ্কা মেরে যাব চ'লে ॥
সুরা-পান করি নে রে সুধা খাই রে কুতূহলে।
আমার মন-মাতালে মেতেছে আজ,
মদ-মাতালে মাতাল বলে ॥
খালি মদ খেলেই কি হয়,
লোকে কেবল মাতাল বলে।
যা আছে কর্ম্ম, কে জানে মর্ম্ম,
জানে কেবল সেই পাগলে ॥
দেখা দেখি সাধয়ে যোগ,
সিজে কায়া বাড়য়ে রোগ,
ওরে মিছেমিছি কর্ম্মভোগ,
গুরু বিনে প্রসাদ বলে ॥ ১১৩

---

(১১৪)

পিলু-বাহার—যৎ।

ওরে সুরাপান করিনে আমি,
সুধা খাই জয় কালী ব'লে।
মন-মাতালে মাতাল করে,
মদ-মাতালে মাতাল বলে ॥
গুরু-দত্ত গুড় ল'য়ে, প্রবৃত্তি-মসলা দিয়ে মা,
আমার জ্ঞান-শুঁড়ীতে চুয়ায় ভাঁটী,
পান করে মোর মন-মাতালে।
মূলমন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি ব'লে তারা, মা,
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা
খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে ॥ ১১৪

(১১৫)

ঝংলা—একতালা।

মায়ার এ পরম কৌতুক।
মায়াবদ্ধ জনে ধাবতি, অবদ্ধজনে লুটে সুখ ॥
আমি এই আমার এই, এ ভাব ভাবে মূর্খ সেই,
মন রে ওরে, মিছে মিছে সার ভেবে,
সাহসে বাঁধিছ বুক ॥
অমি কেবা আমার কেবা,
আমি ভিন্ন আছে কেবা,
মন রে ওরে, কে করে কাহার সেবা,
মিছা তার সুখ দুখ।
দীপ জ্বেলে আঁধার ঘরে, দ্রব্য যদি পায় করে,
মন রে ওরে, তখনি নির্ব্বাণ করে,
না রাখে রে একটুক ॥
প্রাজ্ঞ অট্টালিকায় থাক, আপনি আপন দেখ,
রামপ্রসাদ বলে মশারি তুলিয়া
দেখ রে মুখ ॥ ১১৫

(১১৬)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত, আঁধার ঘরে ॥
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত,
অভাবে কি ধর্ত্তে পারে ॥
মন অগ্রে শশী বশীভূত কর তোমার শক্তি সারে,
পরে কোটার ভিতর চোর-কুঠরী,
ভোর হলে সে লুকাবে রে ॥

ষড়দর্শনে দর্শন পেলে না, আগম নিগম তন্ত্রসারে,
সে যে ভক্তি-রসের রসিক,
সদানন্দে বিরাজ করে পুরে ॥
সে ভাব লোভে পরম যোগী,
যোগ করে যুগযুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন
লোহাকে চুম্বক ধরে ॥
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি
বুঝ রে মন ঠারে ঠোরে ॥ ১১৬

(১১৭)

বসন্ত-বাহার—একতালা।

কালী কালী বল রসনা।
কর পদধ্যান, নামামৃত পান,
যদি হতে ত্রাণ, থাকে বাসনা ॥
ভাই বন্ধু সুত দারা পরিজন,
সঙ্গের দোসর নহে কোন জন,
দুরন্ত শমন বাঁধ্‌বে যখন,
বিনে ঐ চরণ কেহ কার না ॥
দুর্গা দুর্গা মন বল একবার,
সঙ্গের সম্বল দুর্গানাম আমার,
অনিত্য সংসার নাহি পারাপার,
সকলি অসার ভেবে দেখ না ॥
গেল গেল কাল বিফলে গেল,
দেখ না মা কালান্ত নিকটে এল।
প্রসাদ বলে ব'ল কালী কালী বল,
দূর হবে কাল যম-যন্ত্রণা ॥ ১১৭

(১১৮)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন তুই কাঙ্গালী কিসে।
ও তুই জানিস্ না রে সর্ব্বনেশে।
অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশে দেশে।
ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি,
দেখিস্ না রে ব'সে ব'সে॥
মনের মত মন যদি হও, রাখ রে যোগেতে নিশে,
যখন অজপা পূর্ণিত হবে,
ধর্‌বে না আর কাল-বিষে॥
গুরুদত্ত রত্ন তোড়া, বাঁধ রে যতনে ক'সে।
দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি,
অভয় চরণ পাবার আশে॥ ১১৮

(১১৯)

প্রসাদী সুর—একতালা।

এই সংসার ধোঁকার টাটী।
ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি॥
ওরে ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু,
শূন্যে পাঁচে পরিপাটী॥
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটি।
যেমন শরীর জলে সূর্য্য-ছায়া,
অভাবেতে স্বভাব যেটি॥
গর্ভে যখন যোগী তখন,
ভূমে পড়ে খেলাম মাটী॥
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী,
মায়ার বেড়ী কিসে কাটি॥
রমণী-বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটি।

আগে ইচ্ছা সুখে পান করে,
বিষের জ্বালায় ছটফটি ॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে,
আদি পুরুষের আদি মেয়েটি ।
ও মা যাহা ইচ্ছা তাহাই কর মা,
তুমি গো পাষাণের বেটী ॥ ১১৯

(১২০)

প্রসাদী সুর—একতালা ।

আমি তাই অভিমান করি ।
আমায় করেছ গো মা সংসারী ॥
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি ।
ও মা তুমিও কোন্দল করেছ,
বলিয়ে শিব ভিখারী ॥
জ্ঞান-ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্ম্মোপরি ।
ও মা বিনা দানে মথুরা-পারে,
যাননি সেই ব্রজেশ্বরী ॥
নাতোয়ানী কাচ কাচো মা,
অঙ্গে ভস্ম-ভূষণ পরি ।
ও মা কোথায় লুকাবে বল,
তোমার কুবের ভাণ্ডারী ।
প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা,
এত কেন হলে ভারী ।
যদি রাখ পদে, থেকে পদে,
পদে পদে বিপদ্ সারি ॥ ১২০

(১২১)

প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার কালী কুলাইব,
কালি কোসে কালি বুঝে লব ॥
সে নৃত্যকালী কি অস্থিরা,
কেমন ক'রে তায় রাখিব।
আমার মনোযন্ত্রে বাদ্য করে,
হৃদিপদ্মে নাচাইব ॥
কালীপদের পদ্ধতি যা,
মন তোরে তা জানাইব।
আছে আর যে ছটা বড় ঠ্যাঁটা,
সে কটাকে কেটে দিব ॥
কালী ভেবে কালী হয়ে,
কালী ব'লে কাল কাটাব।
আমি কালাকালে কালের মুখে,
কালী দিয়ে চ'লে যাব ॥
প্রসাদ বলে আর কেন মা,
আর কত গো প্রকাশিব।
আমার কিল খেয়ে কিল চুরি তবু,
কালী কালী না ছাড়িব ॥ ১২১

(১২২)

জংলা—একতালা

একবার ডাক রে কালী তারা বোলে
জোর ক'রে রসনে।
ও তোর ভয় কি রে শমনে ॥
কাজ কি তীর্থ গঙ্গা কাশী,
যার হৃদে জাগে এলোকেশী।

তার কাজ কি ধর্ম্মকর্ম্ম,
ও তাঁর মর্ম্ম যেবা জানে।
ভজনের ছিল আশা, সুধা মোক্ষ পূর্ণ আশা,
রামপ্রসাদের এই দশা,
দ্বিভাব ভেবে মনে ॥ ১২২

(১২৩)

বসন্ত-বাহার—আড়া।

ত্যজ মন কুজন-ভুজঙ্গ-সঙ্গ।
কাল-মত্ত মাতঙ্গেরে না কর আতঙ্ক ॥
অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্যময়ে ভজ,
মকরন্দরসে মজ, ওরে মনোভৃঙ্গ।
স্বপ্নে রাজ্য লভ্য যেমন, নিদ্রাভঙ্গে ভাব কেমন,
বিষয় জানিবে তেমন হ'লে নিদ্রাভঙ্গ ॥
অন্ধস্কন্ধে অন্ধ চড়ে, উভযেতে কূপে পড়ে,
কর্ম্মীকে কি কর্ম্মে ছাড়ে, তার কি প্রসঙ্গ ॥
এই যে তোমার ঘরে, ছয় চোরে চুরি করে,
তুমি যাও পরের ঘরে, এ ত বড রঙ্গ।
প্রসাদ বলে কাব্য এটা, তোমাতে জন্মিল যেটা,
অঙ্গহীন হয়ে সেটা দগ্ধ করে অঙ্গ ॥ ১২৩

(১২৪

সোহিনী-বাহার—একতালা।

তুমি এ ভালো করেছ মা, আমারে বিষয় দিলে না।
এমন ঐহিক সম্পদ্ কিছু আমারে দিলে না ॥
কিছু দিলে না পেলে না, দিবে না পাবে না,
তায় বা ক্ষতি কি মোর।

হোক্ দিলে দিলে বাজী, তাতেও আছি রাজি,
এবার এ বাজী ভোর গো ॥
এ মা দিতিস্ দিতাম, নিতাম খেতাম,
মজুরি করিয়ে তোর ।
এবার মজুরি হলো না, মজুরা চাব কি,
কি জোরে করিব জোর গো ॥
আছ তুমি কোথা, আমি কোথা,
মিছামিছি করি সোর ।
শুধু সোর করা সারা,
তোর যে কুধারা,
মোর যে বিপদ ঘোর গো ॥
এ মা ঘোর মহানিশা,
মন যোগে জাগে,
কি কাজ তোব কঠোর ।
আমার এ কুল ও কুল, দুকুল গেল,
সুধা না পেলে চকোর গো ॥
এ মা আমি টানি কূলে, মন প্রতিকূলে,
দারুণ করম ডোর ।
রামপ্রসাদ কহিছে প'ড়ে দুটানায়
মরে মন ভুঁড়া চোর গো ॥ ১২৪

(১২৫)

প্রসাদী সুর—একতালা ।

মন খেলাও রে দাণ্ডাগুলি ।
আমি তোমা বিনে নাহি খেলি ।
এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল,
চম্পাকলি ধূলা ধূলি ।

আমি কালীর নামে মারব বাড়ি,
ভাঙ্গব যমের মাথার খুলি ॥
ছয় জনের মন্ত্রণা নিলি,
তাইতে পাগল ভুলে গেলি।
রামপ্রসাদের খেলা ভাঙ্গলি,
গলে দিলি কাঁথা ঝুলি ॥ ১২৫

(১২৬)

জংলা—একতালা।

তারা নামে সকলি ঘুচায়।
কেবল রহে মাত্র ঝুলি কাঁথা,
সেটাও নিত্য নয় ॥
যেমন স্বর্ণকারে, স্বর্ণ হরে, স্বণ খাদে উড়ায় ॥
ও মা তোর নামেতে তেমনি ধারা,
তেমনি তো দেখায় ॥
যে জন গৃহস্থলে দুর্গা বলে, পেয়ে নাশ ভয় ॥
এ মা, তুমি তো অন্তরে জাগ, সময় বুঝতে হয়
যার পিতা মাতা ভস্ম মাখে, তরুতলে রয়।
ও মা, তার তনয়ের ভিটেয় টেকা এ বড় সংশয়,
প্রসাদে ঘেরেছে তারা, প্রসাদ পাওয়া দায়।
ওরে ভাই বন্ধু থেকো না
রামপ্রসাদের আশায় ॥ ১২৬

(১২৭)

প্রসাদী সুর—একতালা।

কালীর নাম বড় মিঠা।
সদা গান কর পান কর এটা

ওরে ধিক্ রে রসনা তবু
ইচ্ছা করে পায়স পিঠা।
নিরাকার সাকার ককার সবাকার ভিটা ॥
ওরে ভোগ মোক্ষ ধাম নাম,
ইহার পর আর আছে কেটা ॥
কালী যার হৃদে জাগে, হৃদয়ে তার জাহ্নবীটা।
সে যে কাল হসে মহাকাল হয়,
কালে দিয়ে·হাততালিটা ॥
জ্ঞানাগ্নি অন্তরে জ্বেলে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর ঘিটা,
তুমি মন কর বিল্বদল, স্রুব কর যত্ন ঘেটা ॥
প্রসাদ বলে হৃদিভূমির,
বিরোধ মেনে গেল মিটা।
আমার এ তনু দক্ষিণাকালীর,
দেবত্তরের দাগা চিঠা ॥ ১২৭

(১২৮)

জংলা—একতালা।

ওরে মন চড়কি চড়ক কর, এ ঘোর সংসারে।
মহা যোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে,
না চিন তাঁহারে ॥
যুগল স্বয়ম্ভু শম্ভু যুবতীর উরে।
মন রে ওরে কর পঞ্চ
বিল্বদলে পূজিছ তাঁহারে ॥
ঘরেতে যুবতীর বাক্,
গাজনে বাজিছে ঢাক,
মন রে ওরে, বৃন্দাবলী খ্যামটা ঢালী,
বাজায় বারে বারে ॥

কাম উচ্চ ভারায় চড়ে,
ভাঙ্গলে পাঁজর পাটে পড়ে।
মন রে ওরে এমন যাতনা করেছ তুচ্ছ,
ধন্য রে তোমারে॥
দীর্ঘ আশা চড়কগাছ,
বেছে নিলে বাছের বাছ।
মন রে ওরে,
মায়া-ডোরে বঁড়শী গাঁথা স্নেহ বল যারে।
প্রসাদ বলে বার বার, অসারে জন্মিবে সার,
মন রে শিঙ্গে ফুঁকে শিঙ্গে পাবি,
ডাক কেলে মারে॥ ১২৮

(১২৯)

প্রসাদী সুর—একতালা।

কালী সব ঘুচালে লেঠা।
আগম নিগম শিবের বচন,
মান্‌বি কি না মান্‌বি সেটা॥
শ্মশান পেলে ভালবাস মা,
তুচ্ছ কর মণিকোটা।
মা গো আপনি যেমন, ঠাকুর তেমন,
ঘুচল না আর সিদ্ধি ঘুঁটা॥
যে জন তোমার ভক্ত হয় মা,
ভিন্ন হয় তার রূপের ছটা।
তার কটিতে কৌপীন মেলে না,
গায় ছালি আর মাথায় জটা॥
ভূতলে আনিয়ে মা গো,
কর্‌লে আমায় লোহাপিটা।

আমি তবু কালী ব'লে ডাকি,
সাবাস্ আমার বুকের পাটা ॥
চাকলা জুড়ে নাম রটেছে,
শ্রীরামপ্রসাদ মায়ের বেটা।
এবে মায়ে পোয়ে এমন বাহার,
ইহার মর্ম্ম বুঝ্‌বে কেটা ॥ ১২৯

(১৩০)

খাম্বাজ—একতালা।

কামিনী যামিনী-বরণে রণে এল কে।
উলঙ্গ এলোকেশী, বামকরে ধরে অসি,
উল্লাসিতা দানব-নিধনে ॥
পদভরে বসুমতী, সভীতা কম্পিতা অতি,
তাই দেখে পশুপতি পতিত চরণে রণে ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে কয়, তবে আর কি রে ভয়,
অনায়াসে যম জয়, জীবনে মরণে রণে ॥ ১৩০

(১৩১)

বেহাগ—একতালা।

ও কে রে মনোমোহিনী ॥
ঐ মনোমোহিনী ॥
ঢল ঢল ঢল তড়িৎঘটা, মণি-মরকত-কান্তি ছটা,
এ কি চিত্ত ছলনা, দৈত্য-দলনা,
ললনা নলিনী-বিড়ম্বিনী ॥
সপ্ত পেতি সপ্ত হেতি, সপ্তবিংশ-প্রিয় নয়নী
শশিখণ্ড শিরসী, মহেশ উরসী,
হরের রূপসী একাকিনী ॥

ললাটফলকে, অলকা ঝলকে,
নাসানলকে বেসরে মণি ।
মরি ! হেরি এ কি রূপ, দেখ দেখ ভূপ,
সুধা-রস-কূপ বদনখানি ॥
শ্মশানে বাস, অট্টহাস, কেশপাশ কাদম্বিনী ।
বামা সমরে বরদা, অসুর-দরদা,
নিকটে প্রমোদা প্রমাদ গণি ॥
কহিছে প্রসাদ, না কর বিবাদ,
পড়িল প্রমাদ স্বরূপে গণি ।
সমরে হবে না জয়ী রে ব্রহ্মময়ীরে
করুণাময়ীরে বল জননী ॥ ১৩১

(১৩২)

কালেংড়া—ঠুংরী ।

হের কার রমণী নাচে রে ভয়ঙ্করা বেশে ।
কে রে, নব-নীল-জলধর-কায় হায় হায়,
কে রে হর-হৃদি-হৃৎপদ্মে দিগবাসে ॥
কে রে, নির্জ্জনে বসিয়া নির্ম্মাণ করিল,
পদ রক্তোৎপল জিনি,
তবে কেন রসাতলে যায় ধরণী ·
হেন ইচ্ছা করে, অতি গাঢ় ক'রে
বাঁধি প্রেম-ডোরে,
রাখি-হৃদি-সরোবরে হিল্লোলে ভাসে
কে রে, নিন্দিত রামকদলীতরু, হেরি উরু
দর দর রুধির ক্ষরে,
যেন নীরদ হইতে নির্গত চপলে

অতি রোষবলে, ভুজঙ্গম দলে, নাভি-পদ্মমূলে,
ত্রিবলীর ছলে দংশিল এসে ॥
কে রে উন্নত কুচকলি, মুখ-শত-দলে অলি,
গুণ গুণ করিয়া বেড়ায় ॥
যেন বিকসিত সিতাম্ভোজ বনরোহায়,
কিবা ওষ্ঠশোভা অতি লোল জিহ্বা
হর-মনোলোভা,
যেন আসব-আবেশে শিশু-সুধা ভাসে ॥
কে রে, কুন্তলজাল আবৃত মুখমণ্ডল।
লম্বিত চুম্বি ধরায় তাহে ভুরূধনুর্ব্বাণ সন্ধান করা
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে, সিঁতি মুহু দোলে,
কি চকোর খেলে,
কিবা অরুণকিরণে গজমতি হাসে ॥
কত ডুম্বুবা ডুম্বুবী নাচিছে ভৈরবী,
হি হি করিছে যোগিনী,
কত কটরা ভরিয়া সুধা যোগ অমনি,
রামপ্রসাদ ভণে, কাজ নাই রণে,
এ বামার সনে,
যাঁর পদতলে শবচ্ছলে আশুতোষে ॥ ১৩২

---

(১৩৩)

রামকেলি—আড়া।

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে,
গলিত চিকুর আসব-আবেশে।
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানবদলে,
ধরি করতলে গজ গরাসে ॥
কেরে কালীয়-শরীরে রুধির শোভিছে,
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে।

কে রে নীল-কমল শ্রীমুখমণ্ডল,
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে ॥
কে রে নীলকান্ত, মণি নিতান্ত,
নখর-নিকর তিমির নাশে।
কে রূপের ছটায় তড়িৎ ঘটায়,
ঘন ঘোর রবে উঠে আকাশে ॥
দিতিসুতচয় সবার হৃদয়
থর থর কাঁপে হুতাশে।
মা গো! কোপ কর দূর, চল নিজপুর,
নিবেদি শ্রীরামপ্রসাদ দাসে ॥ ১৩৩

(১৩৪)

খাম্বাজ—রূপক।

মা! কত নাচ গো রণে।
নিরুপম বেশ বিগলিত-কেশ,
বিবসনা হর-হৃদে কত নাচ গো রণে ॥
সত্ত-হত-দিতি-তনয়-মস্তক-হার লম্বিত
সুজঘনে কত রাজিত কটিতটে
নর-কর-নিকর কুণপ-শিশু শ্রবণে ॥
অধর সুললিত, বিম্ব-বিনিন্দিত
কুন্দ বিকশিত সুদশনে।
শ্রীমুখমণ্ডল, কমল নিরমল, সাট্ট হাসি সঘনে
সজল জলধর, কান্তি সুন্দর,
রুধির কিবা শোভা ও বরণে।
প্রসাদ প্রবদতি, মম মানস নৃত্যতি,
রূপ কি ধরে নয়নে ॥ ১৩৪

(১৩৫)

খাম্বাজ—রূপক।

এলো-চিকুর-নিকর, নরকর কটিতটে,
হরে বিহরে রূপসী।
সুধাংশু তপন, দহন নয়ন, বয়ানবরে বসি শশী।
শব-শিশু ইষু, শ্রুতিতলে শোভে,
বাম করে মুণ্ড অসি।
বামেতর কর, যাচে অভয় বর,
বরাঙ্গনা রূপ মসী॥
সদা মদালসে, কলেবর খসে,
হাসে প্রকাশে সুধারাশি।
স্বমস্তা স্বধাসা মাভৈঃ মাভৈঃ ভাষা,
সুবেশানুকূলা ষোড়শী॥
প্রসাদে প্রসন্না, ভব ভব-প্রিয়া,
ভবার্ণব-ভয় বাসি।
জন্মুর যন্ত্রণা হরণে মন্ত্রণা,
চরণে গয়া গঙ্গা কাশী॥ ১৩৫

(১৩৬)

বিভাস—তিওট।

এলো চিকুরভার, এ বামা,
মার মার মার রবে ধায়।
রূপে আলো করে ক্ষিতি, গজপতিরূপ গতি,
রতিপতি মতি মোহ পায়॥
অপযশ কুলে কালী, কুল নাশ করে কালী,
নিশুম্ভ নিপাতি কালী, সব সেরে যায়।
সকল সেরে যায়, এ কি ঠেকিলাম দায়,
এ জন্মের মত বিদায়॥

কাল বলে এত কাল, এড়ালেম এ জঞ্জাল,
সেই কাল চরণে লুটায়।
টেনে ফেল রম্ভাফল, গঙ্গাজল বিল্বদল,
শিব পূজার এই ফল, অশিব ঘটায়॥
অশিব ঘটায়, এই দনুজ ভটায়, কি কুরব রটায়॥
ভব দৈব রূপ শব, মুখে নাহি মাত্র রব,
কার ভরসায় রব হায়।
'চিনিলাম ব্রহ্মময়ী, হই বা না হই জয়ী,
নিতান্ত করুণাময়ী স্থান দিবে পায়'॥
স্থান দিবে পায়, নিতান্ত মন তায়,
এ জন্ম কর্ম্ম সার।
প্রসাদ বলে ভাল বটে, এ বুদ্ধি ঘটেছে ঘটে,
এ সঙ্কটে প্রাণে বাঁচা দায়॥
মরণে কি আছে ভয়, জন্মের দক্ষিণা হয়,
দক্ষিণাতে মন লয় কর দৈত্যরায়।
ওহে দৈত্যরায়, ভজ এই দক্ষিণায়,
আর কি কাজ আশায়॥ ৩৬

(১৩৭)

বিভাস—তিওট।

নব-নীল-নীরদ-তনুরুচি কে ?
ঐ মনোমোহিনী রে।
তিমির শশধর, বাল দিনকর,
সমান চরণে প্রকাশ॥
কোটী চন্দ্র ঝলকত, শ্রীমুখমণ্ডল,
নিন্দি সুধামৃত ভাষ॥
অবতংস সে শ্রবণে,
কিশোর বিধি অরি গলিত কুন্তলপাশ।

গলে সুন্দর বরণ, সুহার লম্বিত,
সতত জঘনে নিবাস ॥
বামার বামকর, পর খড়্গ নরশির,
সব্যে পূর্ণাভিলাষ।
শশি-শকল ভালে, বিরাজে মহাকালে,
ঘোর ঘন ঘন হাস ॥
ভণে শ্রীকবিরঞ্জনে, বাঞ্ছা করিছে মনে,
করুণাবলোকনে, কলুষচয় কর নাশ।
তব নাম বদনে, যে প্রকাশে সে জনে,
প্রভবে এ কথা আভাষ ॥ ১৩৭

(১৩৮)

ঝিঁঝিট—জলদ-তেতালা।

আরে ঐ আইল কে রে ঘনবরণী।
কে রে নবীনা নগনা লাজ-বিরহিতা,
ভুবন-মোহিতা.
এ কি অনুচিতা কুলের কামিনী ॥
কুঞ্জরবরগতি আসবে আবেশ,
লোলিত রসনা গলিত কেশ,
সুর-নর-শঙ্কা করে হেরি বেশ,
হুঙ্কার রবে রে দনুজ-দলনী ॥
কে রে নব-নীল-কমল-কলিকা বলি,
অঙ্গুলি দংশন করিছে অলি,
মুখচন্দ্র চকোরগণ, অধর অর্পণ
করত পূর্ণ শশধর বলি।
ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিবাদ,
এ কহে নীলকমল, ও কহে চাঁদ,

দোঁহে দোঁহ করতহি নাদ,
চিচিকি গুণ গুণ করিয়ে ধ্বনি।
কে রে জঘন সুচারু, কদলী-তরুনিন্দিত
রুধির অধীর বহিছে,
তদূর্দ্ধে কটিবেড়া, নরকর-ছড়া,
কিঙ্কিণী সহ শোভা করিছে,
করতলস্থল, নিরমল অতিশয়,
বামে অসিমুণ্ড দক্ষিণে বরাভয়,
খণ্ড খণ্ড করে রথ গজ হয়,
জয় জয় ডাকিছে সঙ্গিনী॥
কে রে উর্দ্ধতর হেরি হেরি পয়োধর,
করিকুম্ভ ভয়ে বিদরে,
অপরূপ এ কি আর, চণ্ডমুণ্ডহার,
সুন্দরী সুন্দর পরে।
প্রফুল্ল বদনে বদন ঝলকে,
মৃদুহাস্য প্রকাশে দামিনী নলকে,
রবি অনল শশী ত্রিনয়ন পলকে,
দম্ফে কম্পে সঘনে ধরণী॥ ১৩৮

(১৩৯)

খাম্বাজ—ঢিমে-তেতালা।

বামা ও কে এলোকেশে।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী ভৈরবী যোগিনী,
রণে প্রবেশে অতি দ্বেষে॥
কি সুখে হাসিছে, লাজ নাহি বাসিছে,
নাচিছে মহেশ-উরসে।
ঘোর রণে মগনা হয়েছে নগনা,
পিবতি সুধা কি আবেশে॥

ঢলিয়া ঢলিয়া, যাইছে চলিয়া,
ধর রে বলিয়া, ঘন হাসে।
কাহার নারী হে, চিনিতে নারি রে;
মোহিত করেছে ছিন্ন বেশে॥
কারে আর ভজ রে, ও পদে মজ রে,
রূপে আলো করিছে দিগ দশে।
কি করি রণে রে, হরেছে মনেরে,
প্রসাদ ভণে রে চল কৈলাসে॥ ১৩৯

(১৪০)

খাম্বাজ—ঢিমে-তেতালা।

কে ইন্দীবর-নিন্দি কান্তি, বিগলিত বেশ,
বসন-বিহীনা কে রে সমরে।
মদন-মথন-উরসী, রূপসী
হাসি হাসি বামা বিহরে।
প্রলয়কালীন জলদ গর্জ্জে,
তিষ্ঠ তিষ্ঠ সতত তর্জ্জে
জনমনোহর শমন-সোদরা
গর্ব্ব খর্ব্ব করে॥
শস্ত্রে শস্ত্রে প্রথম দীক্ষা
প্রথম বয়স বিপুল শিক্ষা,
ক্রুদ্ধ নয়নে, নিরখে যে জনে,
গমন শমন-নগরে।
কলয়তি প্রসাদ হে জগদম্বে,
সমরে নিপাত রিপু-কদম্বে,
সংবর বেশ, কুরু কৃপালেশ;
রক্ষ বিবুধ-নিকরে॥ ১৪০

(১৪১)

খাম্বাজ—ঢিমে-তেতালা।

হুঙ্কারে সংগ্রামে ও কে বিরাজে বামা।
কামরিপু-মোহিনী ও কে বিরাজে বামা॥
তপন দহন শশী, ত্রিনয়নী ও রূপসী,
কুবলয়দল-তনু শ্যামা॥
বিবসনা এ তরুণী, কেশ পড়িছে ধরণী,
সমর-নিপুণা গুণধামা।
কহিছে প্রসাদ সার, তারিণী সম্মুখে যার,
যমজয়ী বাজাইল দামা॥ ১৪১

(১৪২)

খাম্বাজ—ঢিমে-তেতালা।

ঢল ঢল জলদ বরণী এ কার রমণী রে।
নিরখ হে ভূপ, ঈশ শবরূপ, উরসী রাজে চরণ॥
নখরাজি উজ্জ্বল, চন্দ্র নিরমল,
সতত ঝলকে কিরণ।
এ কি! চতুরানন হরি,
কলয়তি শঙ্করি, সংবরণ কর রণ॥
মগনা রণমদে, সচলা ধরা পদে;
চরণে অচল চালন।
ফণিরাজ কম্পিত, সতত ত্রাসিত,
প্রলয়ের এই কি কারণ॥
প্রসাদ দাসে ভাবে, ত্রাহি নিজ দাসে,
চিত্ত যে মত্ত বারণ।
সদা বিষয়াসব পানে, ভ্রমিছে বিজ্ঞানে,
কদাচ না মানে বারণ॥ ১৪২

(১৪৩)

বিভাস—ঢিমে-তেতালা।

মরি ! ও রমণী কি রণ করে,
রমণী সমর করে, ধরা কাঁপে পদভরে,
রথ রথী সারথি তুরঙ্গ গরাসে।
কলেবর মহাকাল, মহাকালে শোভে ভাল,
দিনকর কর ঢাকে চিকুরপাশে ॥
আতঙ্কে মাতঙ্গ ধায়, পতঙ্গে পতঙ্গ প্রায়,
মনে বাসি শশী খসি পড়ে তরাসে।
নিরুপমা রূপচ্ছটা, ভেদ করে ব্রহ্ম-কটা,
প্রবল দনুজ-ঘটা গেলে গরাসে ॥
ভৈরবী বাজায় গাল, যোগিনী ধরিছে তাল,
মরি কিবা রসাল, গান বিভাসে।
নিকটে বিবুধ-বধূ, যতনে যোগায় মধু,
দোলায়ে বদন-বিধু মৃদু মৃদু হাসে ॥
সবার আসার আশা, ঘুচায়েছে আশা-বাসা,
জীবনে নিরাশা, ফিরে না যায় বাসে ॥
ভণে রামপ্রসাদ সার, নাম লয়ে শ্যামা মার,
আনন্দে বাজায়ে দামা চল কৈলাসে ॥ ১৪৩

(১৪৪)

বিভাস—ঢিমে-তেতালা

অকলঙ্ক শশি-মুখী, সুধাপানে সদা সুখী,
তনু তনু নিরখি, অতনু চমকে।
না ভাব বিরূপ ভূপ, যারে ভাব ব্রহ্ম-রূপ,
পদতলে শতরূপ, বামা রণে কে ॥

শিশু-শশধর-ধরা, সুহাস মধুর ধারা,
প্রাণ ধরা তার ধরা আলো করিছে।
চিত্তে বিবেচনা কর, নিশাকর দিবাকর,
বৈশ্বানর নেত্রবর-কর ঝলকে ॥
রামা অগ্রগণ্যা, বটে ধন্যা, কার কন্যা,
কিবা অন্বেষণে রণে এসেছে।
সঙ্গে কি বিকৃতিগুলা, নখ কুলা, দন্ত মূলা,
আলো চুলা গায় ধূলা ভয় করে হে ॥
কবি রামপ্রসাদ ভাসে, রক্ষা কর নিজ দাসে,
যে জন একান্ত ত্রাসে মা বলেছে।
তার অপরাধ ক্ষমা, যদি না করিবে শ্যামা,
তবে গো তোমায় উমা মা বলিবে কে ॥ ১৪৪

(১৪৫)

বিভাস—ঢিমে-তেতালা।

শ্যামা বামা কে বিরাজে ভবে।
বিপরীত ক্রীড়া, ব্রীড়াগতা সবে ॥
গদ গদ রসে ভাসে, বদন ঢুলায় হাসে,
অতনু সতনু অনুভবে।
রবিসুতা মন্দাকিনী, মধ্যে সরস্বতী মানি,
ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাপুণ্য লাভে।
তরুণ শশাঙ্ক মিলে, ইন্দীবর চাঁদ গিলে,
অনলে অনল মিলে অনল নিভে।
কলয়তি প্রসাদ কবি, ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী ছবি,
নিরখিলে পাপ তাপ, কোথায় রবে ॥ ১৪৫

(১৪৬)

মল্লার—খয়রা।

মোহিনী আশা বাসা,
ঘোর তমোনাশা বামা কে ?
ঘোর ঘটা, কান্তি ছটা, ব্রহ্মকটা ঠেকেছে।
রূপসী শিরসী শশী, হরোরসী এলোকেশী,
মুখ ঝালা সুধা ঢালা, কুলবালা নাচিছে ॥
দ্রুত চলে আস্য টলে, বাহুবলে দৈত্য দলে,
ডাকে শিবা কব কিবা, দিবা নিশি করেছে।
ক্ষীণ দীন ভাগ্যহীন, দুষ্টচিত্ত সুকঠিন,
রামপ্রসাদে কালীর বাদে
কি প্রমাদে ঠেকেছে ॥ ১৪৬

---

(১৪৭)

মল্লার—খয়রা।

সদাশিব-শবে আরোহিণী কামিনী
শোভিত শোণিতধারা মেঘে সৌদামিনী ॥
এ কি দেখি অসম্ভব, আসন করেছে শব ,
মূর্ত্তিমতী মনোভব ভব-ভামিনী ॥
রবি শশী বহ্নি আঁখি, ভালে শশী শশিমুখী,
পদনখে শশিরাশি গজগামিনী।
শ্রীকবিরঞ্জন ভণে, কাদম্বিনী রূপ মনে,
ভাবয়ে ভকত জনে, দিবস-রজনী ॥ ১৪৭

---

(১৪৮)

মল্লার—খয়রা।

এলোকেশে, কে শবে, এলো রে বামা।
নখর-নিকর হিমকরবর,
রঞ্জিত ঘন তনু মুখ হিমধামা ॥

নব নব সঙ্গিনী, নবরসরঙ্গিণী,
হাসত ভাষত নাচত বামা।
কুলবালা বাহুবলে, প্রবল দনুজ দলে,
ধরাতলে হতরিপু সমা ॥
ভৈরব ভূতপ্রমথগণ ঘন রবে রণজয়ী শ্যামা,
করে করে ধরে তাল, ববম্ বম্ বাজে গাল,
ধাঁ ধাঁ ধাঁ গুড়্ গুড়্ বাজিছে দামামা ॥
ভবভয়ভঞ্জন, হেতু কবিরঞ্জন,
মুঞ্চতি করম সুনামা।
তব গুণ শ্রবণে, সতত মম মনে,
ঘোর ভবে পুনরপি গমন বিরামা ॥ ১৪৮

(১৪৯)

ঝিঁঝিট—আড়া।

শ্যামা বামা কে ?
তনু দলিতাঞ্জন, শরদ-সুধাকর-মণ্ডল-বদনী রে।
কুন্তল বিগলিত, শোণিত শোভিত,
তড়িত জড়িত নব ঘন ঝলকে ॥
বিপরীত এ কি কাজ, লাজ ছেড়েছে দূরে,
ঐ রথ রথী গজ বাজী বয়ানে পূরে।
মম দল প্রবল, সকল হত বল,
চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে ॥
প্রচণ্ড প্রতাপরাশি মৃত্যুরূপিণী,
ঐ কামরিপু পদে এ কেমন কামিনী।
লঙ্ঘে গগন ধরণীধর সাগর,
ঐ যুবতী চকিতে নয়ন পলকে ॥

ভীম ভবার্ণব-তারণ হেতু,
ঐ যুগল চরণ তব করিয়াছি সেতু,
কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন,
কুরু কৃপালেশ জননী কালিকে ॥ ১৪৯

(১৫০)

খাম্বাজ—তিওট।

চিকণ-কালরূপা সুন্দরী
ত্রিপুরারি হৃদে বিহরে ॥
অরুণ-কমলদল, বিমল চরণতল,
হিমকর-নিকর রাজিত নখরে ॥
বামা অট্ট অট্ট হাসে, তিমির-কলাপ নাশে,
ভাষে সুধা অমিত ক্ষরে।
ভ্রমে কোকনদদল, মধুকর চঞ্চল,
লঘুগতি পতিত যুবতী-অধরে ॥
সহজে নবীনা ক্ষীণা, মোহিনী বসনহীনা,
কি কঠিনা দয়া না করে।
চঞ্চলাপাঙ্গ প্রাণ হর, বরষতি শর খর,
কত কত শত শত রে ॥
কহে রামপ্রসাদ কবি, অসিত মায়ের ছবি,
ভাবিয়া নয়ন ঝরে।
ও পদ-পঙ্কজ-পল্লবে বিহরতু,
মামক মানস আশ ধরে ॥ ১৫০

(১৫১)

ঝিঁঝিট—আড়া

সমর করে ও কে
কুলবালা ত্রিভুবনমোহিনী ॥

ললাট-নয়ন বৈশ্বানর, বাম বিধু,
বামেতর তরণি।
মরকত মুকুর বিমল মুখমণ্ডল,
নূতন জলধরবরণী॥
শব শিব শিরে, মন্দাকিনী রাজত,
ঢল ঢল উজ্জ্বল ধরণী।
উরোপরি যুগপদ, রাজিত কোকনদ,
সুচারু নখ-নিকর, সুধা-ধামিনী॥
কলয়তি কবিরঞ্জন,
করুণাময়ী করুণাং কুরু হরমোহিনী।
গিরিবরকন্যে, নিখিল-শরণ্যে,
মম জীবন-ধন, জননী॥ ১৫১

(১৫২)

খাম্বাজ—ত্রিওট।

কে হর-হৃদি বিহরে।
তনু রুচির, সজল ঘন নিন্দিত,
চরণে উদিত বিধু নখরে॥
নীলকমলদল, শ্রীমুখমণ্ডল,
শ্রমজল শোভে শরীরে।
মরকত মুকুরে, মঞ্জু মুকুতাফল,
রচিত কিবা শোভা, মরি মরি রে॥
গলিত চিকুর-ঘটা, নব জলধর-ছটা,
ঝাঁপল দশ দিশি তিমিরে।
গুরুতর পদভর, কমঠ ভুজগবর,
কাতর মূর্চ্ছিত মহী রে॥
ঘোর বিষয়ে মজি, কালীপদ না ভজি,
সুধা ত্যজিয়া বিষ পান করি রে।

ভণে শ্রীকবিরঞ্জন, দৈব-বিড়ম্বন
বিফলে মানবদেহ ধরি রে ॥ ১৫২

(১৫৩)

ললিত—তিওট।

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে,
বিগলিত কুন্তলজাল।
বিমল বিধুবর, শ্রীমুখ সুন্দর,
তনুরুচি বিজিত, তরুণ তমাল ॥
যোগিনী সকল ভৈরবী সমরে,
করে করে ধরে তাল।
ক্রুদ্ধ মানস ঊর্দ্ধে শোণিত,
পিবতি নয়ন বিশাল ॥
নিগম সারিগম, গণ গণ গণ,
মবরব যন্ত্র মণ্ডল ভাল।
তা তা থেই, দ্রিমকি দ্রিমকি,
ধা ধা ডম্ফ বাদ্য রসাল ॥ ১৫৩

(১৫৪)

ললিত—তিওট।

কুলবালা উলঙ্গ, ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ তরুণ বয়েস।
দনুজ-দলনা ললনা, সমরে শবে, বিগলিত কেশ ॥
ঘন ঘোর নিনাদিনী, সমরে বিবাদিনী,
মদনোন্মাদিনী বেশ।
ভূত পিশাচ প্রমথ-সঙ্গে, ভৈরবগণ নাচত রঙ্গে
সঙ্গিনী বড় রঙ্গিণী, নগনা সমান বেশ ॥
গজ রথ রথী করত গ্রাস, সুরাসুর-নর হৃদয়-ত্রাস,
দ্রুত চলত চলত রসে গর গর, নর-কর কটিদেশ

কহিছে প্রসাদ ভুবনপালিকে,
করুণাং কুরু জননী কালিকে,
ভব-পারাবার তরাবার ভার,
হরবধূ হর ক্লেশ ॥ ১৫৪

(১৫৫)

বেহাগ—তিওট।

শ্যাম! বামা গুণধামা কামান্তক-উরসা।
বিহরে বামা স্মর হরে,
সুরী কি অসুরী, কি নাগী
কি পন্নগী কি মানুষী॥
নাসে মুকুতা-ফল বিলোর,
পূর্ণচন্দ্র কোলে চকোর,
সতত দোলত থোর থোর, মন্দ মন্দ হাসি।
এ কি করে করে করী ধরে রণে পশি,
তনুক্ষীণা স্তনবীনা, বস্ত্রহীনা ষোড়শী ॥
নীলকমলদল জিতাস্য,
তড়িত জড়িত মধুর হাস্য,
লজ্জিতা কুচকলি অপ্রকাশ্য, ভালে শিশু শশী।
কত ছলা কত কলা, এ প্রবলা চিত্তে বাসি,
রামা নব্যা ভব্যা অব্যাহতগামিনী রূপসী ॥
* * * *, দিতি-সুতচয় সমর প্রচণ্ড,
সলিলে প্রবেশি।
এটা কেটা চিত্তে যেটা, হরে সেটা দুঃখরাশি,
মম সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করে, এ কি সর্ব্বনাশী ॥
কলয়তি রামপ্রসাদ দাস,
ঘোর তিমিরপুঞ্জ নাশ,
হৃদয়-কমলে সতত বাস, শ্যামা দীর্ঘকেশী।

ইহকালে পরকালে, জয়ী কালে তুচ্ছ বাসি,
কথা নিতান্ত, কৃতান্ত শান্ত,
শ্রীকান্ত প্রবেশি ॥ ১৫৫

---

(১৫৬)

ছায়ানট—খয়রা।

সমরে কে রে কাল কামিনী ?
কাদম্বিনী-বিড়ম্বিনী,
অপরাকুসুমাপরাজিতা-বরণী, কে রণে রমণী।
সুধাংশু-সুধা কি শ্রমজ বিন্দু,
শ্রীমুখ না এ কি শরদ ইন্দু, কমল-বন্ধু,
বহ্নি সিন্ধুতনয়, এ তিন নয়নী ॥
আ মরি আ মরি মন্দ মন্দ হাস,
লোক প্রকাশ, আশুতোষ-বাসিনী।
ফণি-ফণাভরণ জিনি, গণি দন্ত কুন্দশ্রেণী ;
কেশাগ্র ধরণী পরে বিরাজ,
অপরূপ শব শ্রবণে সাজ,
না করে লাজ, কেমন কাজ, মম সমাজে তরুণী ॥
আ মরি আ মরি চণ্ডমুণ্ডমাল,
করে কপাল এ কি বিশাল,
ভাল ভাল কালদণ্ডধারিণী।
ক্ষীণ কটিপর, নৃকর নিকর,
আবৃত কর কিঙ্কিণী।
সর্ব্বাঙ্গ শোভিত শোণিতবৃন্তে,
কিংশুক ইব ঋতু বসন্তে,
চরণোপান্তে মনোহ্নরন্তে রাখ কৃতান্তদলনী ॥
আ মরি আ মরি সঙ্গিনী সকল, ভাবে ঢল ঢল,
হাসে খল খল টল টল ধরণী।
ভয়ঙ্কর কিবা, ডাকিছে শিবা,
শিব-উরে শিবা আপনি ॥

প্রলয়কারিণী করে প্রমাদ,
পরিহরি ভূপ বৃথা বিবাদ,
কহিছে প্রসাদ, দেহ মা,
প্রসাদ বিষাদনাশিনী ॥ ১৫৬

(১৫৭)

ঝিঁঝিট—একতালা।

কে মোহিনী ভালে বাল শশী,
পরম রূপসী বিহরে সমরে বামা, বিগলিতকেশী।
তনু তনু অমানিশা, দিগম্বরী বালা কৃশা,
সব্যে বরাভয়, বামকরে মুণ্ড অসি ॥
মরি কিবা অপরূপ, নিরখ দনুজ-ভূপ,
সুরী কি অসুরী কি পন্নগী কি মানুষী।
জয়ী হব যার বলে, সেই প্রভু শবচ্ছলে,
পদে মহাকাল, কালরূপ হেন বাসি ॥
নানারূপ মায়া ধরে, কটাক্ষে মানস হরে,
ক্ষণে বপু বিরাট বিকট মুখে হাসি।
ক্ষণে ধরাতলে ছুটে, ক্ষণেকে আকাশে উঠে,
গিলে রথ রথী গজ বাজী রাশি রাশি ॥
ভণে রামপ্রসাদ সার, না জান মহিমা মার,
চৈতন্যরূপিণী নিত্য ব্রহ্মমহিষী।
যেই শ্যাম সেই শ্যামা, অকার আকারে বামা,
আকার করিয়া লোপ,
অসি ভাব বাঁশী ॥ ১৫৭

(১৫৮)

ললিত—রূপক।

নলিনী নবীনা মনোমোহিনী।
বিগলিত চিকুরঘটা, গমনে বরটা,
ববসনা শবাসনা মদালসা।

ষোড়শী ষোড়শ কলা, কুশলা সরলা,
ললাটে বালার্ক বিধু, শ্রুতিতলে ব্রহ্মা বিধু,
মঞ্জুজ্জা মধুরমুখী, মধুর লালসা ॥
সোম-মৌলি-প্রিয়া নাম, রবিজ মঙ্গল ধাম,
ভজে বুধ বৃহস্পতি হীন কর্ম্মনাশা।
হরিণাক্ষী হরিমধ্যা, হরিহর-ব্রহ্মারাধ্যা,
হরি-পরিবার সেই, যে ভজে দিগ্বাসা ॥ ১৫৮

(১৫৯)

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমার মনে বাসনা জননি।
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে,
হ, ল, ক্ষ, ব্রহ্মরূপিণী ॥
মূলে পৃথ্বী ব, স, অন্তে,
চারি পত্রে মায়া ডাকিনী।
সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে, শিবে ঘেরে কুণ্ডলিনী ॥
স্বাধিষ্ঠানে, ব, ল, অন্তে, ষড়দলোপর-বাসিনী।
ত্রিবেণী বরুণ বিষ্ণু, শিব ভৈরবী ডাকিনী ॥
ত্রিকোণ মণিপুরে, বহ্নি-বীজ-ধারিণী।
ড, ফ অন্তে দিগ্‌দলে, শিব ভৈরবী লাকিনী ॥
অনাহতে ষট্‌কোণে, দ্বিষড়দলবাসিনী।
ক, ঠ, অন্তে বায়ু-বীজ, শিব ভৈরবী কামিনী ॥
বিশুদ্ধাখ্য স্বরবর্ণ ষোড়শদল-পদ্মিনী।
নাগোপরি বিষ্ণু আসন, শিবশঙ্করী শাকিনী ॥
ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে মন, শিবলিঙ্গ চক্র যোনি।
চন্দ্রবীজে সুধা ক্ষরে, হ, ক্ষ,
বর্ণে হাকিনী ॥১৫৯

(১৬০)

বিভাস—একতালা।

তারা আছ গো অন্তরে, মা আছ গো অন্তরে।
কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী মা ;
এক স্থান মূলাধারে, আর স্থান সহস্রারে,
আর স্থান চিন্তামণি-পুরে।
শিব শক্তি সব্যে বামে, জাহ্নবী যমুনা নামে,
সরস্বতী মধ্যে শোভা করে॥
ভুজঙ্গরূপা লোহিতা, স্বয়ম্ভুতে সুনিদ্রিতা,
এই ধ্যান ক'রে ধন্য নরে।
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর নাভিস্থান,
অনাহতে বিশুদ্ধাখ্য বরে॥
বর্ণরূপা তুমি বট, ব, স, র, ল, ত, ক, ফ, ঠ,
ষোল স্বর কণ্ঠায় বিহরে।
হ, ক্ষ, আশ্রয় ভুরু, নিতান্ত কহিলা গুরু,
চিন্তা এই শরীর-ভিতরে॥
ব্রহ্মা আদি পাঁচ ব্যক্তি, ডাকিন্যাদি ছয় শক্তি,
ক্রমে বাস পদ্মের উপরে।
গজেন্দ্র মকর আর, মেষবর কৃষ্ণসার,
আরোহণ দ্বিতীয় কুঞ্জরে॥
অজপা হইলে রোধ, তবে জন্মে তার বোধ,
গুঞ্জে মত্ত মধুব্রত স্বরে।
ধরা জল বহ্নি বাত, লয় লহ অচিরাৎ,
যং রং লং বং হং হৌং স্বরে॥
ফিরে কর কৃপাদৃষ্টি, পুনর্ব্বার হয় সৃষ্টি,
চরণযুগলে সুধা ক্ষরে।
তুমি নাদ তুমি বিন্দু, সুধাধার যেন ইন্দু,
এক আত্মা ভেদ কেবা করে॥

উপাসনা ভেদ ভেদ, ইথে কোন নাহি খেদ,
মহাকালী কালপদভরে ॥
নিদ্রা ভাঙ্গে যার ঠাঁই, তার আর নিদ্রা নাই,
থাকে জীব, শিব কর তারে ॥
মুক্তি কন্যা তারে ভজে, সে কি আর বিষয়ে মজে,
পুনরপি আনিয়া সংসারে।
আজ্ঞা-চক্র করি ভেদ, ঘুচাও ভক্তের খেদ,
হংসীরূপে মিল হংসবরে ॥
চারি ছয় দশ বার, ষোড়শ দ্বিদল আর,
দশ-শত দল শিরোপরে।
শ্রীনাথ বসতি তথা, শুনি প্রসাদের কথা,
যোগী ভাসে আনন্দ-সাগরে ॥১৬০

(১৬১)

বিভাস—একতালা

গিরিবর! আর আমি পারিনে হে,
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্য পান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে ॥
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ॥
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি,
যেতে চায় না জানি কোথারে।
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে ॥

উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর,
গৌরীরে লইয়া কোলে করে।
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে॥
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে।
শ্রীরামপ্রসাদ কয়, কত পুণ্যপুঞ্জচয়,
জগতজননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা
শোয়াইল পালঙ্ক-উপরে॥১৬১

(১৬২)

বিভাস—একতালা।

জগদম্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেরুলো,
জগদম্বার কোটাল।
জয় জয় ডাকে কালী, ঘন ঘন করতালি,
বব বম্ বাজাইয়া গাল॥
ভক্তে ভয় দেখাবারে, চতুষ্পথ শূন্যাগারে,
ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল।
অর্দ্ধচন্দ্র শিরে ধরে, ভীষণ ত্রিশূল করে,
আপাদলম্বিত জটা-জাল॥
শমন সমান দর্প, প্রথমেতে জলে সর্প,
পরে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিশাল।
ভয় পায় ভূতে মারে, আসনে তিষ্ঠিতে নারে,
সম্মুখে ঘুরায় চক্ষু লাল॥
যেমন সাধক বটে, তার কি আপদ্ ঘটে,
তুষ্ট হয়ে বলে ভাল ভাল।
মন্ত্র সিদ্ধ বটে তোর, করালবদনী জোর,
তুই জয়ী ইহ পরকাল॥

কবি রামপ্রসাদ দাসে, আনন্দ-সাগরে ভাসে,
সাধকের কি আছে জঞ্জাল।
বিভীষিকা সে কি মানে, ব'সে থাকে বীরাসনে,
কালীর চরণ ক'রে ঢাল॥ ১৬২

(১৬৩)

ললিত—একতালা।

হর ফিরে মাতিয়া, শঙ্কর ফিরে মাতিয়া।
শিঙ্গা করিছে ভভ ভম্ ভম্,
ভো ভো ভো ববম্ ববম,
বব বম্ বব বম্ গাল বাজিয়া॥
মগন হইয়া প্রমথনাথ,
খেটক ডমরু লইয়া হাত,
কোটি কোটি কোটি দানব সাথ,
শ্মশানে ফিরিছে গাইয়া।
কটিতটে কিবা বাঘের ছাল,
গলায় দুলিছে হাড়ের মাল,
নাগযজ্ঞোপবীত ভাল, গরজে গরব মানিয়া
শশধর-কলা ভালে শোভে,
নয়ন-চকোর অমিয় লোভে,
স্থির গতি অতি মনের ক্ষোভে,
কেমনে পাইব ভাবিয়া॥
আধ চাঁদ কিবা করে চিকিমিকি,
নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিকি,
প্রজ্বলিত হয় থাকি থাকি থাকি,
দেখে রিপু যায় ভাগিয়া॥

বিভূতি-ভূষণ মোহন বেশ,
তরুণ অরুণ অধরদেশ,
শব আভরণ গলায় শেষ, দেবের দেব যোগিয়া।
বৃষভ চলিছে থিমিকি থিমিকি,
বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি,
ধরত তাল দ্রিম্‌কি দিম্‌কি হরিগুণে হর নাচিয়া।
বদন-ইন্দু ঢল ঢল ঢল,
শিরে দ্রবময়ী করে টল টল,
লহরী উঠিল কল কল কল,
জটাজূটমাঝে থাকিয়া।
প্রসাদ কহিছে এ ভব-ঘোর
শিয়রে শমন করিছে জোর,
কাটিতে নারিনু করম ডোর,
নিজ গুণে লহ তারিয়া ॥১৬৩

(১৬৪)

পিলু বাহার—যৎ।

ওহে নূতন নেয়ে।
ভাঙ্গা নৌকা চল বেয়ে ॥
দুকূল রইল দূর, ঘন ঘন হানিছে চিকুর,
কেমন কেমন করে হে দেয়া,
মাঝ যমুনায় ভাসে খেয়া,
শুন ওহে গুণনিধি, নষ্ট হক ছানা দধি,
কিন্তু মনে করি এই খেদ।
কাণ্ডারী যাহার হরি, যদি ডুবে সেই তরী,
মিছে তবে হইবে হে বেদ ॥
যমুনা গভীরা ভাঙ্গা তরী, অবলা বালা কৃশোদরী
প্রাণরক্ষার তুমি মাত্র মূল।

অবসান হলো বেলা, এ কি পাতিয়াছ খেলা,
ঝটিৎ পারে চল প্রাণ নিতান্ত আকুল ॥
কহিছে প্রসাদ দাস, রসরাজ কিবা হাস,
কুলবধূর মনে বড় ভয়।
এক অঙ্গ আধা আধা, তোমারি অধীনা রাধা,
তাহে এত বাদ সাধা উচিত কি হয় ॥১৬৪

(১৬৫)

পিলু বাহার—যৎ।

ও নৌকা বাও হে ত্বরা করি নূতন কাণ্ডারী,
রঙ্গে ব্রজবধূর সঙ্গে ॥
আতপ লাঘব হেতু, তরুণী ভরা তরণী।
চালন কর মনের সঙ্গে।
আপন করহে পণ, চাও হে যৌবন ধন,
হাসভাস প্রেম-তরঙ্গে ॥
আগে চরাইতে ধেনু, বাজাইয়া মোহন বেণু,
বেড়াইতে রাখালের সঙ্গে।
এখন হয়েছ নেয়ে, কোন্ বা বিষয় পেয়ে,
ধেয়ে হাত দিতে এস অঙ্গে ॥
ভণে দাস রামপ্রসাদ, হায় এ কি পরমাদ,
কাজ কি হে কথার প্রসঙ্গে।
সময় উচিত কও, কোনরূপে পার হও,
দোষ আছে পাছে মন ভাঙ্গে ॥১৬৫

(১৬৬)

মূলতানী—একতালা।

কালীগুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে,
এ তনু-তরণী ত্বরা করি চল বেয়ে।
ভবের ভাবনা কিবা মনকে কর নেয়ে ॥
দক্ষিণ বাতাস মূলে পৃষ্ঠদেশে অনুকূল,
কাল রবে চেয়ে ॥
শিব নহেন মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অণিমাদি,
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী পলাইবে ধেয়ে ॥১৬৬

---

(১৬৭)

প্রসাদী সুর—একতালা।

বল দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে ॥
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি,
কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেহ বলে সালোক্য পাবি,
কেহ বলে সাযুজ্য মেলে ॥
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ,
ঘটের নাশকে মরণ বলে।
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য,
মান্য করে সব খোয়ালে ॥
এক ঘরেতে বাস করিছে পঞ্চ জনে মিলেজুলে।
সে যে সময় হইলে আপনা আপনি,
যে যার স্থানে যাবে চ'লে ॥
প্রসাদ বলে যা ছিল ভাই,
তাই হবি রে নিদানকালে।

যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়,
জল হয়ে সে মিশায় জলে ॥১৬৭

(১৬৮)

মূলতানী—একতালা।

নিতান্ত যাবে দিন এ দিন যাবে,
কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো ॥
এসেছিলাম ভবের হাটে,
হাট ক'রে বসেছি ঘাটে,
ও মা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে নায়ে লব গো ॥
দেশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়,
ও মা তার ঠাঁই যে চায়, সে কোথায় পাবে গো,
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে,
আসন দে না ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে,
ভবার্ণবে গো ॥১৬৮

(১৬৯)

প্রসাদী সুর—একতালা।

তারা! তোমার আর কি মনে আছে।
মা, এখন যেমন রাখলে সুখে,
তেম্নি সুখ কি পাছে ॥
শিব যদি হয় সত্যবাদী, তবে কি তোমায় সাধি,
মা গো, ও মা, ফাঁকির উপরে ফাঁকি,
ডান চক্ষু নাচে ॥

আর যদি থাকিত ঠাঁই,
তোমারে সাধিতাম নাই,
মা গো, ও মা, দিয়ে আশা, কাটলে পাশা,
তুলে দিয়ে গাছে ॥
প্রসাদ বলে মন দড়, দক্ষিণায় জোর বড়,
মা গো, ও মা আমার দফা হলো রফা,
দক্ষিণা হয়েছে ॥১৬৯

(১৭০)

প্রসাদী সুর—একতালা।

যাও গো জননি, জানি তোরে।
তারে দাও দ্বিগুণ সাজা মা,
যে তোর খোসামুদি করে ॥
মা মা ব'লে পাছু যে জন স্তুতি ভক্তি করে।
দুঃখে শোকে দগ্ধে তারে,
দাখিল করিস্ যমের ঘরে ॥
অল্পে কারে পাওয়া যায়, ক্ষীণ আলে বারি ধায়,
যে জন হয় শক্ত, তার ত্রিকাল মুক্ত জোর-জবরে।
চোখে আঙ্গুল না দিলে পর,
দেখ্‌বি না মা বিচার ক'রে ॥
ওমা হরের আরাধ্য পদ, ভয়ে দিলি মহিষাসুরে।
যে দু'কথা শোনাতে পারে,
যে জনা হেতের ধরে,
তার হয়ে আশ্রিত সদা
থাকিস্ মা পরাণের ডরে ॥
রামপ্রসাদ কৃতার্থ হবে, কৃপাকণা-জোরে।
সাধ রে শ্যামার পদ, এ নব ইন্দ্রিয় হরে ॥১৭০

(১৭১)

প্রসাদী সুর—একতালা।

অন্নপূর্ণার ধন্য কাশী,
শিব ধন্য কাশী ধন্য,
ধন্য ধন্য গো আনন্দময়ী ॥
ভাগীরথী বিরাজিত হয়ে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি।
উত্তরবাহিনী গঙ্গা জল চলেছে দিবানিশি
শিবের ত্রিশূলে কাশী,
বেষ্টিত বরুণা অসি,
তন্মধ্যে মরিলে জীব শিবের শরীরে মিশি।
কিঁ মহিমা অন্নপূর্ণার,
কেউ থাকে না উপবাসী।
ও মা রামপ্রসাদ অভুক্ত তোমার,
চরণ-ধূলার অভিলাষী ॥১৭১

(১৭২)

মা চেয়ে ভাল বিমাতা।
মায়ের আমার মায়া কোথা ॥
মায়ের যেটি ভাল ছেলে,
তার প্রতি স্নেহ-মমতা।
অকৃত সন্তানের প্রতি,
মা, চায় না ফিরে, কয় না কথা ॥
বিমাতায় নাই ভাল মন্দ,
দুঃখী তাপী সব সমতা।
ও তার ঘৃণা নাই পাতকী ব'লে,
মা কোলে লয়, যে যায় গো তথা ॥১৭২
(শেষ অংশ পাওয়া যায় নাই)

(১৭৩)

কি ধন দিবি আর কি তোর আছে ॥
তোর যত ছিল ধন-সম্পত্তি,
শিব আগে বুকে রেখেছে ॥
যে ধন তোমার ছিল তারা,
সে ধন ত সব ফুরায়েছে।
শিব সেই ধনকে ব্রহ্ম জেনে,
পদতলে প'ড়ে আছে।
তোমার ধনের মধ্যে অন্তে পদ,
সে ত শিবের সম্পদ পদ,
ভেবে শিব সে সম্পদ, নয়ন মুদে প'ড়ে আছে ॥
খেয়ে ভোলা সিদ্ধি গোলা,
নেশাতে ভোর হয়ে আছে।
ডাক্‌লে সাড়া দেয় না তারা,
ও সে ধনের ঘড়া ধ'রে আছে ॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ বলে,
সে ধনের অংশ দিতে হবে ব'লে,
চায় না ভোলা চক্ষু মিলে,
জেগে জেগে ঘুমায়েছে ॥১৭৩

—

(১৭৪.)

এবার আমি সার ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি ॥
ভাবীর কাছে ভাব পেয়ে মা,
সকল ভাবকে এক করেছি।
ত্রিশির মঙ্গলার মাঝে শুদ্ধ মন তায় রেখেছি ॥
এখন তোমার পদ তোমায় দিয়ে,
তোমাতে তোমায় সঁপেছি।

ভবের হাটে এসে এবার
বেচা কেনা সব করেছি ॥
জমার খাতে শূন্য দিয়ে খরচে দাখিল করেছি
চরণে মিশায়ে প্রাণ, নূপুরে মিশাইয়ে তান,
সেই দেশের এক গান শিখেছি।
কি নাম কি নাম বাজে তান মা,
কটাক্ষে ওস্তাদ মেনেছি ॥
প্রসাদ বলে পাপ পুণ্য
তোরে এবার দুই সঁপেছি।
এবার কালীনাম ব্রহ্ম জেনে
ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি ॥১৭৪

(১৭৫)

ওরে তারা বলে কেন না ডাকিলাম।
(আমার) এ তনু-তরণী ভব সাগরে ডুবালাম ॥
এ ভবতরঙ্গে তরী বাণিজ্যে আনিলাম।
(তাতে) ত্যজিয়া অমূল্যনিধি পাপে পূরাইলাম।
বিষম তরঙ্গ মাঝে চেয়ে না দেখিলাম।
মনডোরে ও চরণ হেলে না বাঁধিলাম ॥
প্রসাদ বলে মা গো আমি কি কার্য্য করিলাম
(আমার) তুফানে ডুবিল তরী আপনি মজিলাম ॥১৭৫

---

(১৭৬)

বাসনাতে দাও আগুন জেলে
ক্ষার হবে তার পরিপাটী।
কর মনকে ধোলাই, আপদ-বালাই
মনের ময়লা, ফেল কাটি ॥

কালীদহের কূলে চল,
সে জলে ধোপ ধরবে ভাল,
পাপ কাষ্ঠের আগুন জ্বাল
চাপায়ে চৈতন্যের ভাঁটি ॥১৭৬

(১৭৭)

ও মন তোর ভ্রম গেল না।
পেয়ে শক্তিতত্ত্ব হলি মত্ত,
হরিহর তোর এক হলো না ॥
বৃন্দাবন আর কাশীধামের
মূল কথা মনে বোঝ না।
কেবল ভবচক্রে বেড়াও ঘুরে
ক'রে আত্মপ্রতারণা ॥
যমুনা আর জাহ্নবীকে
এক ভাবে মনে মান না।
আমি বাঁশীর মর্ম্ম বুঝে (তোমার)
কর্ম্ম করা আর হ'ল না ॥
প্রসাদ বলে গণ্ডগোলে
এই যে কপট উপাসনা।
(তুমি) শ্যাম শ্যামাকে প্রভেদ কর,
চক্ষু থাক্‌তে হ'লে কানা ॥১৭৭

(১৭৮)

মন তোর এত ভাবনা কেনে।
একবার কালী ব'লে ব'স রে ধ্যানে ॥
জাঁকজমকে করলে পূজা
অহঙ্কার হয় মনে মনে।

তুমি লুকিয়ে তাঁরে করবে পূজা
জানবে না রে জগজ্জনে ॥
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি
কাজ কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি,
বসাও হৃদি-পদ্মাসনে ॥
আলো চাল আর পাকা কলা,
কাজ কি রে তোর আয়োজনে।
তুমি ভক্তি-সুধা খাইয়ে তাঁরে
তৃপ্তি কর আপন মনে ॥
ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো
কাজ কি রে তোর সে রোস্‌নাইয়ে,
তুমি মনোময় মাণিক্য জ্বেলে
দেও না জ্বলুক নিশি দিনে ॥
মেষ ছাগল মহিষাদি
কাজ কি রে তোর বলিদানে,
তুমি জয় কালী! জয় কালী! বোলে,
বলি দাও ষড়রিপুগণে ॥
প্রসাদ বলে ঢাকে ঢোলে,
কাজ কি তোর সে বাজনে।
তুমি জয় কালী বলি, দেও করতালি,
মন রাখ সেই শ্রীচরণে ॥১৭৮

---

(১৭৯)

চিন্তাময়ী তারা তুমি আমার চিন্তা করেছ কি ?
নামে জগচ্চিন্তাহরা,
কিন্তু কাজে কই মা তেমন দেখি ॥
প্রভাতে দাও অর্থ-চিন্তা,
মধ্যাহ্নে জঠর-চিন্তা,

সায়াহ্নে দাও অলস চিন্তা,
বল মা তোমায় কখন্ ডাকি ॥
দিয়েছ এক মায়া-চিন্তে,
ও মা ! সদাই করি তাই চিন্তে,
না পারিলাম তোমায় চিন্‌তে,
মা চিন্তা কূপে ডুবে থাকি ॥
ও মা ! তুই গো পাষাণের মেয়ে,
পরম চিন্তামণি পেয়ে,
রহিলি পাষাণী হ'য়ে,
রামপ্রসাদকে দিয়ে ফাঁকি ॥১৭৯

---

(১৮০)

মন কি কর ভবে আসিয়ে।
ওরে দিবা অবশেষ, অজপার শেষ,
ক্রমেতে নিঃশ্বাস যায় ফুরায়ে ॥
হং বর্ণ পুরকে হয়, সং বর্ণ রেচকে হয়,
অহনিশি কর জপ "হংস হংস" বলিয়ে ॥
অজপা হইলে সাঙ্গ, কোথা তব রবে রঙ্গ,
সকলি হইবে ভঙ্গ ভবানীরে গো ভাবিয়ে।
চলনে দ্বিগুণ ক্ষয়, ততোধিক নিদ্রায় হয়,
বিনয়ে রামপ্রসাদ কয় ততোধিক সঙ্গম সময়ে ॥১৮০

(১৮১)

দু'টো দুঃখের কথা কই।
দু'টো দুঃখের কথা কই গো তারা,
মনের কথা কই ॥
কে বলে তোমারে তারা দীন-দয়াময়ী।
কারেও দিলে ধন জন মা ! হস্তী রথী জয়ী ॥

আর কারো ভাগ্যে মজুর খাটা
শাকে অন্ন মিলে কই ॥
কেহ থাকে অট্টালিকায়,
আমার ইচ্ছা তেম্নি রই ॥
ওমা তারা কি তোর বাপের ঠাকুর,
আমি কেহ নই ॥
কারো অঙ্গে শাল-দোশালা ভাতে চিনি দই ।
আবার কারো ভাগ্যে শাকে বালি
ধানে ভরা খই ॥
কেউ বা বেড়ায় পাল্কী চড়ে,
আমি বোঝা বই ।
মা গো আমি কি তোর পাকা ধানে
দিয়াছি গো মই ॥
প্রসাদ বলে তোমায় ভুলে আমি জ্বালা সই ।
ও মা আমার ইচ্ছা অভয়পদে চরণধূলা হই ॥১৮১

(১৮২)

খাম্বাজ—দাদরা ।

আ মরি কি লাজের কথা মিন্সের উপর মাগী ।
পদে পড়িয়ে ভোলা অদ্ভূত এক যোগী ॥
এ কেমন নির্লজ্জ মেয়ে, পতির উপর চরণ দিয়ে,
রয়েছে উলাঙ্গী হ’য়ে রণ-অনুরাগী !
নয়নে দেখনা চেয়ে, শিব আছেন শব হ’য়ে,
এ কি সর্ব্বনাশী মেয়ে লজ্জা সরম ত্যাগী ॥১৮২

(১৮৩)

ভৈরবী—যৎ ।

নেংটা মেয়ের এত আদর জটে বেটাইত বাড়ালে ।
নইলে কেন ডাকতে হবে দিবানিশি মা মা বলে ॥

শ্রীরাম জগতের গুরু, জটে বেটা তার গুরু,
আপনি বেটা বুঝলে না কে রইলো শ্যামার চরণতলে ॥১৮৩

(১৮৪)

ভৈরবী।

ন্যাংটা মেয়ে কালী।
দোষ করিলে রোষ করে না, তারেইত মা বলি ॥
আপন মায়ে যেমন করে যতন জানত সকলি।
পাগলের মন যখন যেমন তখনই যায় ভুলি ॥
ডাকিনী যোগিনী, কত ভূতের হুলাহুলি।
যত দেবের প্রধান বিষ্ণু ঈশান তারাও কৃতাঞ্জলি ॥
প্রসাদ বলে নির্জঞ্জালে যদি যাবি চলি।
সকল ছেড়ে হৃদ্‌মাঝারে ভাবরে মুণ্ডমালী ॥১৮৪

(১৮৫)

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ।

সাধে কি করুণাময়ী করি মা তোর উপাসনা।
কাল ভয় না থাকিলে, কেউ তোমারে সাধিত না ॥
কোথা গো মা আদ্যাশক্তি, তব নামে জীব-মুক্তি।
কার হেন আছে শক্তি বিনা তুমি ত্রিনয়না ॥১৮৫

(১৮৬)

ভৈরবী—যৎ।

যে হয় পাষাণের মেয়ে তার হৃদে কি দয়া থাকে।
দয়া-হীনা না হ'লে কি লাথি মারে নাথের বুকে ॥
দয়াময়ী নাম জগতে, দয়ার লেশ মা নাই তোমাতে,
গলে পর মুণ্ডমালা, পরের ছেলের মাথা কেটে।
মা মা ব'লে যত ডাকি, শুনেও ত মা শুন নাকি,
প্রসাদ এম্নি নাথি খেগো তবু দুর্গা ব'লে ডাকে ॥১৮৬

(১৮৭)

মন তোমারে করি মানা।
তুমি পরের আশা আর করো না॥
তুমি বা কার কেবা তোমার ভেবে মর কার ভাবনা।
ওরে তোর ভাবনা কেউ ভাবে না, ভাব দেখে কি যায় না জানা॥
সুখের ভাগী অনেকে হয়, দুঃখের দুঃখী কেউ হবে না।
যখন শমন এসে ধরবে কেশে তখন কেবল ত্রিনয়না॥
সুদিন দেখে অধীন জনে করবে কত উপাসনা।
যেদিন কুদিন হবে প্রসাদ বলে, সেদিন অধীন কেউ রবে না॥ ১৮৭

(১৮৮)

মন তোমার একি বিবেচনা।
তোমায় বুঝাইলে তো বুঝ না॥
কর গৃহ সুবিস্তার, গৃহে রত্ন অগণনা।
আছে মহাগ্রহ রবিসুত, সে গ্রহ শান্তি কর না॥
গৃহে তব গৃহভেদী, আছে গ্রহ যে ছ'জনা।
তারা নিজ গৃহে থেকে করে গৃহদাহ কুমন্ত্রণা॥
তারাপদ গৃহ কর, ত্যজি গ্রহ সে ছ'জনা।
রামপ্রসাদ বলে সকল গ্রহের গৃহ শ্যামা ত্রিনয়না॥১৮৮

---

(১৮৯)

মন তোমার একি বাসনা।
কেন অহরহ কর কুবাসনা॥
ষড়্‌রিপু বশে বাস, অবাসনা উপাসনা।
যদি স্ববশে না বাস কর কিসে পাবে শবাসনা॥
ভাই বন্ধু দারাসুত ভালবাস সে বাসনা।
যেদিন রবিসুত বশে বাস, এবাসে বাস হবে না॥
ষড়্‌ ঐশ্বর্য্যে বাস, কোটি রত্নেতে ভূষণা।
রামপ্রসাদ বলে শূন্যবাস যে বাসে নাই বিবসনা॥১৮৯

(১৯০)

কই তারা তোর বিবেচনা।
তাই বলি গো শ্যামা ত্রিনয়না॥
যাব ভবপারে কেমন করে, কি আছে মোর সম্ভাবনা॥
অকৃতী সন্তান জননীর হয় ভাবনা।
ও মা তোমার কেন উল্টা বিচার, অধিকন্তু দাও যাতনা॥
জান না সন্তানের স্নেহ, জননী তব ছিল না।
ও মা পাষাণ কন্যে পাষাণ হ'লে, মলেও তো চেয়ে দেখ না॥
নির্গুণ রামপ্রসাদ তোর, ব'লে মা সন্তান ছেড় না।
কর মা হ'য়ে মা বিড়ম্বনা, কলঙ্কেরি ভয় রাখ না॥১৯০

---

(১৯১)

ভাল মা ভাল এ মন্ত্রণা।
যারে খেদাইলে তার উঠন চষি, করেছ কি এই বাসনা॥
সাধের ঘরে বাদ সেধেছ দিয়ে ছ'টা বাদী সেনা।
তারা আপন আপন পক্ষে টানে, নিমকের সর্ত্ত মানেনা॥
এক হাটে দুই দর করেছ, এই কি মা তোর বিবেচনা।
কারু শাকে দেও বালি; কারু দুগ্ধেতে দেও চিনির পানা॥
প্রসাদ বলে, বলবো কি মা, বলতে কিছু চায় রসনা।
ঐ যে জোরকা লাঠি শিরকা উপর, আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝেনা॥১৯১

---

(১৯২)

এবার ভেবে হলেম সারা।
হ'ল পাঁচ পাগলে বসত করা॥
মাতা ক্ষেপী পিতা ক্ষেপা, চেলা দু'টো ক্ষেপা তারা।
মা তোর অভয়পদ চিন্তা করে, আমি হলেম পাগলপারা॥
তেমন ক্ষেপা কে দেখেছে, হৃদিপদ্মে পদধরা।
ঐ যে ত্যজ্য করে সোণার কাশী শ্মশানে বসতি করা॥

ঘরের কথা বলবো কারে, যেমন হাঁড়ি তেম্নি শরা।
ওবে এমন মেয়ে আর কে আছে, মুণ্ডমালা গলায় পরা॥
প্রসাদ বলে, দেখে শুনে, আমি হলেম দিশেহারা।
মা তুই যা করিস্ তা করিস্ মেনে, শমন ভয়টি ক্ষান্ত করা॥১৯২

(১৯৩)

বাঁচিতে সাধ আর নাই মা তারা।
আমি 'তারা তারা তারা' বলে ধ'নে প্রাণে হলেম সারা॥
জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী ত্রিজগদুদরে ধরা।
ওমা আমি কি তোর ধর্ম্মছেলে, আকাশ ফোঁড়া মোফৎখোরা॥
যদি বল দোষী পুত্র, দোষাদোষের তুমি সূত্র।
আমি উপলক্ষ মাত্র, মায়াপাশে আছি ঘেরা॥
নামে কালের ভয় থাকে না, শিবের বচন আছে ধরা।
এখন কালগুণে সে কালের কথা, ভুলে হলি ভয়ঙ্করা॥
প্রসাদ বলে, তোমার লীলা (মা), সাধ্য কি যে বুঝতে পারা।
ঐ যে রাখা মারা স্বভাব তোমার, কেবল আমায় কল্লে জীয়ন্তে মরা॥১৯৩

(১৯৪)

শমনজয়ী হুকুম পেয়েছি।
শ্যামা মায়ের হুজুর থেকে, (আমি)॥
মা দিয়েছেন ব্রহ্ম অস্ত্র, হৃদয়-তূণে রেখেছি।
আমি করে যতন পুরশ্চরণ, তীক্ষ্ণ খর শান করেছি॥
ঘরভেদী যে ছ'জন ছিল, তাদের পরাজয় করেছি।
এবার যমকে মেরে যাব চলে, সেইটা মনে সার ভেবেছি॥
রাম করেছেন লঙ্কা জয়, নীলকমলে চরণ পূজি।
আমি শতদল দিয়ে সে পদে, ডঙ্কা মেরে বসে আছি॥
প্রসাদ বলে, সাধ করে কি, সে অভয়পদে ডুবেছি।
যাতে মরণ হয় না শরণ নিলে, তাই সে পদে প্রাণ সঁপেছি॥১৯৪

(১৯৫)

আছে তোমার মা মনে কত।
কেবল সার হ'ল ভ্রমণ পথ ॥
হয়ে তারিণী তনয় গেল মা আলয়, হব গিয়ে কার অনুগত।
ছিল ভগ্ন ঘরখানি মা, দেখিতে সে শোভান্বিত ॥
ওমা ভূতের বাসা হ'ল সেটা, দশদিশি সশঙ্কিত।
পাপ-লোনা লাগি দেওয়াল করিলেক জরাযুত।
আমার চালের বাঁধন ফেল্লে কেটে ছ'টা রুয়ে অবিরত ॥
প্রসাদ বলে, ওমা তারা, বল কিসে হবে হিত।
আমায় ঘর বেঁধে ঘর করতে হ'লে, এ কাল আখেরের মত ॥১৯৫

(১৯৬)

কও শমন কি মনে করে।
নাহি লাজ এলে সাজ করে ॥
আমি সে দফা করেছি রফা কালীনামে কবজ পুরে ॥
আশা ক'রে এলে যদি, খালি মুখে যাবে ফিরে।
আছে ষড়্‌রিপু ক'রে কাবু, নে যা বাপু দেই গো ধরে ॥
জারিজুরি কর কিরে ঘর নাই তোর অধিকারে।
আমি কালীনামে চৌহদ্দি পাঁটা লয়েছি খারিজ ক'রে ॥
প্রসাদ বলে, যাওনা চলে, ভয় নাহি তোরে অন্তরে।
সে যে মা মোর কালী মুণ্ডমালী, আজি বলি লবেন তোরে ॥১৯৬

(১৯৭)

শমন কি ভয় দেখাও আসি।
আমি যাব কাশীনাথের কাশী ॥
শেষে 'বব বম্ বম্ শিব' মুখে ব'লে হব সন্ন্যাসী ॥
বারাণসী থাকবো বসি, দূরে যাবে পাপরাশি।
আমি কালী ব'লে কাটিব কাল, কাল বেড়াও কি আমায় শাসি ॥

মহাকাল সে রাজ্যের রাজা, পঞ্চাননের পঞ্চক্রোশী।
নাহি কালের ভয় তথা আছে, মা মোর কালী কাল-বিনাশী
হালিসহর পরগণায় বসত, কুমারহট্ট গ্রামবাসী।
সে যে রামপ্রসাদ কিঙ্কর, ভদ্রকালী পদ অভিলাষী ॥১৯৭

(১৯৮)

জননী তাই ভাব্‌ছি বসি।
শমন বারে বারে করে আমায় দোষী ॥
আবাদ করি কেমন ক'রে, বল দেখি মা মুক্তকেশী।
ওমা ছ'জন পেয়াদা করে কায়দা মসীল আছে দিবানিশি ॥
প্রসাদ বলে ধন্য ধন্য পুণ্যহীনের জন্য কাশী।
ঘুচাই দুরন্ত এ ভ্রান্ত জালা, দে মা স্থান বারাণসী ॥১৯৮

(১৯৯)

মন কেন হও কর্ম্মদোষী।
এই অসার সংসারে আসি ॥
রিপু ছয় দুরাশয়, দুগ্ধকলা দিয়া পুষি।
তুমি তাদের বশে যা কর, শেষে বিষে দগ্ধ ভস্মরাশি ॥
রবিসুত দূত, দণ্ডহাতে সে যে আছে শিয়রে বসি।
তারে সাধিলে না করে দয়া, বাঁধে গলায় রশা-রশি ॥
ধন-জন-পরিবার, যাদের পেয়ে বড় খুসি।
তারা সময় কালে কেউ কার নয়, একা যাই আর একা আসি
প্রসাদ বলে ভাব্‌তে গেলে, নিশির স্বপন কান্নাহাসি।
যদি সকল দোষে মুক্ত হবে, ভাব শ্যামা এলোকেশী ॥১৯৯

(২০০)

আর হব না গঙ্গাবাসী।
গঙ্গার সতীনপো সম্বন্ধে আসি ॥
পিতার ভালে অগ্নি জ্বলে, শিরে গঙ্গা অহর্নিশি।

জননী সংসার পালেন, কোপ করে তার বুকে বসি ॥
বিমাতার চরিত্র যেমন, কত আর, বলিব প্রকাশি।
তার সাক্ষী দেখ কৈকেয়ী কর্ল্লে রামকে জটাবাকলবাসী ॥
রামপ্রসাদ দাসে ভণে, এই মনে অভিলাষী।
একস্থানে পাই তিনে যদি, যাই না তবে বারাণসী ॥২০০

(২০১)

এ যে বড় বিষম লেঠা।
যেটা কবুলতি সেই সত্য হ'ল, মিথ্যে ক'রে দিলি পাটা ॥
এক জনাকে জমী দিলি মা, ভাগ করিয়ে দিলি ছ'টা।
এবার ভবেতে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে, আমায় সইতে হ'ল খোঁটা ॥
জমী জরিপ ক'রে দিলি মা, কোণে কোণে মেপে কাঠা।
এবার কিস্তির সময় বুঝবে শম্ভু, আমি কেমন কালীর বেটা ॥
প্রসাদ বলে ওমা তারা, এবার কেমন উল্টা লেঠা।
আমি কিস্তিমত খাজানা দিলেম, তবু টাকায় সিকি বাটা ॥২০১

(২০২)

ঘর সামালা বিষম লেঠা।
ঘরের কর্ত্তা সে যে নয়কো আঁটা ॥
যার ইচ্ছে সেই তা করে, আপনা আপনি দেখে যোটা।
এ ঘর নয় ঘোরে পড়ে, করলে আমায় লাটাপাটা ॥
ঘরের গিন্নি পড়ে ঘুমায়, দিবারাত্রে নাইকো উঠা।
সে মাগী কি সাধে ঘুমায়, মিন্সের সঙ্গে আছে যোটা ॥
প্রসাদ বলে না নড়ালে, সে ঘুমেতে জাগায় কেটা।
মাগী একবার জাগ্‌লে পরে, ত্রাসে সবাই হবে কাঁটা ॥২০২

(২০৩)

মা আমার অন্তরে ছিলে।
বুঝি দোষ দেখে অন্তরে গেলে ॥
ও কথা কি বলবের কথা, কথা সই জননী ব'লে।

যদি দোষী তুমি নির্দ্দোষী তুমি তবে আমার কি দোষ পেলে ॥
উন্মাতে হও উগ্রচণ্ডা, উচিত কথা কইতে গেলে।
আছে শিবের কথা যে কথা মা সে কথা কি শিকেয় থুলে ॥
দু'টি আঁখি ছলছল, সভয়ে রামপ্রসাদ বলে।
আমায় যেমন রাখ তেমনি থাকি, তবে আমার কি দোষ পেলে ॥২০৩

(২০৪)

তাই ডাকি শ্রীদুর্গা বলে।
আছে চরণ-তরী ভবের কূলে ॥
তন্ত্রে তুমি স্বতঃসিদ্ধ মা, মন্ত্রে মন্ত্রী বিশ্বমূলে।
এবার ভবে এসে কর্ম্মদোষে রয়েছি মা স্থূলে ভুলে ॥
ত্রিধারা যাঁর শিরে ধরা, সে পড়ে তোর পদতলে।
রামপ্রসাদ বলে অন্তিমকালে, দেখা দিও মা অন্তর্জলে ॥২০৪

(২০৫)

মাগো বলেছে বুড়া।
যে ও চরণে প্রাণ সঁপেছে সে সবাকার মাথার চূড়া ॥
যেখানে আছে এ ভোগ, সেখানে নাহিক রোগ।
ওর ভজনে এই হয়, গাছের পাড়া তলার কুড়া ॥
ওর ভজনে স্বেচ্ছাচারী, কেহ নয় মা ব্রহ্মচারী।
ওগো নানাতীর্থ পর্যটনে, শেষে করে মাথামুড়া ॥
কৌতুকে প্রসাদ ভণে বাসনা আমার মনে।
আমায় লোকে বলুক রামপ্রসাদ, তোমার মুখে দেই গো মুড়া ॥২০৫

(২০৬)

এবার আমার বিপদ ভারি।
আমার মন ঘুমাল মায়া ঘুমে,
বল মা কিসে চেতন করি ॥
নবদ্বারঘর বেঁধেছিলাম মা,
রেখেছিলাম ন'জন দ্বারী।

ও তার প্রধান দ্বারী রসনারে,
কিছুতে বাগাতে নারি ॥
লোকে বলে রামপ্রসাদ পাগল,
ভাষা কবি আমি করি ।
আমার এ যে ভাষা কি তামাসা,
ব'লে না বুঝাতে পারি ॥২০৬

(২০৭)

এই নিবেদন করি কালী ।
কেন দুঃখের বোঝা আমায় দিলি ॥
দিবানিশি মুদে আঁখি, 'কালী কালী' সদাই বলি ।
ওমা তাইতে কি দীন-দয়াময়ী, আমার প্রতি নিদয়া হলি ॥
শুন বলি ওমা কালী, সাধ ক'রে কি পাষাণ বলি ।
ওমা আমায় ফাঁকি দিয়ে তারা, অভয়চরণ শিবকে দিলি ॥
মা হ'য়ে মা ওমা তারা, ছেলের দশা এই করিলি ।
এবার ভবে এনে রামপ্রসাদকে, জন্ম অন্ধ ক'রে থুলি ॥২০৭

———

(২০৮)

অবোধ মন তাই তোরে বলি ।
তুই অজ্ঞান পতঙ্গ হ'য়ে জ্ঞান-প্রদীপটি নিবাইলি ॥
ভেবেছ যে ভদ্র হবে, ভাই বন্ধু আছে বলি ।
তাদের আত্মতা জীবনাবধি, কেউ ছোঁবে না মৃত্যু হলি ॥
যদি বল এ পাপ দেহ, মুক্ত হবে তীর্থে গেলি ।
ঐ যে 'গঙ্গায়াং জ্ঞানত মোক্ষ' ব্যাস লিখিছেন হস্তে তুলি ॥
প্রসাদ বলে তীর্থযাত্রী, মুক্তি যুক্তি হয় সকলি ।
যদি দিনান্তে একান্ত মনে, একবার বল কালী কালী ॥২০৮

(২০৯)

বল মন মলে কোথায় যাবি।
আমার মনের সঙ্গে মন মেলেনা তাইতে
আকাশ-পাতাল ভাবি॥
অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে মন,
কতইবার আস্‌বি যাবি।
এবার আসা যাওয়ায় ক্লান্ত হ'য়ে
কবে ভবে মরতে পাবি॥
পড়ে শুনে বিদ্যারত্ন, ভিক্ষারত্ন উপজীবী।
তোমার জ্ঞানরত্নে যে অযত্ন, নিত্যরত্ন কিসে পাবি॥
কালীপদ সুধাহ্রদে, সুধাপানে শুদ্ধ হবি।
রামপ্রসাদ বলে মৃত্যুকালে, মুক্তিপদে মিশাইবি॥২০৯

(২১০)

একি লিখেছ কপাল জুড়ে।
ঐ যে দিনান্তে শ্রীদুর্গানাম বলে না রসনা ভেড়ে॥
ভার নয় বোঝা নয় মা, কেবল ঘাটের মাটি খুঁড়ে।
তাতে বিল্বপত্র দিতে শক্তি হয় না! কেনে জটের মুড়ে॥
প্রসাদ বলে ওমা তারা, হ'য়ে আছি আদি কুড়ো।
আমার ছয় রিপু ছয় পেয়াদা হ'য়ে জপের
মালা নিলে কেড়ে॥২১০

(২১১)

তাই কালো রূপ ভালবাসি।
করে শমন দমন ধ'রে অসি॥
দলবল আট রমণী, তারা সব এক বয়েসী।
তার মাঝে মাঝে থাকেন যেমন, তারাগণ মধ্যে শশী।

পদতলে ত্রিপুরারি পড়ে আছেন দিবানিশি।
শ্যামা ব্রহ্মময়ী, রণজয়ী, উমা মুখে মৃদুহাসি ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মা আদি, ধ্যানে না পায় যোগী ঋষি।
আমি মুদে আঁখি, হৃদে দেখি, মা মোর বামা এলোকেশী ॥২১১

(২১২)

আয় মন ব্যাপারে যাবি।
ক'রে সাধুসঙ্গে বেচাকেনা, মুনফা দ্বিগুণ পাবি ॥
গুরুদত্ত যে ধন আছে,
দেহতরী সাজিয়ে নিবি।
ওরে মূল মাস্তলে বাদাম তুলে
দুর্গা ব'লে বেয়ে যাবি ॥
কামাদি তুফানে, হাল দমনে সতর্ক হবি।
ওরে জ্ঞান কিনারায় লাগিয়ে তরী
ভক্তি ডোরে বেঁধে থুবি ॥
প্রসাদ বলে সাধু বাণিজ্যে,
যে ধন ব্যাপারে পাবি।
সে ধন বিলাইলে ফুরাবে না,
যখন চাবি তখন পাবি ॥২১২

(২১৩)

আমার মন যদি হও মনের মত।
থাক রামপ্রসাদের অনুগত ॥
কুগ্রাম বসতি ত্যজ, ত্যজ বন্ধু দারাসুত।
কালী-কল্পতরু মূলে বাস, কর এ জনমের মত ॥
কামাদি বিপক্ষ ছ'টা, তাদের কর বশীভূত।
মন জেনেছ তো সে যন্ত্রণা, জননী জঠরে যত ॥
তোমার রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিয়ে, পালাইবে রবিসুত।
তুমি পরমার্থ পাবে নিত্য, তাই তোমারে সাধি এত ॥২১৩

(২১৪)

মন চাইরে মনের মত।
এমন আছে যোগী কত শত॥
বাঁধিয়ে মাথায় জটা, করে ফোঁটা ঋষির মত।
তারা বলে এক করে আর, আছে বটবৃক্ষ মত॥
পাষাণ পূজে হর যদি পায়, শুনরে অজ্ঞান যত।
তবে আমি দিবানিশি, বসি বসি পাহাড় পূজি অবিরত।
যদি বল নয়ন মুদে থাকলে পাব গুরুপদ।
তবে পায় না কেন আপন ধনে, অন্ধ আছে পড়ে কত॥
প্রসাদ বলে মাকে বলরে মন দিবে তোর মনের মত।
তারি সাধিলে হইবে সিদ্ধি বাধ্য হবে রিপু যত॥২১৪

(২১৫)

মন কি যাবি জগন্নাথে।
খাবি আনন্দ বাজারে ভাত ভক্তি রেখে আপন্ন মাথে॥
জগন্নাথ আত্মারাম, হৃদিপদ্মে তাঁর ধাম।
পূর্ণ হবে মনস্কাম ভজলে তাঁরে অন্তরেতে॥
ঘরে আছে পরম রত্ন, ভ্রান্তিক্রমে কাচে যত্ন।
ওরে মিছে কেন ভ্রমণ করা, ভ্রান্তি সে ত' সাথে সাথে॥
গুরুবাক্য শিরে ধর, আত্মতত্ত্ব তত্ত্ব কর।
বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব, রাখ নিয়ে পাতে পাতে॥
প্রসাদ বলে যাব কোথা, মাথা নেই তার মাথা ব্যথা।
ওরে এ যেন রাতকাণার কথা, উড়ে বেড়ায় বাতে বাতে॥২১৫

---

(২১৬)

কে জানে শ্যামা তুমি কেমন।
তুমি কখন হাসাও কখন কাঁদাও যেরূপ রাখ মা যখন।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা দু'দিক পার, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥

কারু দেও ইন্দ্রত্ব পদ মা, কারু কর দুঃখের ভাজন।
কারু স্বর্ণ অলঙ্কারে সাজাও, কারু হরণ কর জীর্ণ বসন॥
দুঃখের কথা বলবো কারে, মায়েপুতে ব্যবহার যেমন।
আমি সে সব ছেড়ে আছি পড়ে, ভেবে দু'টি অভয়চরণ॥
প্রসাদ বলে হতো যদি মা, আর কিছুতে শমন দমন।
এমন হতভাগা কে আছে যে তায় করিত এখন তখন॥ ২১৭

(২১৮)

মন তোরে বুঝাব কি ব'লে।
যেমন ভোজের বাজি কারসাজি তেম্নি ফাঁকি শ্যামার লীলে॥
শবকে কোরে শিবের আকার, রাখলে আপন পদতলে।
লোকে দেখলে বল্‌বে সতী হ'য়ে, পতির বুকে চরণ দিলে॥
আপনি হ'য়ে কালের স্বরূপ, মা দাঁড়িয়ে মুক্তিপথ আগুলে।
তাঁরে ভক্তি ক'রে পূজলে পরে, মায়ের মত করবে কোলে॥
আপনি মৎস্য আপনি ধীবর মা, আপনি খেলা করেন জলে।
রামপ্রসাদ বলে সাধ কোরে কি, শ্যামার মায়ায় জগৎ ভুলে॥ ২১৮

(২১৯)

হও রে মন কাশীবাসী।
দেহ হৃদকমলে বারাণসী॥
উত্তরে ইড়া বরুণা, দক্ষিণে পিঙ্গলা অসি।
সুষুম্না মণিকর্ণি, পূর্বে গঙ্গা অর্দ্ধশশী॥
ব্রহ্মচারী ভাব বিচারি, নিবাস সন্তোষপুরী।
বিশ্বেশ্বর রাজ্যবাসী, বিশ্বেশ্বর রাজমহিষী॥
প্রসাদ ভণে, ও চরণে জবা দেও রাশি রাশি।
মায়ের চরণতলে পড়ে ভোলা, গয়াগঙ্গা বারাণসী॥ ২১৯

(২২০)

শমন তোমায় ভয় কি রে।
তোর ভয় রাখিনে শ্যামা মায়ের জোরে॥
মা আমার ব্রহ্মাণ্ডের রাজা তোর অধিকার কি আছে রে।
আমি শুনেছি পুরাণের কথা, চরণতরী ভবের পারে॥
ব্রহ্মার ব্রহ্মত্বপদ, যে পদে ব্রহ্মাণ্ড ধরে।
ও রে বলবো কিসে পদের মজা, পাগল করে পাগলেরে॥
চন্দনে চর্চ্চিত জবা, সে পদে যে দিতে পারে।
ও রে তার কি আছে যমের ভয়, সে যমকে পাঠায় যমের ঘরে॥
ভেবেছ কি ভোগা দিয়ে ভুলাবে রামপ্রসাদেরে।
আমি আর কি ভুলি, অভয়পদে জন্মের মত ডুবেছি রে॥ ২২০

(২২১)

বল গো মা উপায় কি করি।
আমি এবার বুঝি প্রাণে মরি॥
পতিত জমী দিয়ে আমায় মা, রাখলে আমায় পতিত করি।
জমী আবাদ করতে গেলে হয় মা ভূতের সঙ্গে মারামারি॥
মহামন্ত্র বীজ করি মা যদি জমী আবাদ করি।
রিপু ছ'জন জুটে, খায় মা লুটে, হয় না তাহে চারাচুরি॥
মন আখেরী হ'লে গো মা, শমন করবে শমন জারি।
জমী নাই কো হাসিল, করলে তসীল, কিসে হবে মালগুজারী॥
দীন রামপ্রসাদ বলে, মা, এই নিবেদন তোমায় করি।
আমার মৃত্যুকালে চরণতলে স্থান দিও মা ও শঙ্করী॥ ২২১

(২২২)

যদি যাবি মন ভবনদী পারে।
একবার ডাক দেখি শ্যামা মারে॥

যুগল চরণ তরি
সহায় করি,
মনকে মাঝির স্বরূপ ক'রে।
দাঁড়ি রিপু ছ'জন
করবে দমন,
নইলে ঘটবে বিপদ ঘোর পাথারে॥
আগে যুক্তি ক'রে দেখ
শেষে সময় মিলিবে নাক,
প্রসাদ বলে, ঘোর তরঙ্গে ডুবাবে তোরে
ঐ ছ'জনায় যুক্তি ক'রে॥ ২২২

(২২৩)

তারা ব'লে হব সারা।
এবার দেখবো বাদী ছ'জন যারা।
হৃদ্‌কমলোপরে দোলে, শবশিবে আলো করা।
তারা নামের মর্ম্ম পরম ব্রহ্ম, সুধারসে বদন ভরা॥ ২২৩

———

(২২৪)

আমি হব না তীর্থবাসী।
মরব গলে দিয়ে তোর নামের ফাঁসি॥
সবে করে গয়া কাশী, আমি করি পাপ রাশি রাশি।
সে যে এমন তীর্থ নাই কো যাতে, আমার পাপ করে নির্দ্দোষী॥
পিতৃপুরুষ উদ্ধারিতে, সবে করে গয়া কাশী।
করে সেই পায়েতে পিণ্ডদান, পরে করে তার দিবসী॥ ২২৪

(২২৫)

কাজ কি আমার মুক্তিপদে।
যদি ভক্তি থাকে দুর্গানামে মাকে ডাকি মনের সাধে॥

সালোক্য সাযুজ্য মুক্তি, নির্ব্বাণ আদেশ শিব উক্তি।
ভক্তি মুক্তি করতলে, আদ্যাশক্তি যার হৃদে॥
কালী নামের পেলে অন্ত, কি করবে রে সে কৃতান্ত।
শ্যামার চরণ পাব অন্তে, তুচ্ছ করি ব্রহ্মপদে॥ ২২৫

(২২৬)

মন আমার কি ভাবছো বল।
মুখে জয় দুর্গা শ্রীদুর্গা বল।

*　　*　　*

এই ভবের চড়ায় তনুর জাহাজ ডুবে বুঝি প্রায় গরভ হ'ল॥
চড়া কেটে যদি যাবে উপায় বলি শুন তবে।
ও মন মহামন্ত্র দমকলেতে গঙ্গাজলে সেঁচে ফেল॥ ২২৬

---

(২২৭)

কাজ কি থেকে কালের ফাঁসে।
শ্যামা মায়ের চরণ,
ভাব ও রে মন,
হবে শমন দমন অনায়াসে॥
রেখে ভক্তি মায়ের পদে,
তবে যাবি ঘোর বিপদে,
কেন মিছে মত্ত বিষয়মদে
কিছুই ত পাবি নে শেষে॥ ২২৭

(২২৮)

শমন আমি কি তোর খাজনা ধারি।
শ্যামা ত্রিভুবনের কর্ত্রী, তুমি কেবল পাটোয়ারী॥
তুমি যেমন আমি তেমন, তোমায় আমায় ভায়াচারী।
শোন রে শমন দুরাচার করো না আর জোর জাবরী॥
দুর্গানামের আল্‌তা কবচ বৃথা কি আমি হৃদয়ে ধরি॥ ২২৮

(২২৯)

নিতি তোয় বুঝাবে কেটা।
ঐ যে শিয়রে শমন,
না ভাবিলি মন,
এ কেমন তোর বুকের পাটা॥
ধন উপার্জ্জন,
যত কর মন,
কোথা রবে তোর টাকা কোটা।
কেবল মৃত্যুকালে সঙ্গে দেবে ঊর্ণাতন্তু ছেঁড়া চেটা।
দয়া মায়া স্নেহ মোহ জেনেছ ত আছে যটা।
যখন রবিসুত আসি
বাঁধবে কষি,
কি করবে তোর খুড়া জেটা॥
যা হবার তা হ'ল
কালী কালী বল,
আপনা আপনি হও আঁটাসাঁটা।
রামপ্রসাদ বলে
কালী ব'লে গেলে
ফুটবে না তোর পায়ে কাঁটা॥ ২২৯

---

(২৩০)

নিতি তোয় বুঝাবে কেটা।
ছি ছি মন তুই বড় ঠেঁটা॥
স্নেহে বল আপন আপন ভাই বন্ধু দারা বেটা।
যখন রবিসুত এসে
ধরিবে গো কেশে,
কি করিবে তোর খুড়া জেটা।
স্বর্ণতুল্য অট্টালিকা শোভে তাহে আশাসোঁটা।
ও কিছুই ত সঙ্গে যাবে না, পড়ে রবে দালান কোটা॥

পেয়েছ রাজত্বপদ, মনের মত মন্ত্রী ছ'টা।
তারা ডুবাবে ভবসাগরে, বারেক না ভাব সেটা॥
দিয়ে তুড়ি এই ছয় কুড়ি, কালী কালী ব'লে কাটা।
রামপ্রসাদ বলে, কুতূহলে, তবেই ত সব ঘুচবে লেটা॥ ২৩০

(২৩১)

তোমার কে মা বুঝবে লীলে।
তুমি কি নিলে কি ফিরিয়ে দিলে॥
তুমি দিয়ে নিচ্চো তুমি, বাছ রাখ না সাঁঝ সকালে।
তোমার অসীম কার্য্য অনিবার্য্য, মাপাও যেমন যার কপালে॥
তোমার অভিসন্ধি পদে বন্দী, ভোলানাথই যাচ্ছে ভুলে।
তুমি যেমন দেখাও তেমনি দেখি, জলেই তুমি ভাসাও শিলে॥
তোমার জারিজুরি আমার কাছে, খাটবে না মা কোন কালে।
ও সব ইন্দ্রজালের মন্ত্র জানে, রামপ্রসাদ যে তোমার ছেলে॥ ২৩১

(২৩২)

রইলি না মন আমার বশে।
ত্যজে কমলদলের অমল মধু, মত্ত হলি বিষয় রসে॥
শক্তি কুলকুণ্ডলিনী, তারেও ত মন জাগালি নে।
হেরে গুড়ের কলস হলি অলস, এমন অবশ হলি কিসে॥
এ দেহ পাঁচ ফুলের সাজি, তুই হলি নে কাজের কাজী।
প্রসাদ বলে, রত্ন ত্যজি ঘুরে মর কর্ম্ম দোষে॥ ২৩২

দ্বিতীয় শ্রেণীর গান

(১)

মা মা ব'লে আর ডাকব না।
ও মা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা ॥
ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী,
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা ব'লে আর কোলে যাব না ॥
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে,
মা কি রয়েছ চক্ষুকর্ণ খেয়ে,
মা বিদ্যমানে, এ দুঃখ সন্তানে,
মা ম'লে কি আর ছেলে বাঁচে না ॥ ১

(২)

ভাল নাই মোর কোন কালে।
ভাল যদি থাক্‌বে আমার
মন কেন কুপথে চলে ॥
হেদে গো মা দশভুজা,
আমার ভবে তনু হইল বোঝা,
আমি না করিলাম তোমার পূজা,
জবা বিল্ব গঙ্গাজলে ॥
এ ভব-সংসারে আসি, না করিলাম গয়া কাশী,
যখন শমনে ধরিবে আসি,
ডাকৃব কালী কালী ব'লে।

দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, তৃণ হ'য়ে ভাসি জলে,
আমি ডাকি ধর ধর ব'লে,
কে ধ'রে তুলিবে কূলে ॥ ২

———

(৩)

আমার কপাল গো তারা।
ভাল নয় মা, ভাল নয় মা,
ভাল নয় মা, কোন কালে।
শিশুকালে পিতা মলো
মা গো রাজ্য নিল চোরে
আমি অতি অল্পমতি, ভাসালে সাগরের জলে ॥
স্রোতের শেহালার মত
মা গো ফিরিতেছি ভেসে,
সবে বলে ধর ধর, কেউ নামে না অগাধ জলে ॥
বনের পুষ্প বেলের পাতা,
মা গো আর দিব আমার মাথা,
রক্তচন্দন রক্তজবা, দিব মায়ের চরণতলে ॥
শ্রীরামপ্রসাদের বাণী, শোন গো মা নারায়ণী,
তনু-অন্তকালে আমায়
টেনে ফেলো গঙ্গাজলে ॥ ৩

———

(৪)

মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না ॥
ও রে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি
জেনেও কি তাই জান না।
কোন্ প্রাণে তাঁর মাটির মূর্ত্তি
গড়িয়ে করিস্ উপাসনা ॥

জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা,
দিয়ে কত রত্ন সোনা।
ও রে, কোন লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয়,
দিয়ে ছার ডাকের গহনা॥
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা।
ও রে কোন্ লাজে খাওয়াইতে চাস্ তাঁয়,
আলো চাল আর বুট ভিজানা॥
জগৎকে পালিছেন যে মা
সাদরে তাই কি জান না।
ও রে কেমনে দিতে চাস্ বলি
মেষ মহিষ আর ছাগল ছানা॥ ৪

মন তোরে তাই বলি বলি।
এবার ভাল খেল খেলায়ে গেলি॥
প্রাণ বলে প্রাণের ভাই,
মন যে তুই আমার ছিলি।
ও রে ভাই হ'য়ে ভুলায়ে ভাইরে,
শমনেরে সঁপে দিলি॥
গুরুদত্ত মহা সুধা, ক্ষুধায় খেতে নাহি দিলি
ও রে খাওয়ালি কেবল মাত্র,
কতকগুলো গালাগালি॥
যেম্নি গেলি তেম্নি গেলাম,
ক'রে দিলি মেজাজ আলি।
এবার মায়ের কাছে বুঝা আছে,
আমি নই বাগানের মালী॥

প্রসাদ বলে, মন ভেবেছ,
দেবে আমায় জলাঞ্জলি।
ও রে জান না কি গেঁথে রেখেছি,
হৃদয়ে দক্ষিণা কালী॥ ৫

(৬)

মন জান না শেষে ঘটবে কি লেঠা
যখন উর্দ্ধ বায়ু রুদ্ধ ক'রে
পথে তোমার দিবে কাঁটা॥
আমি দিন থাকিতে উপায় বলি,
দিনের সুদিন যেটা।
ও রে শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে,
মনে মনে হও রে আঁটা॥
পিঞ্জরে পুষেছে পাখী আটক করবে কেটা।
ও রে জান না যে তার ভিতরে,
দুয়ার রয়েছে নটা॥
পেয়েছ কুসঙ্গী সঙ্গী ধিঙ্গি ধিঙ্গি ছটা।
তারা যা বলিছে তাই করিছ,
এমনি বুকের পাটা॥
প্রসাদ বলে, মন জান তো মনে মনে যেটা।
আমি চাতরে কি ভেঙ্গে হাঁড়ী,
বুঝাইব সেটা॥ ৬

(৭)

তোমার সাথী কে রে (ও মন)।
তুমি কার আশায় বসেছ রে (মন)॥
তনুর তরী ভবের চড়ায়, ঠেকে রয়েছে রে—
যারে যারে গুরুর নামে
বাদাম দিয়ে বেয়ে চলে যা রে॥

প্রসাদ বলে, ছয় রিপু নিয়ে,
সোজা হ'য়ে চল রে।
নৈলে আঁধারের কুটীরের গোঁত,
যোগে লেগেছে রে॥ ৭

---

(৮)

মরি গো এই মনোদুঃখে।
ও মা, মা-বিনে দুঃখ বল্‌ব কাকে॥
এ কি অসম্ভব কথা, শুনে বা কি বল্‌বে লোকে।
ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী,
তার ছেলে মরে পেটের ভুকে॥
সে কি তোমার সাধের মা,
রাখলে যারে পরম সুখে।
ও মা, আমি কত অপরাধী,
নুণ মেলে না আমার শাকে॥
ডেকে ডেকে কোলে ল'য়ে,
পাছাড় মারিলে আমার বুকে।
ও মা, মায়ের মত কাজ করেছ,
ঘোষিবে জগতের লোকে॥ ৮

---

(৯)

জানি গো জানি গো তারা
তোমার যেমন করুণা।
কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে,
কারু পেটে ভাত, গেঁটে সোনা॥
কেহ যায় মা পাল্কী চ'ড়ে,
কেহ তারে কাঁধে করে।
কেহ গায় দেয় শাল দোশালা,
কেহ পায় না ছেঁড়া টেনা॥ ৯

(১০)

মা তোমারে বারে বারে
জানাব আর দুঃখ কত।
ভাসিতেছি দুঃখ-নীরে,
স্রোতের শেহালার মত ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, মা বুঝি নিদয়া হ'লে,
দাঁড়াও একবার দ্বিজ মন্দিরে,
দেখে যাই জনমের মত ॥ ১০

(১১)

লগ্নী—আড়খেমটা।

মা, বসন পর,
বসন পর, বসন পর মা গো, বসন পর তুমি।
চন্দনে চর্চ্চিত জবা, পদে দিব আমি গো ॥
কালীঘাটে কালী তুমি,
মা গো, কৈলাসে ভবানী।
বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী, গোকুলে গোপিনী গো ॥
পাতালেতে ছিলে মা গো, হ'য়ে ভদ্রকালী।
কত দেবতা করেছে পূজা, দিয়ে নরবলি গো।
কার বাড়ী গিয়েছিলে,
মা গো, কে করেছে সেবা।
শিরে দেখি রক্তচন্দন, পদে রক্ত-জবা গো
ডানি হস্তে বরাভয়, মা গো, বাম হস্তে অসি।
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড করেছ রাশি রাশি গো ॥
অসিতে রুধিরধারা, মা গো, গলে মুণ্ডমালা।
হেঁটমুখে চেয়ে দেখ, পদতলে ভোলা গো ॥
মাথায় সোনার মুকুট, মা গো, ঠেকেছে গগনে।
মা হ'য়ে বালকের পাশে, উলঙ্গ কেমনে গো ॥

আপনে পাগল পতি পাগল,
মা গো আরও পাগল আছে।
ও মা! রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল,
চরণ পাবার আশে গো ॥ ১১

(১২)

ভৈরবী—একতালা।

গেল না গেল না, দুঃখের কপাল।
গেল না গেল না, ছাড়িয়ে ছলনা,
ছাড়িয়ে ছাড়ে না মাসী হলো কাল ॥
আমি মনে সদা বাঞ্ছা করি সুখ,
মাসী এসে তাহে দেয় নানা দুখ,
মাসীর মায়া জ্বালা, করে নানা খেলা,
দেয় দ্বিগুণ জ্বালা, বাড়ায় জঞ্জাল।
দ্বিজ রামপ্রসাদের মনে এই ত্রাস,
জন্মে মাতৃকোলে না করিলাম বাস,
পেয়ে দুধের জ্বালা, শরীর হইল কালা,
তোলা দুধে ছেলে বাঁচে কত কাল ॥ ১২

(১৩)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে, আমায় ভোলা মামা।
ও তুই জানিস্ না রে খরচ জমা ॥
যখন ভবে জমা হ'লি, তখন হইতে খরচ গেলি,
ও রে জমা খরচ ঠিক করিয়ে,
বাদ দিয়ে তিন শূন্য নামা ॥

বাদে হইলে অঙ্ক বাকী,
তবে হবে তহবিল বাকী
তহবিল বাকী বড় ফাঁকি,
হবে না তোর লেখার সীমা॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে,
কিসের খরচ, কাহার জমা।
ওরে অন্তরেতে ভাব বসি,
কালী তারা উমা শ্যামা॥ ১৩

(১৪)

মূলতান—একতালা।

কার বা চাকরী কর (রে মন)।
ও রে তুই বা কে, তোর মনিব কে রে,
হলি কার নফর॥
মোহাছিবা দিতে হবে, নিকাশ তৈয়ার কর।
ও তোর আমদানীতে শূন্য দেখি,
কর্জ্জ জমা ধর (ও রে মন)॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, তারার নামটি সার।
ওরে মিছে কেন দারা-সুতের
বেগার খেটে মর (ও রে মন)॥ ১৪

(১৫)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা হওয়া কি মুখের কথা।
(কেবল প্রসব ক'রে হয় না মাতা)
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা॥

দশ মাস দশ দিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা।
এখন ক্ষুধার বেলা সুধালে না
এল পুত্র গেল কোথা॥
সন্তানে কুকর্ম্ম করে, ব'লে সারে পিতা মাতা।
দেখে কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড,
তাতে তোমার হয় না ব্যথা॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে,
এ চরিত্র শিখলে কোথা।
যদি ধর আপন পিতৃধারা
নাম ধরো না জগন্মাতা॥ ১৫

(১৬)

খাম্বাজ—আদ্ধা।

কালী তারার নাম জপ মুখে রে,
যে নামে শমন-ভয় যাবে দূরে রে।
যে নামেতে শিব সন্ন্যাসী, হইল শ্মশানবাসী,
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে না পায় ভাবিয়া রে॥
ডুবু ডুবু হইল ভরা, লোকে বলে ডুবে রে।
ভুলাইতে পার যদি, ভোলানাথের মন রে॥
আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি-স্তুতি,
দ্বিজ রামপ্রসাদের নতি,
চরণতলে রেখ রে॥ ১৬

(১৭)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মায়ের চরণতলে স্থান লব।
আমি অসময়ে কোথা যাব॥

ঘরে জায়গা না হয় যদি,
বাহিরে রব ক্ষতি কি গো।
মায়ের নাম ভরসা ক'রে,
উপবাসী হ'য়ে পড়ে রব ॥
প্রসাদ বলে, উমা আমার,
বিদায় দিলেও নাই কো যাব।
আমার দুই বাহু প্রসারিয়ে
চরণতলে পড়ে প্রাণ ত্যজিব ॥ ১৭

(১৮)

সিন্ধুকাফি—একতালা।

আপন মনে মগ্ন হ'লে মা,
পরের কথায় কি হয় তারে
পরের কথায় গাছে চড়ে,
আপন দোষে প'ড়ে মরে।
পরের জামিন হলে পরে,
সে না দিলে আপনে ভরে ॥
যখন দিনে নিড়াই করে,
শীকারী সব রয় না ঘরে।
জাঠা বর্শা লয়ে করে নাও না পেলে চলে তরে
চাষা লোকে কৃষি করে, পঙ্ক জলে প'চে মরে।
যদি সে নিড়াইতে পারে,
অঝরে কাঞ্চন ঝরে ॥ ১৮

---

(১৯)

জয়জয়ন্তী—যৎ।

এ সংসারে ডরি কারে,—
রাজা যার মা মহেশ্বরী ;
আনন্দে আনন্দময়ীর খাস-তালুকে বসত করি।

নাইকো জরিপ জমাবন্দি,
তালুক হয় না লাটে বন্দি, মা,
আমি ভেবে কিছু পাইনে সন্ধি,
শিব হয়েছেন কর্ম্মচারী ॥
নাইকো কিছু অন্য লেঠা,
দিতে হয় না মাথট বাটা, মা,
জয়দুর্গা নামে জমা আঁটা,
ঐটা করি মালগুজারি।
বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এ মনের সাধ, মা,
আমি ভক্তির জোরে কিন্‌তে পারি,
ব্রহ্মময়ীর জমীদারী ॥ ১৯

(২০)

মুলতানী-ধানশ্রী—একতালা।

করুণাময়ি! কে বলে তোরে দয়াময়ী।
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা (গো তারা)
আমার অম্নি দশা, শাকে অন্ন মেলে কৈ ॥
কারে দিলে ধন-জন মা হস্তী অশ্ব রথচয়,
ওগো তারা কি তোর বাপের ঠাকুর,
আমি কি তোর কেহ নই।
কেহ থাকে অট্টালিকায়, মনে করি তেম্নি হই,
মা গো আমি কি তোর পাকা
ক্ষেতে দিয়াছিলাম মই ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে,
আমার কপাল বুঝি অম্নি অই।
ও মা, আমার দশা দেখে বুঝি,
শ্যামা হ'লে পাষাণময়ী ॥ ২০

(২১)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে, তোর চরণ ধরি।
কালী ব'লে ডাক রে ওরে ও মন,
তিনি ভবপারের তরী॥
কালী নামটা বড় মিঠা,
বল রে দিবা-শর্ব্বরী।
ওরে, যদি কালী করেন কৃপা,
তবে কি শমনে ডরি॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে,
কালী ব'লে যাব তরি।
তিনি তনয় ব'লে দয়া ক'রে
তরাবেন এ ভব-বারি॥ ২১

(২২)

পিলু-বাহার—যৎ।

মা ব'লে ডাকিস্ না রে মন,
মাকে কোথা পাবে ভাই।
থাক্‌লে এসে দিত দেখা, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই॥
গিয়ে বিমাতার তীরে, কুশপুত্তল দাহন ক'রে,
ওরে অশৌচান্ত পিণ্ড দিয়ে,
কালাশৌচে কাশী যাই॥ ২২

তৃতীয় শ্রেণীর গান

(১)

জংলা—একতলা।

জাল ফেলে জেলে রয়েছে ব'সে।
ভবে আমার কি হইবে গো মা,—
অগম্য জলেতে মীনের আশ্রয়,

জেলে জাল ফেলেছে ভুবনময়,
ও সে যখন যারে মনে করে,
তখন তারে ধরে কেশে ॥
পালাবার পথ নাইকো জালে,
পালাবি কি মন ঘেরেছে কালে,
রামপ্রসাদ বলে, মাকে ডাক,
শমন-দমন করবে এসে ॥ ১

---

(২)

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমি কি দুঃখেরে ডরাই ?
তবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই ॥
আগে পাছে দুখ চলে মা,
যদি কোন খানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে
দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই ॥
বিষের ক্রিমি বিষে থাকি মা,
বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই !
আমি এমন বিষের ক্রমি মা গো,
বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই ॥
প্রসাদ বলে, ব্রহ্মময়ী,
বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে,
আমি করি দুখের বড়াই ॥ ২

---

(৩)

প্রসাদী সুর—একতালা।

অভয় পদ সব লুটালে।
কিছু রাখলে না মা তনয় ব'লে ॥

দাতার কন্যা দাতা ছিলে মা,
শিখেছিলে মায়ের স্থলে।
তোমার পিতা মাতা যেম্নি দাতা,
তেম্নি দাতা আমায় হোলে।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা,
সে জন তোমার পদতলে।
ঐ যে ভাং খেয়ে শিব সদাই মত্ত,
কেবল তুষ্ট বিল্বদলে॥
জন্মজন্মান্তরেতে মা, কত দুঃখ আমায় দিলে।
রামপ্রসাদ বলে, এবার মোলে,
ডাক্‌ব সর্ব্বনাশী ব'লে॥ ৩

(৪)

সোহিনী—একতালা।
আয় দেখি মন চুরি করি,
তোমায় আমায় একত্তরে।
শিবের সর্ব্বস্ব ধন, মায়ের চরণ,
যদি আন্‌তে পারি হ'রে॥
জাগা ঘরে চুরি করা,
ইথে যদি পড়ি ধরা,
তবে মানব দেহের দফা সারা,
বেঁধে নিবে কৈলাসপুরে॥
গুরুবাক্য দৃঢ় ক'রে, যদি যাইতে পারি ঘরে,
ভক্তিবাণ হরকে মেরে,
শিবত্ব পদ লব কেড়ে॥ ৪

(৫)

ঝংলা—একতালা।

আমি অই খেদে খেদ করি।
ঐ যে তুমি মা থাকিতে আমার,
জাগা ঘরে হয় চুরি॥
মনে কার তোমার নাম করি,
আবার সময়ে পাসরি।
আমি বুঝেছি পেয়েছি আশয়,
জেনেছি তোমার চাতুরী॥
কিছু দিলে না, পেলে না,
নিলে না, খেলে না,
সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে,
দিতাম খাওয়াইতাম তোমারি॥
যশঃ অপযশঃ সুরস কুরস সকল রস তোমারি।
ওগো রসে থেকে রসভঙ্গ,
কেন কর রাসেশ্বরী॥
প্রসাদ বলে, মন দিয়াছ মনেরি আঁখঠারি।
ও মা, তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া
মিষ্টি ব'লে ঘুরে মরি॥ ৫

---

(৬)

টুরী-জায়েনপুরী—একতালা।

সময় তো থাকবে না গো মা,
কেবল কথা রবে।
কথা রবে, কথা রবে,
মা গো, জগতে কলঙ্ক রবে।
ভাল কিবা মন্দ কালী,
অবশ্য এক দাঁড়া হবে।

সাগরে যার বিছানা মা !
শিশিরে তার কি করিবে ॥
দুঃখে দুঃখে জরজর,
আর কত মা দুঃখ দিবে ।
কেবল ঐ দুর্গা নাম,
শ্যামা নামে কলঙ্ক রটিবে ॥ ৬

(৭)

প্রসাদী সুর—একতালা ।

আর তোমায় না ডাক্‌ব কালী ।
তুমি মেয়ে হয়ে অসি ধ'রে,
লেংটা হয়ে রণ করিলি ॥
দিয়াছিলে একটা বৃত্তি,
তাও তো দিয়ে হ'রে নিলি ।
ঐ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে,
মা হয়ে তার মাথা খেলি ॥
দীন রামপ্রসাদ বলে মা,
এবার কালি কি করিলি ।
ঐ যে ভাঙ্গা নায়ে দিয়ে ভরা,
লাভে মূলে ডুবাইলি ॥ ৭

(৮)

প্রসাদী সুর—একতালা ।

এলোকেশী দিগ্বসনা ।
কালী পূরাও মোর মনোবাসনা ॥
যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশ মা নাহি দেখি,
আমায় হবে কি না হবে দয়া,
ব'লে দে মা ঠিকঠিকানা ॥

যে বাসনা মনে আছে,
বলেছি মা তোমার কাছে,
ও মা, তুমি বিনে ত্রিভুবনে,
এ বাসনা কেহ জানে না ॥ ৮

(৯)

কালীপদ আকাশেতে
মন ঘুড়িখান উড়তেছিল,
কলুষ কুবাতাস পেয়ে ঘুড়ি,
গোপ্তা খেয়ে প'ড়ে গেল ।
মায়া কান্না হল ভারী,
ঘুড়ি আর রাখিতে নারি,
দারাপত্য মায়া দড়ী,
এরা দু'জন জয়ী হ'ল ।
কাপে দন্তী গেছে ছিঁড়ে,
ফাঁক পেয়ে তারা জিতে গেল ॥ ৯
[শেষ অংশ পাওয়া যায় নাই]

(১০)

কাশী যেতে কই মন সরে ।
আমার হাসি পায় আর দুঃখ ধরে ॥
সবাই বলে যাব কাশী,
সে কাশীতে কি কাজ করে ।
আমি যার জন্যে যাব কাশী,
সেই সর্ব্বনাশী সঙ্গে ফিরে ॥
প্রসাদ বলে, শিবের কাশী,
আমি না তায় ভালবাসি,
আমার হৃদয়-কাশীর মধ্যে আসি,
সেই এলোকেশী বিরাজ করে ॥ ১০

(১১)

সোহিনী-বাহার—একতালা

আয় দেখি মন, তুমি আমি
দু'জনে বিরলেতে বসি রে।
যুক্তি করি মনে প্রাণে,
পিঞ্জর গড়ব গুরুর চরণে॥
পদে লুকাইব সুধা খাব
যমের বাপের কি ধার ধারি রে॥
মন বলে করিবে চুরি
ইহার সন্ধান বুঝিনে রে॥
গুরু দিয়েছেন যে ধন
অভয়চরণ কেমনে খরচ করি রে॥
শ্রীরামপ্রসাদের আশা কাঁটা
কেটে খোলসা করি রে।
মধুপুরী যাব, মধু খাব
শ্রীগুরুর নাম হৃদে ধ'রে॥ ১১

(১২)

প্রসাদী সুর—একতালা

এবার ভাল ভাব পেয়েছি।
কালীর অভয় পদে প্রাণ সঁ'পেছি।
ভবের কাছে পেয়ে ভাব
ভাবীকে ভাল ভুলায়েছি।
তাই রাগ, দ্বেষ, লোভ ত্যজে,
সত্ত্বগুণে মন দিয়েছি॥
তারা নাম সারাৎসার,
আত্মশিখায় বাঁধিয়াছি।
সদা দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে,
দুর্গা নামের কাচ করেছি॥

প্রসাদ ভাবে যেতে হবে,
এ কথা নিশ্চিত জেনেছি।
লয়ে কালীর নাম পথের সম্বল,
যাত্রা ক'রে ব'সে আছি ॥ ১২

(১৩)

ও মা! হর গো তারা, মনের দুঃখ,
আর তো দুঃখ সহে না।
যে দুঃখ গর্ভ-যাতনে, মা গো,
জন্মিলে থাকে না মনে,
মায়ামোহে পড়ে ভ্রমে, জন্মি বলে ওমা ওমা ॥
জন্ম মৃত্যু যে যন্ত্রণা,
মা গো, যে জন্মে নাই সে জানে না ॥ ১৩

(১৪)

প্রসাদী সুর—একতালা।
ওরে শমন, কি ভয় দেখাও মিছে।
তুমি যে পদে ও পদ পেয়েছ,
সে মোরে অভয় দিয়েছে ॥
ইজারার পাট্টা পেয়ে,
এত কি গৌরব বেড়েছে।
ওরে, স্বয়ং থাকৃতে কুশের পুতুল,
কে কোথা দাহন করেছে ॥
হিসাব বাকী থাকে যদি,
দিব না রে তোদের কাছে।
ওরে রাজা থাকৃতে কোটালের দোহাই,
কোন্ দেশেতে কে দিয়াছে ॥
শিব-রাজ্যে বসতি করি,
শিব আমায় পাট্টা দিয়াছে।

রামপ্রসাদ বলে, সেই পাট্টাতে,
ব্রহ্মময়ী সাক্ষী আছে ॥ ১৪

(১৫)

প্রসাদী সুর—একতালা।

ওরে মন, কি ব্যাপারে এলি।
ও তুই না চিনিয়ে কাজের গোড়া,
লাভে মূলে হারাইলি ॥
গুরুদত্ত রত্ন ভ'রে কেন ব্যাপার না করিলি।
এ তুই কুসঙ্গেতে থেকে রত,
মধ্যে তরী ডুবাইলি ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, সে অর্থ কেন না আনিলি।
ও তোর ব্যাপারেতে লাভ হবে কি,
মহাজনে মজাইলি ॥ ১৫

(১৬)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন, তোরে তাই বলি বলি।
এবার ভাল খেল খেলায়ে গেলি ॥
প্রাণ বলে প্রাণের ভাই,
মন যে তুই আমার ছিলি।
ওরে, ভাই হয়ে ভুলায়ে ভাইরে,
শমনেরে সঁ:প দিলি ॥
গুরুদত্ত মহা সুধা, ক্ষুধায় খেতে নাহি দিলি।
ওরে খাওয়ালি, কেবল মাত্র,
কতকগুলো গালাগালি ॥
যেম্নি গেলি তেম্নি গেলাম,
ক'রে দিলি মেজাজ আলি।

এবার মায়ের কাছে বুঝা আছে,
আমি নই বাগানের মালী।
প্রসাদ বলে, মন ভেবেছ,
দেবে আমায় জলাঞ্জলি।
ওরে, জান না কি গেঁথে রেখেছি,
হৃদয়ে দক্ষিণা কালী॥ ১৬

(১৭)

তার মা তারা এ সঙ্কটে।
পেঁচে পড়েছি এসে ভবের হাটে॥
বেচা-কেনা ফুরাইল মা,
সন্ধ্যে হ'লে এলাম ঘাটে।
এখন ভাবছি ব'সে নদীর তীরে,
তপনও বসিল পাটে॥
মায়া-নদীর বিষম বেগ মা,
তার র'য়েছে মোহনা ছুটে।
মা তোর আসান পেলে ভাসান দিয়ে,
পার হয়ে যাই সাঁতার কেটে॥
শিবের কথা অন্যথা নয়,
দিয়েছে শিব জটে রটে,
সে শিব মিথ্যাবাদী হবে যদি,
তবে রামপ্রসাদের বিপদ ঘটে॥ ১৭

(১৮)

ললিত-বিভাষ—আড়খেমটা।
কালীর নামের গণ্ডী দিয়া আজি দাঁড়াইয়ে।
শুন রে শমন তোরে কই,
আমি তো আটাশে নই,
তোর কথা কেন রব সয়ে॥

ছেলের হাতে মোওয়া নয় যে
খাবে হুমকো দিয়ে।
কটু বল্‌বি সাজাই পাবি মাকে দিব কয়ে।
সে যে কৃতান্ত-দলনী শ্যামা, বড় ক্ষেপা মেয়ে॥
শ্রীরামপ্রসাদে কয় যেন শ্যামা-গুণ গেয়ে।
আমি ফাঁকি দিয়ে চ'লে যাব,
চক্ষে ধূলা দিয়ে॥ ১৮

—.—

(১৯)

মা, তোদের ক্ষেপার হাটবাজার।
গুণের কথা কইব কার ?
তোরা দুই সতীনে কেউ বুকে
কেউ মাথায় চড়িস্ তাঁর।
কর্ত্তা যিনি ক্ষেপা তিনি, ক্ষেপার মূলাধার॥
চাকলা ছাড়া চেলা দু'টো সঙ্গে অনিবার।
গজ বিনে গো-আরোহণে ফিরিস কি আচার,
মণিমুক্তা ছেড়ে পরিস্ গলে নর-শির হার।
শ্মশানে মশানে ফিরিস্ কার
কার বা ধারিস্ ধার,
রামপ্রসাদকে ভবার্ণবে কর্ত্তে হবে পার॥ ১৯

(২০)

মুলতান—একতালা।

মন কালী কালী বল।
বিপদ্‌নাশিনী কালীর নাম জপ না,
ওরে ও মন কেন ভুল॥
কিঞ্চিত ক'র না ভয়, দেখে অগাধ সলিল।
ওরে অনায়াসে ভবনদীর
কালী কুলাইবেন কুল॥

যা হবার তা হলো ভাল,
কাল গেল মন কালী বল।
এবার কালের চক্ষে দিয়ে ধূল,
ভবপারাবারে চল ॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, কেন মন ভুল ওরে,
কালী নাম অন্তরে জপ,
বেলা অবসান হইল ॥ ২০

---

(২১)

আর কি বৈদিক পূজা আছে (মা)
আমার সুযশ নাই অযশ ঘটেছে ;
আমার অবকাশ হ'ল সব কাজ,
জন্ম মৃত্যু দু'টো অশৌচ ঘটেছে।
চিন্তা ভার্য্যা বন্ধ্যা ছিল,
সে ভার্য্যা প্রসব করেছে ॥
কাল অনুক্রমে সুসঙ্গমে,
জ্ঞান আনন্দ নামে এক পুত্র জন্মেছে।
কুবুদ্ধি এক জনক ছিল,
সেও আমায় ত্যাগ করেছে ॥
সেই পিতার লাগি হয়ে বিবাগী,
মায়া নামে আমার মা মরেছে।
রোগ শোক দু'টি ভ্রাতা, কেহ কৃপণ কেহ দাতা,
ভগ্নী দু'টি ক্ষুধা তৃষ্ণা,
যশ প্রশংসা নাই কারো কাছে।
প্রসাদ বলে, কাজ কি বাসে,
যত বিপদ গৃহবাসে
এখন সম্বল লয়ে কৃত্তিবাসে,
জয় কালী ব'লে বেড়াই নেচে ॥ ২১

(২২)

শিব নয় মায়ের পদতলে।
ওটা মিথ্যা লোকে বলে ॥
সুর-সঙ্কট নাশিতে, অসুরগণে বধিতে,
এর মূল কথা মার্কণ্ডমুনি
চণ্ডীতে লিখেছে খুলে।
দৈত্য বেটা ভূমে পড়ে,
মা দাঁড়ায়ে তার উপরে,
মায়ের পদস্পর্শে দানব-দেহ
শিবরূপ হয় রণস্থলে ॥
সতী হয়ে পতির বুকে
পা দিয়েছে কোন্ লোকে।
না হয় দাস ব'লে দাও অভয় পদ
রামপ্রসাদের হৃৎকমলে ॥ ২২

(২৩)

মা দাঁড়ায়ে শিবের বুকে।
নাচছে বেটী থেকে থেকে ॥
মা দাঁড়ায়ে শিবের বুকে
এ সব কথা বল্‌ব কাকে।
অন্য কেহ হ'লে পরে,
হাততালি যে দিত লোকে ॥
উহু উহু মরি মরি, মা হয়েচে দিগম্বরী,
তাতে রুষ্ট নয় ভব তুষ্ট হয়ে
চরণপদ্ম হৃৎপদ্মে রাখে ॥ ২৩

(অসম্পূর্ণ)

(২৪)

আমায় ছুঁয়ো না রে শমন
আমার জাত গিয়াছে।
যে দিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা করেছে ॥
শোন রে শমন বলি
আমার জাত কিসে গিয়াছে।
(ওরে শমন রে)
আমি ছিলেম গৃহবাসী, কেলে সর্ব্বনাশী,
আমায় সন্ন্যাসী করেছে ॥
মন-রসনা এই দু'জন,
কালীর নামে দল বেঁধেছে।
(ওরে শমন রে)
ইচ্ছা ক'রে শ্রবণ, রিপু্ ছয় জন,
ডিঙ্গা ছেড়ে গেছে ॥ ২৪

(২৫)

আমার সনদ দেখে যা রে।
আমি কালীর সুত, যমের দূত,
বল গে যা তোর যম রাজারে ॥
সনদ দিলেন গণপতি, পার্ব্বতীর অনুমতি,
আমার হাজির জামিন ষড়ানন,
সাক্ষী আছে নন্দীবরে ॥
সনদ আমার উরস্ পাটে,
যেম্নি সনদ তেম্নি টাটে,
তাতে স্ব অক্ষরে দস্তখৎ,
করেছেন দিগম্বরে ॥
সনদ পেলাম মায়ের কাছে,
এতে কি আর গলদ আছে,

প্রসাদ বলে, ভয় দেখালে,
যাব রে মায়ের দরবারে ॥ ২৫

---

(২৬)

ওরে মন বলি, ভজ কালী,
ইচ্ছা হয় যেই আচারে।
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র, কর দিবানিশি জপ করে ॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞান নিদ্রায় কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে ॥
যত শোন কর্ণপুটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে ॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে,
ওরে আহার কর, মনে কর,
আহুতি দেই শ্যামা মারে॥ ২৬

---

(২৭)

তারা আমি নই আটাশে ছেলে।
ভয়ে ভুল্‌ব নাকো চোক রাঙ্গালে ॥
সম্পদ আমার ও রাঙ্গা পদ,
শিব ধরে যা হৃৎকমলে।
ওমা, আমার বিষয় চাইতে গেলে,
বিড়ম্বনা কতই ছলে ॥
শিবের দলিল সৈ মোহরে,
রেখেছি হৃদয়ে তুলে।
এবার কর্‌ব নালিশ নাথের আগে
ডিক্রী লব এক সওয়ালে ॥
জানাইব কেমন ছেলে,
মোকর্দ্দমায় দাঁড়াইলে।
যখন গুরুদত্ত দস্তাবিজ,
গুজরাইবে মিছিল কালে ॥

মায়ে পোয়ে মোকর্দ্দমা,
ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব, যখন আমায়,
শান্ত ক'রে লবে কোলে॥ ২৭

(২৮)

ও মন, তোর নামে কি নালিশ দিব
ও তুই শকার-বকার বল্‌তে পারিস্,
বল্‌তে নারিস্ দুর্গা শিব॥
খেয়েছ জিলিপি খাজা, লুচি মণ্ডা সরভাজা,
ওরে শেষে পাবি সে সব মজা।
যখন রে পঞ্চত্ব পাব
পাঁচ ইন্দ্রিয়ের পাঁচ বাসনা,
কেমন ক'রে ঘর করিব।
ওরে চুরি দারি করিলে পরে,
উচিত মত সাজাই পাব॥ ২৮

(২৯)

ওমা, তোর মায়া কে বুঝতে পারে।
তুমি ক্ষেপা মেয়ে মায়া দিয়ে,
রেখেছ সব পাগল ক'রে॥
মায়া-ভরে এ সংসারে,
কেহ কারে চিনতে নারে।
ঐ যে এম্নি কালীর কাপ আছে যে,
যেম্নি দেখে তেম্নি করে,
পাগল মেয়ের কি মন্ত্রণা,
কে তার ঠিক-ঠিকানা করে।
রামপ্রসাদ বলে, যায় গো জ্বালা,
যদি অনুগ্রহ করে॥ ২৯

(৩০)

তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন,
ওরে আমার শুয়া পাখী।
আমারি অন্তরে থেকে
আমাকে দিতেছ ফাঁকি ॥
কালী নাম জপিবার তরে,
তোরে রেখেছি পিঞ্জরে পুরে, মন,
ও তুই আমাকে বঞ্চনা ক'রে,
অরি সুখে হইলি সুখী ॥
শিব দুর্গা কালী নাম, জপ কর অবিশ্রাম, মন,
ও তোর জুড়াবে তাপিত অঙ্গ-
একবার শ্যামা বল রে দেখি ॥ ৩০

(৩১)

মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না ॥
ওবে ত্রিভুবন সে মায়ের মূর্ত্তি
জেনেও কি তাই জান না।
কোন্ প্রাণে তাঁর মাটির মূর্ত্তি
গড়িয়ে করিস্ উপাসনা ॥
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা,
দিয়ে কত রত্ন সোনা।
ওরে, কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয়,
দিয়ে ছার ডাকের গহনা ॥
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা
ওরে কোন লাজে খাওয়াইতে চাস্ তাঁয়,
আলো চাল আর বুট ভিজানা ॥

জগৎকে পালিছেন যে মা
সাদরে কি তাই জান না।
ওরে কেমনে দিতে চাস বলি,
মেষ মহিষ আর ছাগল ছানা॥ ৩১

(৩২)

মা বলে ডাকিস না রে মন,
মাকে কোথা পাবে ভাই।
থাকলে এসে দিত দেখা, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই॥
গিয়ে বিমাতার তীরে কুশ-পুত্তল দাহন ক'রে,
ওরে অশৌচান্ত পিণ্ড দিয়ে,
কালাশৌচে কাশী যাই॥ ৩২

(৩৩)

তিলেক দাঁড়া ওরে শমন,
মন ভরে মাকে ডাকি রে।
আমার বিপৎকালে ব্রহ্মময়ী,
এসেন কি না এসেন দেখি রে॥
লয়ে যাবি সঙ্গে ক'রে;
তার একটা ভাবনা কি রে।
তবে তারা-নামের কবচ মালা,
বৃথা আমি গলায় রাখি রে॥
মহেশ্বরী আমার রাজা,
আমি খাস তালুকের প্রজা,
আমি কখন নাতান, কখন সাতান,
কখন বাকীর দায়ে না ঠেকি রে॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা
অন্যে কি জানিতে পারে।
যাঁর ত্রিলোচন না পেল তত্ত্ব
আমি অন্ত পাব কি রে॥ ৩৩

(৩৪)

মনরে তোর চরণ ধরি।
কালী বলে ডাকরে ওরে ও মন,
তিনি ভব পারের তরী॥
কালী নামটা বড় মিঠা,
বল রে দিবা-শর্ব্বরী।
ওরে, যদি কালী করেন কৃপা,
তবে কি শমনে ডরি॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে,
কালী ব'লে যাব তরি
তিনি তনয় ব'লে দয়া ক'রে
তরাবেন এ ভব-বারি॥ ৩৫

(৩৫)

এবার আমি বুঝিব হরে।
মায়ের ধর্‌ব চরণ লব জোরে॥
ভোলানাথের ভুল ধরেছি,
বলবো এবার যারে তারে।
সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ,
হৃদে ধরে কোন্ বিচারে?
পিতা পুত্রে এক ক্ষেত্রে,
দেখা মাত্রে বলব তারে।
ভোলা মায়ের চরণ ক'রে হরণ,
মিছে মরণ দেখায় কারে॥
মায়ের ধন সন্তানে পায়,
সে ধন নিলে কোন্ বিচারে॥
ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে,
চরণ ছেড়ে দিক্ আমারে॥

শিবের দোষ বলি যদি,
বাজে আপন গায় উপরে।
রামপ্রসাদ বলে, ভয় করিনে,
মার অভয় চরণের জোরে ॥ ৩৫

(৩৬)

নিত্যই তোরে বুঝাবে কেটা
বুঝে বুঝলি না রে মন রে ঠেঁটা ॥
কোথা রবে ঘর বাড়ী তোর,
কোথা রবে দালান কোঠা।
যখন আস্‌বে শমন, বাঁধবে কসে মন,
কোথা রবে খুড়া জ্যেঠা ॥
মরণ সময় দিবে তোমায়,
ভাঙ্গা কলসী ছেঁড়া চেটা।
ওরে সেখানেতে তোর নামেতে
আছে রে যে জাবদা আঁটা ॥
যত ধন জন অকারণ, সঙ্গেতে না যাবে কেটা।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা ব'লে,
ছাড় রে সংসারের লেঠা ॥ ৩৬

(৩৭)

পিতৃধনের আশা মিছে।
পিতার দলিল দস্ত ধন সমস্ত
আগে বেনামী করেছে।
সে সকল ধন কুবেরকে দিয়ে,
নিজে ক্ষেপা সেজে ব'সে আছে।
আশা ছিল মাতৃপদ, পিতা তাও দখল করেছে।

কেউ লবে বলে যত্ন ক'রে
আগেতে বুকে রেখেছে ॥
পিতা ম'লে পুত্রে পায় ধন,
সর্ব্বশাস্ত্রে এই লিখেছে।
কিন্তু সে নয় মরবার পিতা,
মৃত্যুকে জয় করেছে ॥ ৩৭

---

(৩৮)

সকলি জানিস তারা আগাগোড়া আমার যত
তবে কেনে অধম জনে অকাজে মা করিস্ রত ॥
এ সকল ত' তোরই মায়া,
বাজিকরের বাজির মত।
তুই দিয়েছিস্ মা মনের পায়ে
মস্ত বেড়ী দারা স্থত ॥
দিনে দিনে দিন গেল মা,
স্থপথ খুঁজে পেলাম না ত।
ঘোর নিশা যে আসছে তারা,
অপথে আর ঘুরি কত ॥ ৩৮

---

(৩৯)

দিস মা কালী ফলার খেতে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ মেলে যাতে।
ধর্ম্ম লাভ হয় নিমন্ত্রণে, বুঝে দেখ মনে মনে,
অর্থ লাভ তার পরক্ষণে, দক্ষিণাটী হলে হাতে ॥
কাম মোক্ষ নাই গো করে,
যখন এসে ঘুমাই ঘরে,
রামপ্রসাদ বলে ফলার পেলে,
ভয় থাকে না সংসারেতে ॥ ৩৯

(৪০)

মন রে তোর বুদ্ধি এ কি ?
ও তুই সাপ ধরা জ্ঞান না শিখিয়ে,
তালাস ক'রে বেড়াস ফাঁকি ॥
ব্যাধের ছেলে পক্ষী মারে,
জেলের ছেলে মৎস্য ধরে,
মন রে, ওঝার ছেলে গরু হইলে,
গোসাপে তায় কাটে না কি ॥
জাতি-ধর্ম্ম সর্প-খেলা,
সেই মন্ত্রে করো না হেলা,
মন রে, যখন বলবে বাপে সাপ ধরিতে,
তখন হবি অধোমুখী ॥
পেয়ে যে ধন হেলায় হারায়,
তার চেয়ে কে অবোধ ধরায়,
প্রসাদ বলে হারব না,
সময় থাকতে শিখে রাখি ॥ ৪০

---

(৪১)

থাকি একখানা ভাঙ্গা ঘরে ।
তাই ভয় পেয়ে মা ডাকি তোরে ॥
হিল্লোলেতে হেলে পড়ে,
আছে কালীর নামের জোরে ।
ঐ যে রাত্রে আসে ছয়টা চোরে,
মেটে দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে পড়ে ॥
তাদের দমন করব কি মা !
ভয়ে ভয়ে যাচ্ছি সরে ॥
প্রসাদ বলে কোন্ বে-চালে
তারাই পাছে কয়েদ করে ॥ ৪১

(৪২)

দূর হয়ে যা যমের ভটা।
ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা॥
বল্‌গে মা তোর যম রাজারে,
আমার মতন নিছে ক'টা।
আমি যমের যম হইতে পারি,
ভাবলে ব্রহ্মময়ীর ছটা॥
প্রসাদ বলে কালের ভটা,
মুখ সামলায়ে বলিস্ বেটা।
কালীর নামের জোরে বেঁধে তোরে,
সাজা দিলে রাখবে কেটা॥ ৪২

(৪৩)

চিন্তাময়ী তারা তুমি আমার চিন্তা করেছ কি ?
নামে জগচ্চিন্তাহরা,
কিন্তু কাজে কই মা তেমনি দেখি॥
প্রভাতে দাও অর্থ-চিন্তা
মধ্যাহ্নে জঠর-চিন্তা,
সায়াহ্নে দাও অলস-চিন্তা,
বল মা তোমায় কখন্ ডাকি॥
দিয়েছ এক মায়া-চিন্তে
ও মা! সদাই করি তাই চিন্তে,
না পারিলাম তোমায় চিন্‌তে,
মা চিন্তা-কূপে ডুবে থাকি॥
ওমা! তুই গো পাষাণের মেয়ে,
পরম চিন্তামণি পেয়ে,
রহিলি পাষাণী হ'য়ে,
রামপ্রসাদকে দিয়ে ফাঁকি॥ ৪৩

(৪৪)

একবার ডাকরে কালী তারা বোলে
জোর ক'রে রসনে।
ও তোর ভয় কি রে শমনে॥
কাজ কি তীর্থ গঙ্গা কাশী,
যার হৃদে জাগে এলোকেশী।
তার কাজ কি ধর্ম্মকর্ম্ম,
ও তাঁর মর্ম্ম যেবা জানে।
ভজনের ছিল আশা, সূক্ষ্ম মোক্ষ পূর্ণ আশা,
রামপ্রসাদের এই দশা,
দ্বিভাব ভেবে মনে॥ ৪৪

---

(৪৫)

এ সব ক্ষেপা মায়ের খেলা।
যার মায়ায় ত্রিভুবন বিহ্বলা॥
সে যে আপনি ক্ষেপা, কর্ত্তা ক্ষেপা,
ক্ষেপা দুটো চেলা।
কি রূপ কি গুণ ভঙ্গী,
কি ভাব কিছুই না যায় বলা।
যার নাম করিয়ে কপাল পোড়ে
কণ্ঠে বিষের জ্বালা॥ ৪৫

(৪৬)

বাজবে গো মহেশের বুকে, নেমে দাঁড়া খ্যাপা মাগী।
মরেন নাই শিব আছেন বেঁচে, যোগে আছেন মহাযোগী॥
বিষে অঙ্গ জর জর, সহে না মা পদ-ভর,
নাব, নইলে ভাঙ্গবে পাঁজর, কি কঠিন গো শিব-সোহাগী।
বিষপানে যার হয়নি মরণ, সে মরবে আজ কিসের কারণ,
প্রসাদ বলে কপট মরণ ঐ চরণ পাবার লাগি॥ ৪৬

(৪৭)

কেন মিছে মা মা কর, মায়ের দেখা পাবে নাই।
থাকলে আসি দেখা দিত, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই॥
শ্মশান মশান কত, পীঠস্থান ছিল যত।
খুঁজে হলাম ওষ্ঠাগত, মিছে কেন যন্ত্রণা পাই॥
বিমাতার তীরে গিয়ে, কুশ-পুত্তল দহাইয়ে।
অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়ে, কালাশৌচে কাশী যাই॥
দীন রামপ্রসাদ ভণে, মায়ের জন্য ভাবনা কেনে,
মা গেছে নাম ব্রহ্ম আছে, তরিবার আর ভাবনা নাই॥ ৪৭

---

(৪৮)

মা আর কি দেখ্‌ছ বসে।
যদি তারা থাকৃতে নিবে বাতি মা, শুনিলে বিপক্ষ হাসে॥
তেল থাকৃতে নিবাস বাতি মা, দুটো গোবরে পোকা এসে।
এদের এক এক পোকার এক এক গুণ মা, এক এক জনে লাগায় দিসে॥
প্রসাদ বলে আলোয় আছি মা, আলো লয়ে যাব দেশে।
যখন মুদব তারা, দেখব তারা, তারা অন্ধকার বিনাশে॥ ৪৮

(৪৯)

জানি না মা কি বলে ডাকি তোরে (শ্যামা মা !)
কখন শঙ্কর বামে, কভু হর-হৃদি 'পরে।
কখন বিশ্বরূপিনী, কভু বামা উলঙ্গিনী।
কভু শ্যাম সোহাগিনী,
কভু রাধার পায়ে ধরে।
কখন বিশ্বজননী, পঞ্চভূত নিবাসিনী,
কভু কুলকুণ্ডলিনী
চতুর্দ্দল বিম্বোপরে।

সে যা বলে শুনিব না, মা নামের নাই তুলনা,
তাই ডাকি মা বলে মা মা,
ঐ অভয় চরণ পাবার তরে ॥ ৪৯

(৫০)

কি গুণে মা বলবো তোরে।
দুঃখী তাপিত তোমার নিন্দে করে।
ওমা তোমার জন্যে বাবা পাগল, বিমাতাকে মাথায় করে ॥
বোঝে না সে বুড়ো বেটা, তোমার দুর্গা নামে কেঁদে মরে।
তার কি বাপের সাধ্য আছে তারা, দশহাতে খাওয়াতে পারে ॥
সদাই বাক্য জ্বালা (তারা), দিস্ কেন তুই মোর বাপেরে।
মরে ছিলে শতবার মা, হাড় গেঁথে হর গলার পরে ॥
দীন রামপ্রসাদে বলে, লোকে নিন্দে করে গো মোরে।
মা যদি হয় অন্নপূর্ণা, অন্ন নাই তোর বাপের ঘরে ॥ ৫০

(৫১)

মূলতান—একতালা।
মায়ের নাম লইতে অলস হইও না ;
রসনা! যা হবার তাই হবে।
দুঃখ পেয়েছ (আমার মন রে),
না আরো পাবে ॥
ঐহিকের সুখ হলো না ব'লে কি,
ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে।
রেখো রেখো সে নাম সদা সযতনে,
নিও রে নিও রে নাম শয়নে স্বপনে,
সচেতনে থেক (মন রে আমার),
কালী ব'লে ডেক,
এ দেহ ত্যজিবে যবে ॥ ৫১

(৫২)

কে রে রজনীরূপিণী রণ করে।
ঘোর চিকুর অন্ধকার,
আলু থালু দেখে মরি মা ডরে।
যত দেবগণ ধরেছে তাল,
নাচিছে বামা সমরে বিশাল,
ববম্‌ বাজিছে গাল,
নরশিরোহার কণ্ঠে দোলে,
রামপ্রসাদ বলে কেন হে ভূপ,
ঐ দেখ মায়ের অপরূপ রূপ,
তন্ত্র-মন্ত্র-যন্ত্ররূপিণী,
যোড়করে স্তুতি করে অমরে॥ ৫২

(৫৩)

প্রসাদী সুর—একতাল।

ডাক রে মন কালী বলে।
আমি এই স্তুতি-মিনতি করি,
ভুল না মন সময়কালে
এ সব ঐশ্বর্য্য ত্যজ, ব্রহ্মময়ী কালী ভজ,
ওরে ও পদপঙ্কজে মজ, চতুর্ব্বর্গ পাবে হেলে॥
বসতি কর যে ঘরেতে, পাহারা দিচ্ছে যমদূতে,
ওরে পারবে না ছাড়ায়ে যেতে,
কাল-ফাঁসি লাগবে গলে॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে,
কালের বশে কাজ হারালে।
ওরে এখন যদি না ভজিলে
আমসী খাবে আম ফুরালে। ৫৩

প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের পদাবলী

(গুপ্তকবি সংগৃহীত পদগুলি সংবাদ প্রভাকরের ১২৬০ সালের ১ আশ্বিন, ১ পৌষ, ১ মাঘ এবং ১২৬১ সালের ১লা চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত।)

কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহ

কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহ

কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহ

কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহ

দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ দ্বিজ রামপ্রসাদের পদাবলী ঃ

সাঃ পঃ পঃ ৫২শ বর্ষ, ১ম, ২য় সংখ্যা

		কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহ		
মা বলে ডাকিস না রে মন	...	৯৯	নং	২৪০
মন তোমার এই ভ্রম গেল না	...	১৩১	,,	২৪১
মন জান না শেষে ঘটবে কি লেঠা	...	১৩৮	,,	২৪২
মন তোরে তাই বলি বলি	...	১৬৩	,,	২৪৩
মায়ের চরণতলে স্থান লব	...	১৮২	,,	২৪৫
মন রে তোর চরণ ধরি	...	১৮৫	,,	২৪৬
আপন মন মগ্ন হলে মা	...	১৯৪	,,	২৪৭
তোমার সাথী কেরে ও মন	...	১৯৭	,,	২৪৮
ভাল নাই মোর কোন কালে	...	৪০	,,	২৪৯

তৃতীয় শ্রেণীর গান

		কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহ		
অভয়পদ সব লুটালে	...	১৬	নং	২৫০
আমি কি দুঃখেরে ডরাই	...	৩৩	,,	২৫১
আয় দেখি মন চুরি করি	...	৫২	,,	২৫২
আমার সনদ দেখে যারে	...	৬৮	,,	২৫৩
আমি অই খেদে খেদ করি	...	৯১	,,	২৫৪
আর তোরে না ডাকব কালী	...	৯৭	,,	২৫৫
আমায় ছুঁয়ো নারে শমন	...	১৩৪	,,	২৫৬
আয় দেখি মন তুমি আমি দুজনেতে	...	১৩৫	,,	২৫৭
এবার আমি বুঝবো হরে	...	৯	,,	২৫৮
একবার ডাকরে কালী তারা বলে	...	৪৯	,,	২৫৯
এলোকেশী দিগ্বসনা	...	৯৮	,,	২৬০
এবার ভাল ভাব পেয়েছি	...	১৬৭	,,	২৬১
এসব ক্ষেপা মায়ের খেলা	...	২২৪	,,	২৬২
ওমা হর গো তারা মনের দুঃখ	...	৩৫	,,	২৬৩
ওরে শমন কি ভয় দেখাও মিছে	...	৭৩	,,	২৬৪

পাঁচালীর পাদটীকা

পুঁথির পাঠ আরম্ভের পূর্ব্বে—'শ্রীশ্রীদুর্গা ॥ নম সর্ত্তনারায়ণঃ'—এইরূপ বন্দনা আছে।

১। মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ—গুণগীত।

২। ,, ,, দুইলোকে।

৩। ,, ,, সিদ্ধিমনস্কামনাঃ।

৪। মু-গ্র-পা—সিদ্ধ—এখানে সিদ্ধ অপেক্ষা 'সিরিণি' পাঠটিই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

৫। „ „ ফকীর শরীর ধরি।

৬। পুঁথির পাঠ—ছলনা।

৭। „ „ ভিক্ষায়—সমসাময়িক ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া 'ভিক্ষারে' পাঠটিই সঙ্গত।

৮। মু-গ্র-পা—দিল

৯। „ „ হইয়া।

১০। পুঁ-পা—মুখেতে গুভিত গোপ ঝুলিতে ঝুলিছে থোপ হাথে আশা বাড়িরে।

১১। মু-গ্র-পা—হামারা—ভাষাতত্ত্বের বিচারে 'হামেরা' পদটিই সঙ্গত।

১২। „ „ ধূপমে তোম্ কাহে।

১৩। „ „ পেরেশান দেখে বাড়।

১৪। „ „ মেরে।

১৫। „ „ বদে।

১৬। „ „ সভি হাম্‌ছো মিরবা।

১৭। „ „ এই অংশটি পাণ্ডুলিপিতে নাই।

১৮। „ „ দরব হস্ত তপতো।

১৯। মু-গ্র-পা—নিবাসে আসিয়া নিজ।

২০। পুঁ-পা— গড়ুরের ধ্বজ।

২১। „ „ সিস্তি কৈল বিহিতে।

২২। „ „ বিপ্রের দেখিয়া ধন।

২৩। „ „ ক্ষাত হইল ক্ষিতিতে।

২৪। „ „ 'ত্রিতিয়েতে···মন্ত্রণা'—এই অংশটি মুদ্রিত গ্রন্থের মধ্যে নাই, অথচ পরবর্ত্তী পাঠের সহিত সঙ্গতি রক্ষার জন্য ইহা অপরিহার্য্য।

২৫। „ „ চতুর্থে উৎকষ্ট কাষ্ট কাঠুরে করিলে তুষ্ট প্রিথিবী করিলে ছেষ্ট ছিষ্টী কৈলেন পালনা।—
এই পাঠটি আদৌ সঙ্গত বা সার্থক বলিয়া মনে হয় না।

২৬। মু-গ্র-পা—"সত্যপীর···বাসনা"—এই অংশটি পুঁথির মধ্যে নাই, অথচ এস্থলে ইহার বিশেষ তাৎপর্য্য বা সার্থকতা আছে।

২৭। ,, ,, সদানন্দ নামে বেণে সত্যপীর সিন্নি মানে, পঞ্চমে পাইল কন্যা, চন্দ্রকলা নামেতে।
'কলির প্রথমে হরি', 'দ্বিতীয়েতে বিষ্ণুনামে', 'ত্রিতিয়েতে বিষ্ণুলোক'······ইত্যাদি পূর্ব্বাপর পাঠভঙ্গী অনুসারে এখানেও 'পঞ্চমে পাইয়া কন্যা'······ইত্যাদি পুঁথিগত পাঠই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

২৮। মু-গ্র-পা--কি কব তাঁহার ছাঁদ।

২৯। পুঁ·পা—বদন পূর্ণ মের চাঁদ।

৩০। এই অংশে পুঁথির মধ্যে কোন পাঠ নাই।

৩১। মু-গ্র-পা—জিত রতি কামেতে।

৩২। ,, "বর আনি নীলাম্বর······দানেতে"—এই অংশটি পুঁথির মধ্যে নাই।

৩৩। মুদ্রিত গ্রন্থে এই অংশে পাঠক্রমের ভেদ দেখা যায়। এই স্থলে 'চন্দ্রকলা নিকেতনে'······ইত্যাদি পাঠ আছে। কিন্তু বিষয়বস্তু বা অর্থের সঙ্গতির দিক দিয়া এখানে পুঁথির পাঠই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

৩৪। মুদ্রিত গ্রন্থে 'তোক' শব্দ স্থলে 'তোর' আছে। কিন্তু 'তোক' কথাটিই অধিক সার্থক

৩৫। মু-গ্র-পা—সত্যদেব পূজা মানে—এখানে 'সর্ত্তপির এবং সির্ণি শব্দই অধিক সঙ্গত।

৩৬। ,, সত্যদেব।

৩৭। ,, সদা থাকে ধ্যানেতে—এখানে পুঁথির পাঠই স্বাভাবিক, কারণ চন্দ্রকলার সত্যপীর পূজায় বন্দীর মুক্তি বা ছাড়ানসূচক পাঠই সঙ্গত।

৩৮। ,, "এ সব প্রকার ষষ্ঠে···ছলনা"—এই অংশটি পুঁথির মধ্যে নাই।

৩৯। মুদ্রিত গ্রন্থে 'আইল' ও 'পাইল' স্থলে 'এলো' ও 'পেলো' পাঠ দেখা যায়।

৪০। মু-গ্র-পা—করে।

৪১। মু-গ্র-পা—"এ নব যৌবন নিশি…ফেলে হে।"—এই অংশটি পুঁথির মধ্যে নাই।

৪২। পুঁ-পা—"যৌবন প্রভুর মূল অলি হইল প্রিতিকুল কেবল দুঃখের মূল কে বলিবে ভাল হে।"

এখানে পুঁথি অপেক্ষা গ্রন্থের পাঠই সঙ্গত মনে হয়।

৪৩। মু-গ্র-পা— পেয়ে।

৪৪। ,, পূজারম্ভ করিল।

৪৫। ,, রাকা।

৪৬। ,, "নরেন্দ্র রায়ের সুত…সুমুক্তি।"—এই অংশটি পুঁথির মধ্যে নাই। অথচ ভারতচন্দ্রের আত্মপরিচয়মূলক এই অংশটি থাকাই যুক্তিসঙ্গত।

৪৭। মু-গ্র-পা—দেবানন্দপুর নাম। এখানে 'নাম' অপেক্ষা 'গ্রাম' পাঠটিই সুন্দর।

৪৮। পুঁ-পা—'তাহাতে'। এখানে পুঁথির পাঠে ছন্দের ত্রুটি ঘটে।

৪৯। মু-গ্র-পা—'ভারতে নরেন্দ্র রায় দেশে যার যশ গায়
হ'য়ে মোরে কৃপাদায় পড়াইল পারসী'

এই অংশে গ্রন্থ অপেক্ষা পুঁথির পাঠই সর্ব্বাংশে যুক্তিযুক্ত। কারণ পিতা নরেন্দ্র রায় কৃপা করিয়া ভারতচন্দ্রকে পারসী পড়ান নাই এবং পিতার পক্ষে কৃপা করিয়া পড়াইলেন—কথাটি তেমন সঙ্গত-ও মনে হয় না। আবার কবির জীবনীতে পাওয়া যায় যে, তিনি রামচন্দ্র মুনসী নামক জনৈক ব্যক্তির বাটীতে থাকিয়া বাল্যকালে পারস্য শিক্ষা করেন। ইহা ছাড়া এইরূপ পাঠে কবির পিতৃপরিচয়ের পুনরুক্তিই ঘটিতেছে মাত্র।

৫০। মু-গ্র-পা—

সবে কৈল অনুমতি সংক্ষেপে করিতে পুঁথি
তেমতি করিয়া গতি না করিও দূষণা॥

এই অংশে পাণ্ডুলিপির পাঠই সঙ্গত। কারণ, কবি যে সংক্ষেপেই পুঁথি রচনা করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন, এমন মনে হয় না। বরং প্রশস্ত হইলেও আপনার বিদ্যাবুদ্ধি মত সংক্ষেপে করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—পাণ্ডুলিপির মধ্যে বিনয়োক্তিই সঙ্গত মনে হয়।

৫১। মু-গ্র-পা—তেমতি করিয়া গতি।

৫২। „ গোষ্ঠীর সহিত তাঁয়।

৫৩। „ হরি হৌন বরদায়।

৫৯। „ ব্রতকথা সাঙ্গ পায়।

কালীকীর্ত্তনের পাদটীকা

১। পুঁথির পাঠ—

জয়া বলে তব অঙ্গের প্রতি বিষ্ণু যবে শ্রীঅঙ্গে পশিবে।

... ...মিসাইবে॥

২। মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ—

উমা ছাড়া হয়ে একবার ... ... ইত্যাদি।

এখানে 'এ-কবার' কথাটির চেয়ে 'রাণী' কথাটি অধিকতর সার্থক ও স্বাভাবিক।

৩। হয় নয় অন্তরে গো রয়্যা আপন অঙ্গ দেখ গো চায়্যা।

'উমার অঙ্গের .. ... চায়্যা'—এই অংশটি গ্রন্থে নাই।

অথচ এখানে ইহার বিশেষ সার্থকতা দেখা যায়। অতএব গ্রন্থের পাঠে অভাবই ছিল বলিয়া মনে হয়।

৪। মোদের স্থলে—'আমার'
'শশধর' „ 'সুধাকর'
সভার „ 'সবাকার'

৫। তোমা কর্যা নয় সকল অঙ্গময় মা বিরাজে যখন যে নিরখি--এখানে গ্রন্থ পাঠ অপেক্ষা পুঁথির পাঠ অধিকতর শ্রুতিমধুর।

৬। 'কি কহিব' স্থলে—'কতকব'
'রূপের' স্থলে —'রূপে'
প্রসবে সংহারে পুন॥

৭। দাস প্রসাদে বলে এই সার কথা বটে।

পুঁ-পা—অঙ্গনে বৈসল রাণী ব্রহ্মময়ী কোলে মদন ২ অঙ্গনা।	এই সমগ্র অংশটি গ্রন্থপাঠে নাই।

। মু-গ্র-পা—

শরীরের সংজ্ঞা বটে কেতু।

এখানে 'সংজ্ঞা' শব্দের অপেক্ষা 'সঙ্গে' শব্দটিই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও সার্থক।

১০। পুঁ-পা—

দেকহ কদাচ ভিন নয়। ... ... এমত কেবা দেখাছ কোথায়।	এই অংশটুকু একান্ত সার্থক ও স্বাভাবিক, এমন কি অপরিহার্য্য বলিয়াই মনে হয়, অথচ গ্রন্থে ইহা নাই।

১১। মু-গ্র-পা— শ্রীরামপ্রসাদে		এখানে গ্রন্থপাঠের এই সকল শব্দের পরিবর্ত্তে পুঁথির পাঠই সুন্দরতর।
১২। ,,	শিবস্বস্ত্যয়নে	
১৩। ,,	দুর্গা	

১৪। পুঁ-পা—মাত্রর।

১৫। মু-গ্র-পা—

মার নামের ফলে চরণ বলে শিবে মৃত্যুঞ্জয় বলে।

এখানে গ্রন্থপাঠের মধ্যে কেমন যেন অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়

১৬। „ তখন গদ ২ ভাবভরে ঝর ২ আঁখিঝরে সাজাইল যেমন উঠে মনে।

ছন্দের দিক দিয়া গ্রন্থ অপেক্ষা পুঁথির পাঠই সুন্দর।

১৭। পুঁ-পা—

তার উপরে সিন্দুর বিন্দু রবি কোলে যেন ইন্দু হেরিয়া নিমিষ তেজিল।

এই অংশে পুঁথির পাঠ অপেক্ষা গ্রন্থপাঠই অধিক শ্রুতিমধুর ও ছন্দসম্মত।

১৮। মু-গ্র-পা—

দোথরি মুকুতা হার কোন সহচরী আর গেঁথে দিল উমার কপালে।

৪২। পুঁ-পা—ভূসার ভূষণরূপ এইমাত্র ছল।
ভূসার ভূষাণরূপে করে ঝলমল ॥

৪৩। মু-গ্র পা—
রূপ চোয়ায়ে·········শৈল সুতা।—এই অংশটি পুঁথির মধ্যে নাই।

৪৪। „ শ্রীরাজকিশোরে মাতা মাতা তুষ্ট সুতজ্ঞানে।
প্রসিদ্ধ প্রকাশ গান পুরাণ প্রমাণে ॥

৪৫। পু-পা—আর সকল অভক্ত অধম লোকে হাসে।

৪৬। „ শ্রীরাজকিসোরের দেশে শ্রীকবিরঞ্জন
রটে গান গান মহা ঔসদ অঞ্জন ॥

পুঁথির এই পাঠ অপেক্ষা গ্রন্থের পাঠই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। শ্রীরাজকিশোরাদেশে পাঠের পরিবর্ত্তে শ্রীরাজকিশোরের দেশে—এই পাঠ অবশ্য প্রণিধানযোগ্য।

৪৭। মু-গ্র-পা—
জয়া বলে আমি সাধে সাজাইলাম বেশ বানাইলাম জগদম্ব চল পুষ্প কাননে।
চল ২ পুষ্পবনে জয়া দাসী যাবে সনে ॥

৪৮। মু-গ্র-পা—
জগদম্বে ও চলতি চিত্তপদ চলনা।
লোহিত চরণ তলারুণ পরাভব নখরুচি হিমকর সম্পদ দলনা ॥

৪৯। মু-গ্র-পা—
নীলাঞ্চল নিচোল বিলোল পবনে ঘন সুমধুর নূপুর কিঙ্কিনী কলনা।
সকল সময়ে মম হৃদয় সরোরুহে বিহরসি হরসি শিরসি শশিললনা ॥

৫০। পুঁ-পা—
কম্পনেতে মহারাজ রাজেন্দ্র শ্রীরাজকিশোরের বাঞ্ছা ফল ফলনা।

৫১। মু-গ্র-পা—
ভাগ্যহীন শ্রীকবিরঞ্জন কাতর দীনদয়াময়ী সতত ছল ছলনা।

৫২। „ মত্ত কোকিল কূজিত পঞ্চস্বরে।
গুণ ২ গুঞ্জিত মন্দ ২ ভ্রমরে ॥

৫৩। পুঁ-পা—তরু পল্লব শোভিত শোভিত ফলফুলে।
মু-গ্র-পা— বৈঠহি স্থলে বৈঠতি।

৫৪। পুঁ-পা—
ঘামেরে······রাণি।—এই অংশটি গ্রন্থে নাই।

৫৫। মু-গ্র-পা—
সুবাক্য স্থলে সবাক্য।

৫৬। " পুলকে তনু পূরিত প্রেমভরে।
শিব শঙ্করী শঙ্কর গান করে॥

৫৭। পুঁ-পা—
ত্রিগুণাত্মক······বিশ্বগুরু।—গ্রন্থে এই অংশটি অনেক নিম্নে থাকিলেও পুঁথির পাঠক্রম অনুসারে এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল।

৫৮। মু-গ্র-পা—
করুণাময়······বিশ্বগতে।—এই অংশটি পুঁথির মধ্যে নাই।

৫৯। মু-গ্র-পা—
অপাঙ্গ লোচনে মোহিনী কি গুণে চৈতন্য নিগূঢ় হরে।
পুঁ-পা—
এমন রূপের······মন হরে।—এই অংশটি গ্রন্থে নাই।

৬০। মু-গ্র-পা—
কে রে কুঞ্জর গামিনী তনু সৌদামিনী প্রথম বয়স রঙ্গিণী।
যৌবন সম্পদ ভাবে গদ ২ সমান সঙ্গে সঙ্গিনী॥

৬১। " কেরে নির্ম্মল বর্ণাভা ভুজগমণি ভূষণ শোভা হরে ভূষণে কিবা কায
পূর্ণচন্দ্র কোলে খদ্যোত যেমন প্রকাশে না বাসে লাজ॥

৬২। " ভণে রামপ্রসাদ কবি নিরখি সুন্দরী ছবি মোহিত দেব মহেশ
ভুলে রামরিপু জর ২ বপু সে রূপের কি কব বিশেষ॥

৬৩। " শিব ও শিবা ভিন্ন ভবে কি শুনেছ কোথা।

৬৪। " উভয়ত সুসম্ভাষ সঙ্কেত সংবাদ।
উভয়ত চিত্তমধ্যে জন্মে মহাহ্লাদ॥

১১। সাঃ পঃ পঃ ৫২ বর্ষ ১ম, ২য় সংখ্যা।

১২। 'প্রসাদ প্রসঙ্গ', ১ম সং—৩, ১৩, ২১, ৩৫, ৩৮, ৪৩, ৪৪, ৬৪, ৬৮, ৭০ ৮৫, ৯৩, ১১৬ নং।

১৩। ভূমিকা, প্রসাদ পদাবলী, ১ম সং।

১৪। 'রামপ্রসাদ' (প্রসাদী রচনায় শাস্ত্রের প্রভাব)।

১৫। কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহ, ৬৪ নং।

১৬। প্রসাদপ্রসঙ্গ ১ম সং, ২১ নং।

১৭। কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহ, ৫৮ নং।

১৮। সংবাদ প্রভাকর, ১ পৌষ, ১২৬০।

১৯। রামপ্রসাদ, পৃঃ ২৪৬।

২০। ভূমিকা—প্রসাদ পদাবলী, ১ম সং।

২১। ভূমিকা—প্রসাদ পদাবলী, ১ম সং।

২২। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন—১ আশ্বিন, ১ পৌষ, ১ মাঘ—১২৬০।
৺রামনিধি গুপ্ত নিধুবাবু—১ শ্রাবণ, ১২৬১।
৺রামমোহন বসু—১ আশ্বিন, ১ কার্ত্তিক, ১ অগ্রহায়ণ, ১২৬১।
৺নিত্যানন্দ দাস্ বৈরাগী—১ অগ্রহায়ণ, ১২৬১।
৺হরুঠাকুর — ১ পৌষ, ১২৬১।
৺রাসু, নৃসিংহ ও ৺লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস—১ মাঘ, ১২৬১।

২৩। ভূমিকা—প্রসাদ পদাবলী, ১ম সং।

২৪। সাঃ পঃ পঃ ৫২শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সং, পৃ ১৮।

২৫। ১২ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২৬। 'রামপ্রসাদ'—২৫৩-৩০০ নং গীত।

২৭। বর্ষাকালে জলাশয়, ক্ষেত্র, পথ ঘাট জলে প্লাবিত হইলে সেই জলে রোহিতাদি বড় বড় মাছ ভাসিয়া যায় ও গ্রামবাসীরা কোঁচা বর্শা প্রভৃতি অস্ত্রদ্বারা বিঁধিয়া সেই সকল শিকার করিয়া থাকে—তাহাকেই নিরাই করা বলে।

পাঠপঞ্জী

১। পুস্তকাবলী

গ্রন্থকারের নাম	গ্রন্থের নাম
অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	রামপ্রসাদ, ১৩৩০
অনাথ কৃষ্ণ দেব	বঙ্গের কবিতা (১ম ও ২য় ভাগ)
আশুতোষ ভট্টাচার্য্য	বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (১ম ও ২য় সং)
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত, ১২৬২
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	মধ্যযুগে বাংলা
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলার ইতিহাস (নবাবী আমল)।
কৈলাসচন্দ্র সিংহ	সাধক সঙ্গীত (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ)
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ	প্রসাদ পদাবলী (১ম সং)
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	গুপ্তরত্নোদ্ধার বা প্রাচীন কবিসংগীত সংগ্রহ, ১৩০১
চিত্তরঞ্জন দাশ (গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী সম্পাদিত)	বাংলার গীতিকবিতা শাক্ত-সাহিত্য-ধারায় রামপ্রসাদ
জিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভক্তপ্রসাদ
জিতেন্দ্রলাল বসু	মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র
দীনেশচন্দ্র সেন	বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৮ম সং)
দীনেশচন্দ্র সেন	বৃহৎ বঙ্গ (১ম, ২য় খণ্ড)
দুর্গাদাস লাহিড়ী	বাঙ্গালীর গান
দিলীপকুমার রায়	ছান্দসিকী
দয়ালচন্দ্র ঘোষ	প্রসাদপ্রসঙ্গ (১ম, ২য় খণ্ড, ২য় সং
নীহাররঞ্জন রায়	বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদিপর্ব্ব
প্রমথ চৌধুরী	নানাকথা

গ্রন্থকারের নাম	গ্রন্থের নাম
বলরাম কবিশেখর	কালিকা মঙ্গল (চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত) বঙ্গভাষার লেখক
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস	ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ)
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির	রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী (৬ষ্ঠ সং)
মনোমোহন বসু	মনোমোহন গীতাবলী
মাণিকরাম গাঙ্গুলী	শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, ১৩১২)
মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	বঙ্গভাষার ইতিহাস
মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী	কবিকঙ্কণ চণ্ডী (৩য় সং ১৩৩২)
যোগেন্দ্রনাথ বসু	কবিরঞ্জন কাব্যসংগ্রহ, ১২৯২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	আধুনিক সাহিত্য
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	প্রাচীন সাহিত্য
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সাহিত্য
রামগতি ন্যায়রত্ন	বাংলাভাষা ও বাংলাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণ)
রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী	শিবায়ণ, ১২৯৩
রাজকৃষ্ণ রায়	বঙ্গভূষণ
হরপ্রসাদ মিত্র	বাংলাকাব্যে প্রাক্-রবীন্দ্র
শশিভূষণ দাসগুপ্ত	ভারতীয় সাধনার ঐক্য
সুকুমার সেন	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় সংস্করণ)
সুকুমার সেন	মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী
ক্ষিতিমোহন সেন	বাংলার সাধনা
ক্ষিতিমোহন সেন	ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা

২। বিচ্ছিন্ন রচনাবলী

লেখক বা সম্পাদক	রচনা	প্রকাশস্থান ও তারিখ
আনন্দনাথ রায়	কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন	বঃ সাঃ পঃ পঃ ৩য় সং ১৩০৬
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	প্রসাদীজীবন বৃত্তান্ত ও পদাবলী এবং কবিওয়ালা রাম্নু, নৃসিংহ, হরুঠাকুর প্রভৃতি	সংবাদ প্রভাকর ১২৬০-৬২
কালিদাস বাগচী	বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস	মাসিক বসুমতী ২য় খণ্ড, ২য় সং অগ্রহায়ণ, ১৩৪২
কালিদাস রায়	ভারতচন্দ্রের ভাষা ও ছন্দ	বঙ্গশ্রী ১২শ বর্ষ ২য় খণ্ড, ৪র্থ সং
কালিদাস রায়	ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর	বঙ্গশ্রী, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সং, অগ্রহায়ণ ১৩৫১
কালিদাস রায়	ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ	ভারতবর্ষ, ভাদ্র, ১৩৩৫
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ	শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভূমিকা	মাসিক বসুমতী, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সং, ১৩৫৪
ত্রিদিবনাথ রায়	শিব সঙ্কীর্ত্তন চণ্ডিকামঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল	বঙ্গশ্রী ৭ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সং, অগ্রহায়ণ ১৩৪৬
দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	জাতীয় সাহিত্যের আবশ্যকতা কি ?	সাঃ পঃ পঃ ১৩০১ শ্রাবণ, ১ম ভাগ, ১ম সং
দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়	কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২, কার্ত্তিক
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	ভারতচন্দ্র ও ভুরসুট রাজবংশ	সাঃ পঃ পঃ ৪র্থ সং, ১৩৪৮
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	রামপ্রসাদ	সাঃ পঃ পঃ ৫২শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সং ১৩৫২

লেখক বা সম্পাদক	রচনা	প্রকাশস্থান ও তারিখ
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ	প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৩৫
নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত	প্রসাদী সঙ্গীত	বীরভূমি (নবপর্য্যায়) দ্বিতীয় খণ্ড
প্রমথনাথ বিশী	মধুসূদন-ভারতচন্দ্র সংবাদ	বঙ্গশ্রী, ৮ম বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৪৬
পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	দ্বিজ রামপ্রসাদ	প্রতিভা ২য় বর্ষ, ১৩১৯
স্বামী প্রেমঘনানন্দ	বাংলার আগমনী সঙ্গীত	বঙ্গশ্রী, আশ্বিন, ১৩৪২
বিমলেন্দু সান্ন্যাল	সাহিত্য ও সমাজ	বঙ্গশ্রী, শ্রাবণ ১৩৪৬
বিশ্বপতি চৌধুরী	ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও আমাদের বর্ত্তমান কাব্য সাহিত্য	ভারতবর্ষ, বৈশাখ, ১৩৩৫
ব্যোমকেশ মুস্তফী	পাঁচালীকার ঠাকুরদাস	সাঃ পঃ পঃ, ৩য় সং, ১৩০৫
বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ	রামপ্রসাদ ও প্রসাদী সঙ্গীত	মাসিক বসুমতী, ১৩৩২, অগ্রহায়ণ
ভোলানাথ সেন	আর্ট ও হার্ট	শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৫
মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	গোপাল ভাঁড়	মাসিক বসুমতী, ১৩৫৪, জ্যৈষ্ঠ
রবীন্দ্রনাথ	বাংলাছন্দ	সবুজপত্র, ১৩২১, জ্যৈষ্ঠ, ১ম বর্ষ, দ্বিতীয় সং
রসিকচন্দ্র বসু	ভারতচন্দ্রের আদি বিদ্যাসুন্দর	সাঃ পঃ পঃ ১৩০৪, ৩য় সং
হরিপদ ঘোষাল বিদ্যাবিনোদ	প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বৌদ্ধ প্রভাব	মাসিক বসুমতী, মাঘ, ১৩৩২
শ্রীকৃষ্ণ মিত্র	বাংলা কাব্যে মানবতার রূপ (রবীন্দ্র পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ)	মাসিক বসুমতী, বৈশাখ, ১৩৪৭
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	রামপ্রসাদ	ভারতবর্ষ, মাঘ, ১৩৫৬

লেখক বা সম্পাদক	রচনা	প্রকাশস্থান ও তারিখ
সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত	কালীপূজা	বঙ্গশ্রী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬
সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	একখানা প্রাচীন দলিল	মাসিক বসুমতী, ১৩৩২, অগ্রহায়ণ
সনৎকুমার গুপ্ত	কালীকীর্ত্তন, (গুপ্তকবি সংগৃহীত)	সা: প: প:, ৪৯শ ভাগ, ২য় সং, ১৩৪৯

Writers	*Books*
Chakravarti, Dr. P. C.	Doctrine of Sakti in Indian Literature
Dutta, Kalikinkar	History of the Bengal Subah
„ „	Alivardi and his Times.
„ R. C.	The Literature of Bengal
Desai, A. R.	Social Background of Indian Nationalism
Dey, S. K.	Bengali Literature in the Nineteenth Century.
Dasgupta, S. & Dey, S. K.	History of Sanskrit Literature
Dasgupta, S. B.	1. Obscure Religious Cults as Backgroud of Bengali Literature.
	2. An Introduction to Tantric Buddhism.
Hutchinson, Lester	The Empire of the Nabobs.
Mazumdar, R. C.	Maharaja Rajballabh (Cal. Univ.)
Sarkar, Sir Jadunath	History of Bengal, Vol II
Sen, Dineshchandra	History of Bengali Language and Literature (C. U.)
Thomson, Edward and Garratt, John	Rise and Fulfilment of the British Rule in India.

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

প্রথম লাইন পৃষ্ঠাঙ্ক

এ

প্রথম লাইন			পৃষ্ঠাঙ্ক

ও

প্রথম লাইন			পৃষ্ঠাঙ্ক

প্রথম লাইন			পৃষ্ঠাঙ্ক

য

প্রথম লাইন			পৃষ্ঠাঙ্ক